সমাজবিরোধী

[অপরাধ বিজ্ঞান]

পি. সরকার

তুলি-কলম

১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

প্রকাশক :
কল্যাণব্রত দত্ত
১, কলেজ রো,
কলকাতা-৯

মুদ্রক
সুশীল কুমার গোস্বামী
মহাপ্রভু প্রেস
১৫, পটুয়াটোলা লেন,
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ
মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়

বহু ভাষাবিদ্, সাহিত্যরসপিপাসু

শ্রীশচীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য কে—

আমার কথা

আদিম কালে অসভ্য আদি মানুষের সমাজ বলতে কিছু ছিল না—কিন্তু বিরোধ ছিল। এই বিরোধ আর কিছুই নয়—শুধুমাত্র বাঁচার তাগিদ। বাঁচতে গেলে—খেতে হবে। খেতে হলে—খাদ্য সংগ্রহ করতে হবে। এই খাদ্য সংগ্রহেই যত বিপত্তি, যত বিরোধ।

গাছের ফলমূল আর পশু মাংসই ছিল তাদের খাদ্য। এই খাদ্য সংগ্রহের জন্য তাদের লড়তে হতো হিংস্র পশুদের সঙ্গে। কাজেই প্রথম এবং মুখ্য বিরোধ বাধতো ঐ হিংস্র পশুদের সঙ্গে। পশু হত্যা করে তারই কাঁচা মাংস ছিল তাদের প্রধান খাদ্য, খাদ্য হিসাবে ফলমূল হলো গৌণ।

এই ফলমূল সংগ্রহও নির্বিঘ্নে হতো না, এর জন্যও তাদের বিরোধ বাধতো হিংস্র বন্য জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে।

এ তো গেল সৃষ্টির নিকৃষ্ট জীব, পশু-পাখী জন্তু-জানোয়ারের কথা। এবার আসা যাক মানুষের কথায়।

খাদ্য সংগ্রহে মানুষই হয়ে দাঁড়াল মানুষের প্রতিবন্ধক—প্রতিদ্বন্দ্বী। অতএব এ ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরোধ বাধা স্বাভাবিক।

মূলতঃ দেখা যাচ্ছে—মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরোধ চলে আসছে আদিম কাল থেকে।

এখন ভেবে দেখতে হবে, এই বিরোধ করার মনোবৃত্তি তাদের এলো কোথা থেকে! এটা কি তাদের জন্মগত—না অবস্থা বিপর্য্যয়ে পড়ে বিরোধ করার প্রবৃত্তির উদ্ভব!

আর এক ধাপ এগিয়ে আসা যাক।

কিঞ্চিৎ চেতনা-বোধ জাগলো একক মানুষের মনে।

নাঃ এ ভাবে একা একা খাদ্য সংগ্রহ করা খুবই বিপজ্জনক এবং কষ্টসাধ্য। ভক্ষ্যবস্তু সংগ্রহ করতে গিয়ে নিজেকেই অপরের ভক্ষ্য-বস্তুতে পরিণত হতে হয়, খাদকই অসহায় অবস্থায় অন্যের খাদ্যে পর্য্যবসিত হয়।

তাই তাদের মধ্যে অর্থাৎ প্রতিটি একক মানুষের মধ্যে জাগলো দলবদ্ধ হবার চেতনা। সঙ্ঘবদ্ধ হতে না পারলে—একা একা জীবিকা সংগ্রহ করে বেঁচে থাকা অতীব সুকঠিন।

এখন—এই যে মনোভাব—এই যে চেতনা, এ তারা পেলো কোথায়? একি তাদের উর্বর মস্তিষ্কের সুফল—না এর উৎস অন্য কোথাও!

হয়তো অন্য কোথাও, যাকে আমরা বলি—প্রকৃতির পাঠশালায়।

প্রকৃতির পাঠশালায় অর্থাৎ বন-জঙ্গল, পাহাড়, নদ-নদীর তীরে তৎকালে জন্তু-জানোয়ার, পশু-পাখীর সঙ্গে মানুষও বাস করতো—প্রায় একত্রে। প্রায় একত্রে কথার অর্থে—বন্য আদি মানুষ বাস করে যে পার্বত্যগুহায়, তারই অদূরে আর একটি পার্বত্যগুহায় বাস করে হিংস্র শ্বাপদ, বাঘ, সিংহ বা ঐ ধরণের হিংস্র জন্তু।

কাজেই কি বন্য মানুষ—কি বন্য জন্তু, সবাই প্রকৃতির পাঠশালার সহপাঠি।

হাতি শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য একা না থেকে দলবদ্ধ হয়ে ঘুরে বেড়ায়। বন্য মহিষও ঘুরে বেড়ায় দলবদ্ধ হয়ে—ঐ একই কারণে, দলবদ্ধ মহিষ বা পাইথনকে আক্রমণ করা দূরে থাক—দস্তুরমত ভয় পায়। ভয় পায় মহিষ বা পাইথনকে নয়—তাদের সঙ্ঘবদ্ধতাকে।

এই প্রকৃতির পাঠশালার সর্দার পড়ুয়া হলো—বানর।

সঙ্ঘবদ্ধ হবার প্রেরণা সে যুগের বন্য মানুষ খুব সম্ভবতঃ পেয়েছিল—ঐ বানর জাতীয় ইতর প্রাণীর কাছ থেকেই।

বাঁচার তাগিদে বন্য মানুষ হলো দলবদ্ধ।

দলবদ্ধ হবার মূল উদ্দেশ্য হলো—বিরোধিতা করার সুবিধা ও সুযোগ নেওয়া। আর সেই সুযোগকে পূর্ণ মাত্রায় কাজে লাগানো।

দিন যায়—মাস যায়—বছর যায়।

আদি বন্য মানুষ বিভিন্ন গোষ্ঠিতে বিভক্ত হয়।

তখন একদল বাধায় অন্য দলের সঙ্গে বিরোধ।

এই গোষ্ঠিতে গোষ্ঠিতে বিরোধ—এর কারণ কি ?

মূলতঃ কারণ তিনটি রিপু। যথা—কাম, ক্রোধ আর লোভ।

মানুষ যখন একক ছিল তখন তারা গায়ের জোরে যে কোন নারীকে উপভোগ করতো। অবশ্য এর জন্য তাদেরও ইতর প্রাণীর মত হানাহানির অন্ত ছিল না।

সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে মানুষ চাইলো অন্যদলের নারীকে উপভোগ করতে। ফলে—বাধলো বিরোধ।

হানাহানি, মারামারি, কাটাকাটি করে—যাদের শক্তি বেশী তাদের হলো জয়। পরাজিত গোষ্ঠির নারী হলো বিজিত দলের করায়ত্ব।

বিরোধের উৎপত্তি যে ক্রোধ—একথা বিংশ শতাব্দীর সুসভ্য মানুষকে বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা পাওয়া মানেই কালি কলমের অপব্যবহার। সুসভ্য মানুষ চেষ্টা করে ক্রোধকে দমন করতে—ফলে বহু বিরোধের উৎপত্তি না হয়েই নিষ্পত্তি ঘটে যায়। কিন্তু আদি মানুষ দমন করা-করির ধার ধারতো না। প্রাণের বা জানের পরোয়া তারা করতো না। রিপুকে পূর্ণমাত্রায় চরিতার্থ করাই ছিল তাদের ধর্ম। এই যাদের ধর্ম—নারীকে নিয়ে বিরোধ যে তাদের মধ্যে বাধবে, এতো অতি সাধারণ কথা।

রিপু চরিতার্থতায় বাধা এলেই হবে ক্রোধের উৎপত্তি। ক্রুদ্ধ মানুষের দ্বারা গোষ্ঠিবিরোধী বা সমাজবিরোধী কাজ করা অশোভন, নীতিবিগর্হিত হলেও—অস্বাভাবিক নয়।

এর পর আসা যাক—তৃতীয় রিপু পর্বে।

শুধু খাদ্যাদির ব্যাপারে নয়—লোভ যে কোন বস্তু-বিশেষের ওপর আসতে পারে।

নারীর কথা—ব্যাখ্যার প্রয়োজন রাখে না। নারী-লোভী মানুষকে যে কোন বিপদ বা বিরোধের সম্মুখীন হতে দেখা যায় এই সভ্য দুনিয়ায়ও, গত যুগের আদি মানুষের তো কাঃ কথা।

এর পর আসা যাক—প্রাণ ধারণের প্রধান ও অপরিহার্য্য বস্তু খাদ্যের আলোচনায়।

যে যুগের কথা উত্থাপিত হয়েছে—সেই গত যুগে গোষ্ঠিতে গোষ্ঠিতে বাঁধতো বিরোধ খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে—অর্থাৎ শিকার নিয়ে। ধরা যাক—শিকারের পিছনে ধাওয়া করে দু'টি দল একই বনের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হলো। শিকার উপলক্ষ্য করে দু'দলের মধ্যে বিরোধ বেধে উঠতে দেরী হলো না।

শিকার গেল হাতছাড়া হয়ে। ওরা দু'দল মরলো শুধু হানাহানি, রক্তারক্তি করে।

বিরোধ না ক'রে দু'দলে মিলেমিশে অনায়াসেই তাদের শিকার করায়ত্ব করতে পারতো এবং নিজেদের মধ্যে শীকার-লব্ধ প্রাণী ভাগাভাগি করে নিলে কোন গণ্ডগোলই হতো না।

কিন্তু অপরাধ-প্রবণ মন তা হতে দিলো না।

প্রস্তর যুগ অতিক্রম করে মানুষ এলো লৌহযুগে। লৌহযুগ মানেই ক্রমবর্দ্ধমান সভ্যতার যুগ। এই সভ্যতার যুগেও বিরোধের অবসান হলো না। তখন সমাজ গঠিত হয়েছে। সভ্য মানুষ—সমাজভুক্ত মানুষ মেনে চলে সমাজের বাঁধাধরা নিয়ম, ভয় পায়

শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতে। সমাজের নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন মেনে চলাই হচ্ছে সভ্যতা। এই সুসভ্য সমাজের মধ্যেই গজিয়ে ওঠে সমাজ বিরোধী উচ্ছৃঙ্খল মানুষ। এরা এক কথায় সমাজদ্রোহী না হলেও বিরোধিতা করে থাকে পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে। এখন স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে—কেন এ ধরণের বিরোধিতা। কে তাদের মনের ভেতর এই বিরোধভাব জাগিয়ে তুললো।

মানুষের মনে জন্মকাল থেকে বাসা বেঁধেছে—সুপ্রবৃত্তি আর কুপ্রবৃত্তি।

সমাজ বিরোধিতা করা মানেই যে অন্যায় বা অপরাধ—তা কিন্তু মোটেই নয়।

সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করাও একরকম সমাজ বিরোধিতা—যা করেছিলেন নমস্য সমাজ-সংস্কারক রামমোহন রায়। তাঁর অন্তর নিহিত সু-প্রবৃত্তি তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল—ব্যথিত করেছিল। তৎকালীন গোঁড়া হিন্দুসমাজকে কু-সংস্কার মুক্ত করতে তাই তিনি হয়েছিলেন অগ্রণী।

কিন্তু কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে যারা সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়—এখানে বলা হচ্ছে তাদেরই কথা। এই কু-প্রবৃত্তির বশে মানুষ কি না করে। নারীহরণ, বলাৎকার, চুরি, রাহাজানি, ডাকাতি, খুন—আরো কত শত অপরাধ—৲. লেখা-জোখার বাইরে।

এখন কথা হচ্ছে—যে কু-প্রবৃত্তিবশে সমাজবিরোধীরা সমাজ-বিরুদ্ধ কাজ করে—সেই কু-প্রবৃত্তি কোথা থেকে এলো তাদের অন্তরে।

এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কাজেই কোনটা ঠিক তা সঠিক ভাবে বলা সুকঠিন।

একটা খুনীর কথাই ধরা যাক।

খুন করার প্রবৃত্তি বা মনোবৃত্তি সে কোথা থেকে অর্জন করলো?

কেউ বলছেন, ঐ খুনেটা হচ্ছে Born criminal।

আবার কেউ বলছেন, জন্ম-অপরাধী বলে কিছু থাকতে পারে না। সৎ-মনোবৃত্তি নিয়েই প্রতিটি মানুষ জন্মায়। জাগতিক বিষাক্ত আবহাওয়া আর পরিবেশই তার মনকে বিষিয়ে দিয়ে একটা খুনে করে তুলছে।

আবার অন্য মত,—ও সব কিছু না। রক্ত—আদত কথা হচ্ছে রক্ত। প্র-পিতামহ, পিতামহ, পিতার শরীরের শিরায় উপশিরায় যে রক্তধারা প্রবাহিত সেই একই রক্তধারা বহে চলেছে ঐ খুনীটার প্রতিটি শিরায় উপশিরায়। ওর বংশ পঞ্জীকা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে—কেউ না কেউ ওদের বংশে খুনী ছিল। ঐ কু-প্রবৃত্তি খুনীটা পেয়েছে তার কোন-না-কোন পূর্বপুরুষের কাছ থেকে।

উপরিউক্ত মতবাদকে খণ্ডন করে ভিন্ন মতাবলম্বী বলছেন, তা কি করে সম্ভব। একই পিতার ঔরসে জন্মালো তিনটি সন্তান। একজন হলো—সাধারণ গৃহস্থ, ডাক্তার। দ্বিতীয় জন হলো—সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী আর তৃতীয় জন হলো একটা কুখ্যাত খুনে।

অতএব এসব কিছু না। জন্ম-জন্মান্তরবাদ যাঁরা মানেন—তাঁরাই জানেন যে, মানুষ এ জগতে এসেছে কাজ করতে। জন্ম-জন্মান্তরে অর্জিত পাপ ও পুণ্যের ফলেই—মানুষের কর্মপন্থা নির্দ্ধারিত হয়। এর ওপর মানুষের নিজস্ব কোন হাত নেই। সে শুধু একটি অসহায় ক্রীড়নক। পুতুল কি পারে নিজে দাঁড়াতে—নিজে বসতে, শুতে বা ছুটতে। মানুষ শুধু যন্ত্র বিশেষ। যন্ত্রী অলক্ষ্যে থেকে তাকে যেমনি বাজান—যন্ত্র ঠিক তেমনি বাজে।

এসব তো হচ্ছে—বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ব্যক্তিদের মতবাদ, জন্ম-জন্মান্তর আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ। যাঁর যেটাতে বিশ্বাস বা আস্থা—তিনি সেটা মানতে পারেন, যাঁর উপরি-উক্ত কোন মতবাদই মনকে স্পর্শ করে না—তাঁকেও দোষ দেওয়া যায় না। কারণ প্রতিটি বিবেকপরায়ণ বুদ্ধিমান মানুষের আছে একটা নিজস্ব ব্যক্তিত্ব—নিজস্ব মতামত।

অপরাধ-বিজ্ঞানীদের মতে কিন্তু প্রতিটি মানুষ—criminal। অপরাধী।

মানুষ তার অপরাধ-প্রবণ মনকে দমন করে রেখেছে বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে। অপরাধ-প্রবণ মন সদাই ফিরছে সুযোগ-সুবিধার সন্ধানে। সুযোগ-সুবিধা পেলেই সে ছোবল মারবেই মারবে। সমাজ-বিরোধী হয়ে উঠতে তার বিন্দুমাত্র বাধবেনা।

সমাজের প্রতিটি মানুষ কেন তবে সমাজবিরোধী হয়ে উঠছে না।

সভ্য জগতের শিক্ষিত মানুষ বিবেক-বুদ্ধি-মদগর অপরাধ-প্রবণ মনের মাথায় মেবে তাকে অজ্ঞান কবে রেখে দিয়েছে। শিক্ষাদীক্ষার যাদুস্পর্শে অপরাধ-প্রবণ মন ঘুমিয়ে আছে মানুষের অন্তরের অন্তরতম নিভৃত প্রদেশে।

এই ঘুমন্ত মনকেই বলা হয় অবচেতন মন।

ঘুমন্ত অপরাধস্পৃহা যাতে মানুষের মনে জাগতে না পারে—তার জন্য সমাজেব প্রতিটি দায়িত্বশীল লোকের সচেষ্ট হতে হবে। সমাজ-বিরোধীদের সেই ঘুমন্ত অপরাধ-প্রবণ মন-রূপ কাল সাপটা তাদেরই জাগ্রত বিবেক-বুদ্ধি-জ্ঞানের কঠিন দণ্ডাঘাতে যেন আর কোনদিন মাথা তোলার অবসর ন পায়। প্রতিটি সমাজবিরোধীকে করে তুলতে হবে সমাজ সম্বন্ধে সচেতন—যাতে তারা সমাজবিরোধী না হয়ে স্বেচ্ছায় হবে সমাজ-সেবী।

সব সমাজেই ক্ষতিকারক দুষ্ট ব্রণ আগেও ছিল—আজও আছে—ভবিষ্যতেও থাকবে। এটাই কিন্তু সান্তনার কথা নয়। সমাজ শরীর থেকে বিষাক্ত দুষ্ট ব্রণ অপসারণ করতেই হবে। সমাজ-বিরোধীদের হাত থেকে সমাজকে যাদ রক্ষা করা না হয়—অদূর ভবিষ্যতে ধ্বসে যাবে সমাজের ভিত্।

আদিম যুগে মানুষের মন ছিল বন্য পশুর মত বা তার চেয়েও বেশী অপরাধ-প্রবণ। অপ-স্পৃহা ছিল সেই আদিম মানুষের অন্তরে চির জাগ্রত।

অপ-স্পৃহা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন জগতের প্রত্যিটি নর ও নারী। তফাৎ এই—কারুর অপরাধ-স্পৃহা জাগ্রত আর কারুর বা সুপ্ত। এযুগের সভ্য মানুষ সুপরিবেশের মধ্যে থেকে ভব্যতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে অন্তরের সেই আদিম পশু প্রবৃত্তিটাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। তাদের সুপ্ত অপ-স্পৃহা সুপ্তই থেকে যায় রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্মের ভয়ে। তবে সভ্যতার মুখোশ খুলে, সব কিছুর ভয় এড়িয়ে মানুষের অপ-স্পৃহা যে সময়বিশেষে জাগ্রত না হয়—মাথা চাড়া দিয়ে না ওঠে এমন নয়।

এমন মানুষও এযুগে দেখা যায়—যাদের অন্তরে অপ-স্পৃহা চির জাগ্রত। সুপরিবেশ, শিক্ষা, রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম—কোন কিছুর ধার তারা ধারে না। তারা হচ্ছে জন্ম-অপরাধী। তারা জন্মগ্রহণই করে অন্তরে জাগ্রত অপরাধ-স্পৃহা নিয়ে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—এই অপরাধ-স্পৃহা তারা পেল কোথা থেকে? সেই আদিম যুগের আদিম পুরুষের অপ-স্পৃহা তার মধ্যে এলো কি বংশানুক্রমে? তাই যদি হয় তাহলে তাদের পূর্ব-পুরুষরা ছিল নিশ্চয়ই প্রকৃত অপরাধী। কিন্তু বিশ্লেষণ করে অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী দেখেছেন যে—এ কথা সত্য নয়। প্রকৃত-অপরাধীদের আগের কয়েক পুরুষেব মধ্যে প্রকৃত-অপরাধী কেউ ছিল না। তাহলে তার মধ্যে ঐ আদিম স্পৃহা এলো কোথা হতে? কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে—ঐ আদিম-স্পৃহা সে পেয়েছে তারই কোন এক অতি উর্দ্ধতন পুরুষের কাছ থেকে।

এমনও দেখা গেছে—কোন এক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ভদ্রলোকের তিনটি পুত্র। একটি ডাক্তার, একটি সন্ন্যাসী আর একটি খুনে। বংশানুক্রমিক হলে—গৃহস্থ ভদ্রলোকের তিনটি ছেলে তিন রকম হলো কি করে?

বিশেষজ্ঞদের মতে—উক্ত ভদ্রলোকের বংশ তালিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যেকোন এক পুরুষে ঐ বংশে ছিল এক ধর্মভীরু

আবার অন্য আর এক পুরুষে ছিল একজন কষাই মনোবৃত্তি সম্পন্ন নিষ্ঠুর। জন্ম-বীজাঙ্কুর মধ্যে যা কয়েক পুরুষ যাবৎ ছিল সুপ্ত—তাই এ পুরুষে জাগ্রত হয়ে গড়ে তুলেছে একজনকে সন্ন্যাসী আর অন্য জনকে খুনে।

আবার অন্যান্য বিশেষজ্ঞের মতে—প্রকৃত অপরাধী গড়ে তোলে পরিবেশ! ও সব জন্ম-টন্ম সব বাজে—বোগাস। যাই হোক—এ সম্বন্ধে নিশ্চিত করে এখন কিছু বলা যায় না।

তবে দেখা গেছে—অপরাধী পিতা ও অপরাধীনী মাতার অধিকাংশ ছেলেমেয়েই হয়ে থাকে অপরাধী আর বেশ্যা। অপরাধী পিতা ও নিরপরাধীনী মাতার পুত্র কন্যাদের ভেতর ভাল এবং মন্দ দুইই পাওয়া যায়। নিরপরাধ পিতা ও নিরপরাধীনী মাতার ঔরসজাত পুত্র কন্যাদের মধ্যে প্রায় সকলেই হয় সৎ, ব্যতিক্রম দেখা যে না যায় এমন নয়, তবে সংখ্যা অনুপাতে কম।

উৎকট প্রকৃত-অপরাধীর সংখ্যা খুবই কম। এরা অপরাধকে অপরাধ বলে মনে করে না—সুতরাং অপরাধ করাব জন্য কোন দুর্বল মুহূর্তেই এদের মনে অনুশোচনা আসে না। অপরাধটাকে এরা পেশা বলে মনে করে' অপরাধ করার জন্য কেন তাদের শাস্তি দেওয়া হয় তাও এরা বুঝে উঠতে পারে না। জেলে থাকতেই এরা ভালবাসে। জেলের বাইরে এসে এরা অস্বস্তি বোধ করে। এদের জীবন ধারণের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে স্ফূর্তি করে জীবনটাকে উপভোগ করা। নেশা, বেশ্যাসম্ভোগ, জুয়া—এ না হলে এরা জীবনকে ব্যর্থ বলেই মনে করে।

তবে অভ্যাস অপরাধীরা অপরাধকে অপরাধ বলে স্বীকার করে এবং দুর্বল মুহূর্তে তাদের মনে অনুশোচনাও জাগে।

প্রাথমিক অপরাধীরা সাধারণতঃ অভাবের তাড়নায়, ক্ষুধার জ্বালায় অপরাধ করে। তবে এই প্রাথমিক অপরাধীদের অধিকাংশই পরে অভ্যাস অপরাধীতে পরিণত হয় এবং অভ্যাস অপরাধীরা

পরিণত হয় প্রকৃত-অপরাধীতে। প্রকৃত-অপরাধী মানেই সেই আদিম একক পশু প্রকৃতির মানুষ।

অন্যায়! অন্যায় অন্যায়ের মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে হয় পাপ। পাপ পাপের মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে হয় অপরাধ।

আদর্শহীন, পূর্বপরিকল্পিত সমাজ ও রাষ্ট্র অননুমোদিত স্বার্থযুক্ত অন্যের ক্ষতিকারক যে কোন কাজকে বলা হয় অপরাধ।

এমন অনেক মানুষ আছে যারা বিনা প্রয়োজনে সাময়িক আত্ম-তৃপ্তির জন্য খেয়ালের বশে অপ-কার্য্য করে থাকে। অপ-কার্য্য করার পর তাদের মধ্যে আসে অনুতাপ, অনুশোচনা, লজ্জা, ভয় প্রভৃতি। তারা তখন সেই অপহৃত দ্রব্য বা অর্থ তার মালিককে ফিরিয়ে দেয় গোপনে অর্থাৎ সেই মালিকের অজান্তে। এদের সেই কার্য্য কিন্তু পরিকল্পিত বা স্বার্থযুক্ত থাকেনা, ক্ষতি করাও তাদের উদ্দেশ্য নয়। অন্যের কোন একটা জিনিষ দেখা মাত্র তাদের মনে হঠাৎ অপ-স্পৃহা জাগ্রত হয় এবং তারা সাময়িক লোভ বা খেয়ালের বশে সেই জিনিষটি চুরি করে। চুরি করার কিছুক্ষণ পরেই হোক অথবা দু' একদিন পরেই হোক তাদের মনে অনুশোচনা আসে। সৎ প্রেরণার বশবর্তী হয়ে তখন তারা গোপনে ফিরিয়ে দেয় সেই অপহৃত সামগ্রী বা অর্থ। এ একপ্রকার মানসিক ব্যাধি। চিকিৎসার দ্বারা মানুষ এধরণের মানসিক ব্যাধির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে।

'না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়!' তাহলে ঐ ধরণের হাত-সাফাই করা কাজ নিশ্চয়ই অপরাধ বলে গণ্য হবে!

কিন্তু ও ধরণের কাজকে ঠিক অপরাধ না বলে অপরাধ-রোগ বলাই সমীচিন। বিকারের ঘোরে কেউ যদি কাকেও মেরে বসে তবে সেই বিকারগ্রস্তকে অপরাধী পর্য্যায়ভুক্ত করা চলে না। কারণ ঐ অপকার্য্যটি সে করে ফেলেছে রোগের তাড়নায়।

মিস শ্যামলী চক্রবর্তী কোন একটি বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধানা শিক্ষয়িত্রী। শিক্ষয়িত্রীর কাজ করতে করতেই তিনি বি, এ, পাশ করলেন, এম, এ, পাশ করলেন। শিক্ষয়িত্রী হিসাবে ঐ স্কুলে তাঁর সুনাম আছে।

বি, টি, পরীক্ষা দিতে বসেছেন মিস চক্রবর্তী। লিখতে লিখতে পেনের কালি ফুরিয়ে গেল। পাশের সিটে তাঁরই জানাশোনা এক ভদ্রমহিলা পরীক্ষা দিচ্ছেন। তাঁর টেবিলের ওপর আব একটা চকচকে পেন বাড়তি হিসাবে পড়ে আছে আর তিনি একটায় লিখছেন।

ইচ্ছে করেই হোক, খেয়ালের বশেই হোক আর তাড়াতাড়ির মাথায় অন্যমনস্কতার জন্যই হোক—কোন কিছু জিজ্ঞাসা না করেই মিস চক্রবর্তী তাঁর পেনটা তুলে নিয়ে লিখতে সুরু করে দিলেন।

সেদিনের পরীক্ষা শেষ হলো।

বাড়ী ফেরার সময় মিস চক্রবর্তীর সঙ্গে উক্ত ভদ্রমহিলার অনেক কথাই হলো—যথা পরীক্ষার কথা, সাংসারিক কথা, স্কুলের কথা—হলো না শুধু পেনের কথা। ভদ্রমহিলা হয়তো ভুলে গিয়েছিলেন কিন্তু ভোলেননি মিস চক্রবর্তী। ইচ্ছে করেই তিনি ঐ পেনের কথা চেপে গেলেন। পেনটি ফিরিয়ে দিতে কিছুতেই তাঁর ইচ্ছা হলো না। পেনটি নিয়ে তিনি বাড়ী চলে এলেন।

রাত্রে মিস চক্রবর্তীর হঠাৎ মনে পড়লো ভদ্রমহিলার ঐ পেনটার কথা। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেটা ড্রয়ার থেকে বার করলেন। অনুশোচনায় মনটা ভরে উঠলো। ছিঃ ছিঃ, এ তিনি কি করেছেন! তিনি না শিক্ষয়িত্রী! ছাত্রীদের তিনিই না নীতি-শিক্ষা দিয়ে থাকেন। কেউ কারুর পেন বা পেনসিল চুরি করলে তিনি তাকে সবার সামনে শাস্তি দেন, ভর্ৎসনা করেন।

ইচ্ছে হলো—এখনি ছুটে গিয়ে তিনি ভদ্রমহিলাকে পেনটা দিয়ে আসেন।

অনুশোচনায়, আত্মগ্লানিতে সারারাত তাঁর ঘুম হলো না। ভোর না হতেই তিনি উঠে বাইরে বেরুবার জন্য তৈরী হয়ে নিলেন। আজও যে তাঁর পরীক্ষা—এ কথার ওপর কোন গুরুত্ব না দিয়ে তিনি চলে গেলেন তাঁর বান্ধবীর বাড়ী।

ভুলে যাওয়ার অজুহাতে মিস চক্রবর্তী পেনটি ফেরৎ দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিলেন ভদ্রমহিলার কাছে।

পেনটি ভদ্রমহিলার হাতে না দেওয়া পর্য্যন্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছিলেন না মিস চক্রবর্ত্তী।

সময় নষ্ট করে সকালেই আসবার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমার তো আর একটা পেন রয়েছে। পরীক্ষা-হলে তো দেখা হতোই, তখন ফেরৎ দিলেই চলতো। বললেন ভদ্রমহিলা।

কেন যে মিস চক্রবর্তী পরীক্ষার পড়া ছেড়ে এই সাত্‌-সকালে তাঁকে পেনটি ফেরৎ দিতে এলেন—তা তাঁকে কেমন করে বোঝাবেন মিস চক্রবর্তী।

বি, টি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মিস চক্রবর্তী হলেন স্কুলের সহযোগী প্রধানা শিক্ষয়িত্রী।

'হাত-টান'টা তাঁর অস্থিমজ্জাগত অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। কোনদিন একটা চক, কোনদিন একটা পেনসিল, কোনদিন একটা খড়ি-মাখা ডাষ্টার আবার কোনদিন বা একটা বই অন্যের অজ্ঞাতে তাঁর ব্যাগে ভরে নিয়ে আসতেন—অনুতপ্ত হয়ে আবার সেই জিনিষটি তিনি পরের দিন স্কুলে গিয়ে অন্যের অলক্ষ্যে যথাস্থানে রেখে দিতেন।

অপ-স্পৃহা, অপকার্য এবং অনুতাপ—ক্রমে তাঁর মনকে বিষিয়ে তুললো। নিজের ওপর নিজের জাগানো একটা বিরক্তি, অব্যক্ত ধিক্কার!

তিনি তখন এক মনস্তত্ত্ববিদ ডাক্তারের শরণাপন্ন হলেন এবং অদূর ভবিষ্যতে এই অপ-স্পৃহার হাত হ'তে মুক্তি পেলেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—বি, টি, পরীক্ষা দিতে গিয়ে মিস চক্রবর্তীর মনে হঠাৎ এই অপ-স্পৃহা জাগলো কেমন করে? এতদিন এই অপ-স্পৃহা ছিল কোথায়?

এই অপ-স্পৃহা ছিল তাঁর মনে সুপ্ত। হঠাৎ তাঁর বান্ধবীর পেনটা দেখে সুপ্ত অপ-স্পৃহা জেগে উঠলো। ডাক্তারের নানা প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে মিস চক্রবর্তী বলেছিলেন তাঁর অতি শৈশব অবস্থার মতিগতির কথা—ছোট ছোট ভাই বোনেদের যেকোন প্রিয় জিনিষ তাঁর চোখে ভাল লাগতো তা-ই তিনি লুকিয়ে রাখতেন। তারা যতই কান্নাকাটি করুক—তিনি কিছুতেই ফেরৎ দিতেন না—দিতে তাঁর ইচ্ছা হতো না। যখন ইচ্ছা হতো তখন যার যার জিনিষ তাকে ফেরৎ দিয়ে দিতেন—।

বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে বদ অভ্যাস তাঁর চলে যায়। হঠাৎ লেখাপড়া শেখার সঙ্গে সঙ্গে সৎ প্রেরণা জাগে মনে—সুপ্ত বা অর্দ্ধসুপ্ত হয়ে যায় তাঁর ঐ অপ-স্পৃহা।

রতীশবাবু একজন শিক্ষিত প্রবীণ ভদ্রলোক। জীবনে তিনি কোনদিন কোন দুর্বল মুহূর্তে অপরাধমূলক কোন অপকার্য্য করেননি। ধার্মিক, সদালাপী, সংসারী লোক।

অপরাধী ও অপবাধ সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে একদিন বর্ষামুখর সন্ধ্যায় আলোচনা হচ্ছিল বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে। সেই বৈঠকে ভদ্রলোক স্বীকার করলেন যে জীবনে যদিও আমি কোন অপরাধ-মূলক অপকার্য্য করিনি তবুও আমি জ্ঞানতঃ অপরাধী—অর্থাৎ কিনা জ্ঞানপাপী।

অপরাধ না করেও মানুষ অপরাধী হয় কেমন করে! বন্ধু-বান্ধবদের মনে ঔৎসুক্য জাগা স্বাভাবিক।

আমি হয়তো কোন বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে গেছি, বন্ধুর টেবিলে দেখলাম একটি সুন্দর পেপার-ওয়েট। ওটি না জানিয়ে হস্তগত করার জন্য মন আমার উৎসুক হয়ে উঠলো। কিন্তু সে ইচ্ছা আমি দমন করলাম।

আজও মাঝে মাঝে আমার মনে সে ইচ্ছা যে না জাগে এমন নয় কিন্তু মনের বাসনা আমি কাজে পরিণত করতে পারিনি বা করিনি। তোমরা হয়তো বলবে—কি করে তুমি নিজের বাসনাকে সংযত কর? দুর্দান্ত দুষ্প্রবৃত্তিকে আমি আমার সৎপ্রেরণার চাবুক মেরে সংযত হতে বাধ্য করি। আর একটু ভেঙে বলি—আমার মনে যখনই কোন জিনিষ চুরি করার বাসনা জাগে তখনই আমি ভগবান রামকৃষ্ণের ছবিখানি মানস-চোখে দেখবার চেষ্টা করি, মনে মনে তাঁর নাম জপ করি। ব্যস—মাত্র কয়েক মুহূর্তে অপ-স্পৃহা মুছে যায় আমার মন থেকে।

এইভাবে অপ-স্পৃহার হাত থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করে শিক্ষা, সভ্যতা, আইন আর ধর্ম! তবে ঐ রতীশবাবুও একজন অপরাধী-রোগী।

দিন দুপুরে গলিটা লোকে লোকারণ্য.

ব্যাপার কি? সবাই সবাইকে ঐ একই প্রশ্ন করছে—ব্যাপার কি?

গলির প্রায় শেষ প্রান্তে একখানি সেকেলে প্যাটার্নের বিরাট জারাজীর্ণ বাড়ী। অনেকগুলি বড় বড় ঘর। প্রত্যেক ঘরে এক একজন ভাড়াটে। ঘরের সংখ্যা ওপর নীচ করে প্রায় চল্লিশ। বাড়ীটি কসমোপলিটান। সর্বজাতির, সর্বধর্মের সমন্বয় হয়েছে এখানে।

ভদ্রলোক আছে, আছে হাফ-গেরস্তো, হিন্দুস্থানী বাস করে তার বাঙালী মেয়েমানুষ নিয়ে। পাঞ্জাবী থাকে তার গুজরাটী বৌ নিয়ে।

নর্তকী, সিনেমা অভিনেত্রী, গায়িকা, হোটেল গার্ল ; যাত্রাওয়ালা—। এছাড়া আছে ঘুগনীওলা, চানাচুরওলা, ফুচকাওলা, হকার, ক্যানভাসার, ট্রাম কণ্ডাক্টর, বাস ড্রাইভার প্রভৃতি যে যার খুশী মত বাড়ীতে ঢোকে নিজের আস্তানায় আবার খুশী মত চলে যায় যে যার কাজে। কারুর খোঁজ কেউ রাখে না !

মেয়েছেলে না থাকলে সাধারণ গৃহস্থ বাড়ীতে বেটাছেলেদের কেউ ঘর ভাড়া দেয় না। বিপত্নীক বিকাশবাবু তাই বাধ্য হয়ে তিনটি ছেলেকে নিয়ে এই বাড়ীর নীচের তলার একখানি ঘরে আজ বছর দুই হলো বসবাস করছেন। প্রৌঢ় বিকাশবাবু রান্না করেন নিজেই। তিনি এখন কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন। বড় ছেলেটি তাঁরই অফিসে কাজ করে। মেজটি বেকার। ছোট ছেলে চায়ের ব্যবসা করে। বড় ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে।

বৈশাখের রণরণে দুপুর।

বিকাশবাবু কি একটা কাজে সেদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে বেরিয়েছেন। বড় ছেলে গেছে অফিসে।

ছোট ভাই নরেন বললো, মেজদা! চট্ করে গিয়ে পোষ্টাফিস থেকে তিনশো টাকা তুলে আন তো। বড্ড দরকার।

মেজভাই বললে, তোর আবার হঠাৎ টাকার দরকার পড়লো কেন ?

আঃ যাও না। দরকার না থাকলে বলি !

ঠিক আছে। তাড়াতাড়ি দুটি খেয়ে নিয়েই যাচ্ছি।

কি মুস্কিল ! দেরী হলে আজ কি আর টাকা পাব ! তুমি এসেই খাবেখন মেজদা। আগে গিয়ে টাকা নিয়ে এসো।

মেজদা অগত্যা পোষ্টাফিস চলে গেল—টাকা তুলতে।

নরেন তাড়াতাড়ি নীচেকার ঘরগুলো ঘুরে দেখে আসতে গেল—কে কি করছে।

বাড়ীর পুরুষরা বেরিয়ে গেছে যে যার কাজে। মেয়েদের মধ্যেও

অনেকে বাড়ী নেই। যারা আছে—তারা ব্যস্ত যে যার সংসারের কাজে আর নয় খাওয়া দাওয়া করছে। কার ঘরের কে খোঁজ রাখে এই ভরদুপুরে।

লাইন বন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে পোষ্টাফিস থেকে টাকা তুলতে বেশ খানিকটা সময় লাগলো মেজ ভাই ধীরেনের।

টাকা তুলে বাড়ী ফিরে ধীরেন দেখলো তাদের ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ।

বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিয়ে ধীরেন রাগতঃ কণ্ঠে বললো, বাঃ বেশ তো তুই। নিজে খেয়ে দেয়ে আরাম করে ঘুমুচ্ছিস আর আমি না খেয়ে—, খোল্ খোল্—শীগ্গীর দরজা খোল্।

না সাড়া—না শব্দ। দরজার কড়া নেড়ে নেড়ে হাল্লাক হয়ে গেল ধীরেন।

দিনের বেলা কেউ এত ঘুম ঘুমোয়! বলে জানলাটায় গিয়ে ধাক্কা দিলো ধীরেন। খুলে গেল ভেজানো জানলা।

ভেতরের দৃশ্য দেখে ধীবেনের গায়ের রক্ত হিম হ'য়ে গেল। মাথাটা তার ঝিম্-ঝিম্ করে উঠলো। কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে ধীরেন মরিয়া হয়ে লাথি মেরে দরজার খিল ভেঙে ঘবে ঢুকলো। তার চীৎকারে ছুটে এলো বাড়ীর লোকজন।

ছোট ভাই নরেন কড়িকাঠ সংলগ্ন পাখার রিঙে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। তাড়াতাড়ি অন্য লোকের সাহায্যে ধীরেন তাকে নীচে নামালো—কিন্তু তখন প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। হাসপাতালে আর পাঠাতে হলো না, নরেন মারা গেল।

থানা অফিসার এসে তার পকেটে যে চিঠিখানি পেলে তার সারাংশ ঃ—

বছর দুয়েক আগে যেদিন প্রথম আমরা এই বাসায় আসি—সেদিন হঠাৎ লক্ষ্য পড়ে ঐ কড়ি কাঠটার রিঙের ওপর। ভয়ে আমি আঁতকে উঠি। ঐ রিঙটা আমার চোখের সামনে দুলতে দুলতে

বললে, দড়ি নিয়ে আয়। ঝুলে পড় এই রিঙ্‌ থেকে। ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলাম। কি জানি কেন—কাকেও বলতে পারলাম না ঐ কথা। কে বিশ্বাস করবে—কে না করবে, কি দরকার বলে। হয়তো লোকে শুনে আমায় 'পাগলা' বলে উপহাস করবে।

দিন যায়, মাস যায়, ঘরে আমি ঢুকতে পারি না। ঘরে ঢুকলেই মনে হয়—ঐ ঝুলন্ত রিঙটা আমায় ডেকে বলছে, "কিরে—আর দেরী করছিস কেন? দড়ি নিয়ে এসে আজই ঝুলে পড়।

ঘর ছেড়ে দিয়ে শীতকালেও ঘরের বাইরে বারান্দায় আর গ্রীষ্মকালে ছাতে শুতে সুরু করলাম। কিন্তু সেখানেও নিস্তার নেই। অর্দ্ধেক রাতে কে যেন আমায় ঘুম থেকে তুলে বলছে, এই তো সুযোগ। সবাই এসে ছাতে ঘুমিয়ে আছে। ঘর খালি। কেউ জানতে পারবে না—কোন প্রতিবন্ধক নেই। গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলবার এই তো মাহেন্দ্রক্ষণ।

ধড়মড় করে উঠে বসে দেখি—কই, কেউ তো কোথাও নেই।

দিনে এবং রাতে কে যেন অলক্ষ্যে থেকে আমার জীবন দুর্বহ, অতিষ্ঠ করে তুললে। ক্রমশঃ আমারও মনে হতে লাগলো—সত্যি, কি লাভ বেঁচে থেকে! দিন কাল যা পড়েছে তাতে মরে যাওয়াই ভাল।

আবার ভুলে যাই ও সব কথা যখন ডুবে থাকি কাজকর্মের মধ্যে। কিন্তু মরার কথা আমি ভুললেও—ভুলতে দেয় না ঐ কড়িকাঠের ঝুলন্ত রিঙ। ঘরে ঢুকলেই ও আমায় আদর করে ডাকে—আয় আয়—আমার কাছে আয়। দড়ি নিয়ে এসে ফাঁস লাগা গলায়। আর কতদিন দেরী করবি!

সত্যি তো—বড্ড বেশী দেরী হয়ে যাচ্ছে। আর দেরী করা ঠিক নয়। বাজার থেকে কিনে আনলাম শক্ত দেখে একগাছা দড়ি—বাবা, দাদাদের অলক্ষ্যে।

কাল রাত্রেই গলায় দড়ি দিতে নেমে আসছিলাম ছাদ থেকে—কিন্তু বাধা পড়লো বড়দার ডাকে।

আজ দুপুরে আর কিছুতেই নিজেকে ঠিক রাখতে পাচ্ছি না রিঙের ডাকে ঝুলে পড়াই সাব্যস্ত করলাম।

কেন যে গলায় দড়ি দিতে চলেছি তা আমি নিজেই জানি না—অন্যকে কি বলবো!

আমার মৃত্যুর জন্য আমিও দায়ী নই, অন্য কেউ তো নয়ই।

আত্মহত্যা অপরাধ নয়—আত্মহত্যার চেষ্টাই হচ্ছে অপরাধ এবং আইন অনুসারে দণ্ডনীয়। নরেন বেঁচে থাকলে তাকে শাস্তি পেতে হতো।

সত্যিই কি তাকে ঐ কড়িকাঠে ঝুলন্ত রিঙটা ডাকতো গলায় দড়ি দেবার জন্য? বর্তমান যুগে এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য?

মনোবিকারগ্রস্ত রোগীর কাছে যা বিশ্বাসযোগ্য—তা স্বাভাবিক লোকের কাছে নিশ্চয় বিশ্বাসযোগ্য নয়। ওটা হচ্ছে নরেনের মনের বিকার। ওর এই আত্মহত্যার মূলে কোন কারণ নেই। এই অকারণ মনোবিকার মানুষকে উন্মাদ করে তোলে। এ এক প্রকার মারাত্মক মানসিক ব্যাধি।

উলুবেড়ে ষ্টেশনের কাছ বরাবর একটা ছোট্ট রেলব্রীজ আছে। এই ব্রীজের তলায় খানিকটা জল একপাশে আর অন্য পাশে এ পার থেকে ও পারে যাবার অল্প পরিসর বাঁধানো রাস্তা। এই পুলের তলা দিয়ে লোকজন যাতায়াত করে, আজ কাল সাইকেল রিকসাও চলাচল করে।

সন্ধ্যার কিছু পরে মালতী তার বরের সঙ্গে বেড়িয়ে বাড়ী ফিরছে। রাস্তা থেকে নেমে ঐ পুলের তলা দিয়েই তাদের বাড়ী যেতে হবে। ওরা পুলের কাছাকাছি আসতেই দেখা গেল—অদূরে মেল আসছে সার্চ লাইট ফেলে।

—চল—মেল এসে পড়বার আগেই আমরা পুলের তলা দিয়ে পেরিয়ে যাই। বললে মালতীর স্বামী.

মালতী কোন কথা না বলে পুলের ধারে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো জীবন্ত শমন ঐ মেলের ছুটে আসা ইঞ্জিনটার দিকে। সার্চ লাইটের আলো মালতীর সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। কেমন একটা পৈশাচিক বিকৃত ভাব ফুটে উঠেছে তার চোখে মুখে।

—দাঁড়িয়ে পড়লে কেন—চল! মেল যে এসে পড়লো!

কে কার কথা শুনছে! নববিবাহিতা স্ত্রী তার নীরব, নিথর, নিশ্চল।

পুলের কাছাকাছি ইঞ্জিনটা এসে পড়েছে তড়িৎ গতিতে। মালতী ছুটে গেল ইঞ্জিনের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য। মাত্র এক লহমা বিলম্ব হলে মালতীকে আর খুঁজে পাওয়া যেতো না। দুরন্ত সমন পিশে, থেঁতলে তার দেহের হাড়, রক্ত, মাংস নিশ্চিহ্ন করে দিত—যদি না তার স্বামী ছুটে এসে এক ঝটকায় তাকে রেললাইনের ধার থেকে পুলের নীচে ফেলে দিত।

হাসপাতালে তিনটি মাস থেকে সুস্থ হয়ে মালতী বাড়ী ফিরে এলো।

স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে এ ভাবে আত্মহত্যা করতে যাওয়ার কোন অর্থ হয়। মেয়েটি কি তবে উন্মাদ!

উন্মাদও নয় আর সাময়িক উত্তেজনাও নয়—এ এক অদ্ভুত অকারণ প্রসূত মনোবিকার।

ছেলেবেলা থেকেই এই পুলটা তাকে ডেকে বলে আসছে, খুকী! ঐ ট্রেণ আসছে! পড়—পড়—ইঞ্জিনের সামনে লাফিয়ে পড়।

ভয়ে পুলের ধারে সে আসতো না, কিন্তু এই পুলের তলা দিয়েই তাদের যাতায়াতের পথ, না এসেও উপায় ছিল না। পুলের তলা দিয়ে আসতে দিনের বেলাতেও তার কেমন গা-টা ছম্ ছম্ করতো।

সেদিন বেড়িয়ে ফেরবার সময় পুলের কাছে আসতেই তার কানে

গেল ঃ—ঐ ছাখ্। কি সুন্দর চাঁদের আলো ছড়িয়ে মেল আসছে হু হু করে। যা—ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড় ঐ ইঞ্জিনের সামনে। এমন সুযোগ আর পাবিনে।

তারপর যে কি হয়েছে—কি করে যে মালতী পুলের তলায় গিয়ে ছিটকে পড়েছে—কিছুই তার মনে নেই।

অকারণে মাত্র আত্মতৃপ্তির জন্য বহু নর-নারী খুন করেছে। তবে কোন রকম স্বার্থ জড়িত না থাকলেও এ ধরণের হত্যাকে অকারণ বলা সঙ্গত নয় কারণ আত্মতৃপ্তিই হচ্ছে তাদের খুন করার একমাত্র কারণ। এধরণের খুনীদের আপরাধ-রোগী বলাই সমীচিন। মনোবিকারই তাদের এই জঘন্য কাজে প্রণোদিত করে থাকে। তবে আত্মতৃপ্তির জন্য মানুষ যে আত্মহত্যা না করে এমন নয়। এ ধরণের আত্মহত্যার মূলে থাকে সাময়িক উন্মাদনা বা উত্তেজনা। এই উত্তেজনা আত্মহত্যাকারীর মনে তিন দিন পর্য্যন্ত থাকতে দেখা গেছে।

কারণ প্রসূত আত্মহত্যা মনোবিকার থেকেই ঘটে থাকে।

প্রসন্ন ভালবেসেছিল তারই বৌদির বোনকে। তারা দু'জনে একই কলেজে পড়তো। দু'জনে একসঙ্গে সিনেমায় গেছে, থিয়েটারে গেছে—গেছে পিক্‌নিকে। ওদের দুটির বিয়ে হবে—একথা ওরা জানতো—জানতো আর পাঁচজনও। বৌদি তার বোন লীলাকে নিয়ে প্রসন্নর সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসাও করতো।

কিছুদিন যাবৎ প্রসন্ন লক্ষ্য করে আসছে—লীলার প্রচ্ছন্ন ঔদাসীন্য। নানা ছল-ছুতায় সে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে প্রসন্নকে।

সেদিন কলেজে প্রসন্ন তাকে একান্তে ডেকে বললে, কাল বৈকালে যার সঙ্গে মোটরে তোমায় দেখলাম—উনি কে?

—আমার দাদার বন্ধু, সম্প্রতি ফরেন থেকে এফ, আর, সি, এস হ'য়ে এসেছেন। কাল আমাদের বাড়ী বেড়াতে এসেছিলেন। বললে লীলা খুশী মনে।

—দেখো—যেন লাভ-টাভে পড়ে যেয়োনা।

সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে ব্যস্ততার ভাব দেখিয়ে লীলা বলল, যাই—এখন আবার ডি. এন. এম-এর ক্লাস আছে।

মাসখানেক পরে।

সেদিন ভোরে ঢাকুরিয়া লেকের পাড়ে পাওয়া গেল এক জোড়া জুতো, গেঞ্জী আর সার্ট। সার্টের পকেটে একখানা চিঠি। চিঠিতে লেখা আছে ঃ—লীলা। একদিন ছিলে তুমি আমার প্রিয়তমা কিন্তু আজ তুমি হবে অন্যের প্রিয়া। আমি তোমায় ভালবেসেছিলাম কিন্তু তুমি তা পারনি, তবে দেখিয়েছিলে ভালবাসার ভান—যা আগে বুঝতে পারিনি, কিন্তু আজ বুঝতে পারছি মর্মান্তিক ভাবে—মরমে মরমে। কিন্তু তোমার বিরহ-ব্যথা সহ্য করার মত মানসিক শক্তি আমার নেই। ভুল যা করেছি—সেই ভুলের খ্যাসারাত দিতেই হবে আমাকে—আমার জীবন বিসর্জন দিয়ে। তুমি ছাড়া দ্বিতীয় কোন অবলম্বন আমার জীবনে সেদিনও ছিল না আর আজও নেই। তোমার নবীন জীবন-সাথীকে নিয়ে সুখী হও, তোমাদের যাত্রাপথ হোক কুসুমাস্তীর্ণ—এই হলো আমার অন্তিম ঐকান্তিক কামনা। তোমার বিয়ের উপহার হিসাবে দিয়ে গেলাম আমার এই নগণ্য জীবন। বিদায়—চির বিদায়।

ইতি

প্রসন্ন।

দাদার ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে যে রাত্রে লীলার বিয়ে হয়—ঠিক সেই রাত্রে নিজের পা দড়ি দিয়ে বেঁধে প্রসন্ন লেকের জলে আত্মহত্যা করে। সাঁতার সে কোনদিন জানতো না।

এখানে প্রসন্নর আত্মহত্যার কারণ—আকস্মিক সক্। লীলার সঙ্গে যে ডাক্তারের বিয়ে হবে একথা সে আগে জানতো না বা তাকে ইচ্ছে করেই জানন হয়নি। সে জানলো—যেদিন লীলার বিয়ে। কাজেই ব্যর্থ প্রেমই হলো তার আত্মহত্যার কারণ। লীলার বিয়ের সংবাদে তার মাথায় যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত হলো। সে কিছুতেই নিজেকে ঠিক রাখতে পারলে না, উত্তেজনার বশে আত্মহত্যা করাই সাব্যস্ত করলে এবং করলেও ঠিক তাই।

কারণ প্রসূত মনোবিকারও এক প্রকার মানসিক ব্যাধি। সময় মত তাকে আটকে ফেলতে পারলে এবং সৎ উপদেশ ও বাক্ প্রয়োগের দ্বারা তার মানসিক উত্তেজনার উপশম হতে পারতো অথবা চিন্তায় চিন্তায় আত্মসম্বরণ করতে না পেরে প্রসন্ন শেষ পর্য্যন্ত উন্মাদ হ'য়ে যেতো।

লীলা কি তাহলে প্রসন্নকে ভালবাসতো না ?

মেয়েরা ভালবাসে—হয় পুরুষের গুণ আর নয় সেই পুরুষের দেহ অর্থাৎ সেই পুরুষটিকে। গুণের মোহ যত সহজে মেয়েরা ভুলতে পারে তত সহজে মানুষটাকে ভুলতে পারে না। মানুষটিকে ভুলতে তাদের দেরীই হয়। লীলা ভালবেসেছিল প্রসন্নর 'গুণ'কে, প্রসন্ন 'মানুষ'টাকে নয়। প্রসন্ন ভাল গান গাইতে পারতো। লীলা ভালবেসেছিল প্রসন্নর গানকে—প্রসন্নকে নয়।

মেয়েরা ভালবাসে পুরুষের রূপ, গুণ, অর্থ। প্রসন্নর ভেতর সে শুধু পেয়েছিল গুণের সন্ধান কিন্তু ডাক্তারের ভেতর সে পেল একাধারে রূপ, গুণ আর অর্থের সন্ধান। প্রসন্নর চেয়ে ডাক্তার ছিল রূপবান, এফ, আর, সি, এস, ডাক্তার তার গুণের পরিচয় আর অর্থ না থাকলে কেউ বিদেশে গিয়ে এফ, আর, সি, এস-ও হ'য়ে আসতে পারে না আর শহরের বুকে মোটর চেপে বেড়াতেও পারে না।

প্রসন্ন তাকে যে চোখে দেখেছিল—লীলা তাকে সে চোখে

দেখেনি। তাই আলো নয়—আলেয়ার পিছনে ছুটে অপঘাতে মরতে হলো প্রসন্নকে।

নিজের প্রাণ নিজে বিনাশ করার অধিকার মানুষের নেই। ভারতীয় সমাজ এবং রাষ্ট্রবিধির কাছে আত্মহত্যার চেষ্টা অমার্জনীয় অপরাধ। দুর্বলচিত্ত, মনোবিকারগ্রস্ত নর-নারীই সাময়িক উত্তেজনার বশে আত্মহত্যা করে থাকে। আদর্শবিহীন আত্মহত্যাকে কেউ শ্রদ্ধার চোখে দেখে না।

কোন খ্যাতনামা মনোবিজ্ঞানী ডাক্তারের কাছে এলেন এক সম্ভ্রান্ত বংশীয় শিক্ষিত যুবক। যে কোন উঁচু বিল্ডিঙের ওপর উঠে নীচু দিকে চাইলেই তাঁর লাফিয়ে পড়ার অদম্য অপ-স্পৃহা জাগে। তখন হয় তিনি তাড়াতাড়ি নীচে নেমে আসেন আর নয় বিল্ডিঙের ভেতর এমন জায়গায় চলে যান—যেখান থেকে বাড়ীর নীচেটা দেখা যায় না।

—হঠাৎ কবে, কিভাবে এবং কি অবস্থায় আপনার মনে এই অপ-স্পৃহার উদ্রেক হয়? প্রশ্ন করেন মনোবিজ্ঞানী।

যুবকটি স্মরণ করে বললেন, তা প্রায় বছরখানেক আগেকার কথা। আলমবাজারে আমার এক বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে যাই। বাড়ীটা ছিল গঙ্গার ধারে। গ্রীষ্মের অপরাহ্ণ। দু'বন্ধুতে ছাতে বেড়াতে বেড়াতে গল্প করি। কার্নিসের ধারে দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকি গঙ্গার দিকে। বাড়ীখানার গা ঘেঁসে কলনাদে বহে চলেছে কানায় কানায় ভরা গঙ্গা। ভাবি ভাল লাগে চেয়ে থাকতে। হঠাৎ মনে হয়—কার্নিসের ধার থেকে গঙ্গার বুকে লাফিয়ে পড়ি। মনের মধ্যে জাগলো একটা প্রচ্ছন্ন ভয়। পেছিয়ে এলাম কার্নিসের ধার থেকে। বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে আবার গিয়ে দাঁড়িয়েছি কার্নিসের ধারে। চোখ পড়লো গঙ্গার বুকে। আবার মনের মধ্যে জাগলো ছাদ থেকে গঙ্গার বুকে লাফিয়ে পড়ার দুষ্প্রবৃত্তি।

নেমে এলাম ছাত থেকে। ওটার ওপর বিশেষ কোন গুরুত্ব দিলাম না।

—এর পর আর কোন উঁচু বাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ার প্রবৃত্তি হ'য়েছিল?

—এর পর অনেক পাঁচ সাত তলা বাড়ীর ওপর উঠেছি কিন্তু লাফিয়ে পড়ার ইচ্ছা হয়নি। কিন্তু মনুমেণ্টে ওঠাই হলো আমার কাল। সেদিন আমার সঙ্গে বন্ধুবান্ধব না থাকলে আমি ঠিক মনুমেণ্টের ওপর থেকে নীচে লাফিয়ে পড়তাম। সেই থেকে যে কোন উঁচু বাড়ী থেকে নীচের দিকে চাইলেই—নীচের মাটি আমায় যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে, আমার প্রবল আগ্রহ হয় লাফিয়ে পড়তে।

—আপনি সাঁতার জানেন?

—হ্যাঁ স্যার! আমি খুব ভাল সাঁতারু। আমি তো গাঁয়ের ছেলে। পল্লীগ্রামে সাঁতার না জানা লোক খুব কমই আছে।

—আচ্ছা, যে পুকুরে বা নদীতে ছোট বেলায় আপনি সাঁতার কাটতেন—সেই পুকুর বা নদীর ধারে কি কোন বাড়ী ছিল?

—বাড়ী ছিল না তবে বড় বড় বটগাছ ছিল পুকুরের ধারে।

—সেই গাছের ওপর থেকে কি আপনি কোনদিন পুকুরের ওপর লাফিয়ে পড়েছিলেন?

যুবকটি হেসে ফেলে বললে, এ তো ছিল আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক খেলা। আমি ঐ গাছের শিরডগ থেকে পুকুরের বুকে লাফিয়ে পড়তেও ভয় পেতাম না।

ডাক্তারও হেসে বললেন, রোগের উৎস যখন খুঁজে পাওয়া গেছে তখন আপনার রোগ সারানো কষ্টকর হবে না। আগামী কাল আপনি আসবেন এই সময়ে। এই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পারত-পক্ষে কোন উঁচু বিল্ডিংয়ে উঠবেন না। একান্ত পক্ষে যদি উঠতেই হয়—তাহলে মনে মনে স্মরণ করবেন আপনার সেই পল্লীগ্রামের

পুকুর আর সেই বটগাছ। বটগাছের ওপর থেকে পুকুরের ওপর লাফিয়ে পড়ার ছবিটা ভাসিয়ে তুলবেন চোখের সামনে

আত্মহত্যার অপ-স্পৃহা মনের মধ্যে জাগলেই বুঝতে হবে শারীরিক বিকারের মত মানসিক বিকার হয়েছে। রোগের চিকিৎসা না করলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী তা সে শারীবিকই হোক আর মানসিকই হোক। অনেক ক্ষেত্রে শারীরিক রোগকে পার আছে কিন্তু মানসিক রোগের হাতে পার নেই। সময় থাকতে সুচিকিৎসকের শরণাপন্ন হলে মনোবিকারগ্রস্ত রোগী নিজের মঙ্গল তো করবেনই—পরোক্ষ ভাবে তিনি উপকার করবেন নিজের সংসারের, সমাজের ও রাষ্ট্রের।

পল্লী অঞ্চলে মানুষ সাধারণতঃ আত্মহত্যা করে থাকে—গলায় দড়ি দিয়ে, জলে ডুবে, বিষ খেয়ে। যেখানে কাছাকাছি রেললাইন আছে সেখানে মানুষ আত্মহত্যা করে রেললাইনে মাথা দিয়ে আর নয় চলন্ত ট্রেণের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

উপরিউক্ত উপায়গুলি ছাড়া শহুরে লোক আত্মহত্যা করে উঁচু বাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ে, অথবা রিভলবার, পিস্তল বা বন্দুকের গুলিতে।

গ্রামে কল্কে ফুলের গাছের অভাব নেই। এই কল্কে ফুলের বিচি মারাত্মক বিষ। কল্কে ফুলের গাছে যে ফল হয়—সেই ফলের ভিতর ছোট আঁটি থাকে। ঐ আঁটি থেঁতো করে বেটে খেয়ে বহু লোক মারা গেছে।

হাওড়া জেলার কোন একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে বিন্দু বলে একটি সৎকায়স্থের কুমারী কন্যা কল্কে ফুলের বিচি খেয়ে মারা যায়।

বিন্দুরা ভাই বোনে মিলে এগারজন। ছ'বোন আর পাঁচ ভাই। বড় বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। বিন্দুর বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেছে, অন্য পাঁচটি বোনও বিয়ের উপযুক্ত। তখনকার দিনে বড়

বোন অবিবাহিতা থাকতে ছোট বোনেদের বিয়ে হ'তো না—এই ছিল সমাজবিধি।

কত জায়গা থেকে দেখতে এলো আর গেল কিন্তু বিন্দুর বিয়ের ফুল আর ফুটলো না। না ফোটার কারণ—ছ'টি বোনের মধ্যে সে সবচেয়ে কুৎসিত। রঙ কালো, চোখ ছোট, নাকটা একটু খাঁদা, বেঁটে এবং মোটা। এর ওপর মা শীতলার অনুগ্রহে সারা অঙ্গে—বিশেষ করে মুখে অজস্র গুটিকার ক্ষত চিহ্ন। এ হেন মেয়েকে চট্ করে কে নেবে ঘরে। এদিকে বিন্দুর না বিয়ে হলে অন্য মেয়ে কটিরও গতি হয় না। বাড়ীশুদ্ধো লোকের মন বিষিয়ে উঠলো বিন্দুর ওপর।

এর ওপর বিন্দু ছিল যেমনি অভিমানী তেমনি মুখরা।

একমাত্র তার বাবা ছাড়া আর কেউ তাকে দেখতে পারতো না।

রাত কত কে জানে! বিন্দুর বাবার সঙ্গে তা'র মায়ের কথাকাটাকাটি হচ্ছে। পাশের ঘর থেকে কান পেতে শুনতে লাগলো বিন্দু। আজই দুপুরে একজায়গা থেকে বিন্দুকে দেখতে এসেছিল—

—দেখতে তো অমন কত জায়গা থেকেই আসছে কিন্তু ও পোড়া মুখ পছন্দ হচ্ছে কারুর?

—সে দোষ কি বিন্দুর? বললে বিন্দুর বাবা।

—অমন মেয়ে থাকার চেয়ে মরাই ভালো। হাড় কালি করে দিলে।

—আঃ কেন শুধু শুধু বেচারাকে বিনা দোষে রাতদুপুরে গালাগাল সুরু করলে বলতো! যে যার বরাত নিয়ে এসেছে—তুমি আমি কি করতে পারি বল!

ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো বিন্দুর মা, বরাতের ওপর বরাত দিয়ে তো আর গাঁয়ের লোকের মুখ বন্ধ করতে পারবে না। আমি যে আর লোকের কথায় কান পাত্‌তে পারি না—সে খবর রাখো! তা ছাড়া—উনি না বিদেয় হলে আর চারটির কি উপায় হবে—সে কথাটা কি ভেবে দেখেছো?

—তা বলে ওকে তো আর গলাটিপে মেরে ফেলতে পারি না। একটু চুপ করো বাপু, বাকি রাতটুকু ঘুমুতে দাও। বললে বিন্দুর বাবা।

বিন্দুর দু চোখের কোণ জলে ভরে উঠলো।

সম্ভব নয় বলে—তার বাবা তাকে গলাটিপে মেরে ফেলতে পাচ্ছেন না! সম্ভব হলে—হয়তো গলাটিপেই তাকে মেরে ফেলা হতো! মা চায় তার মরণ! সে মরলে সবাই নিষ্কৃতি পায়। সে মরলে—বাবা, মা রেহাই পাবে পাড়া-পড়শীর গঞ্জনার হাত থেকে। সে মরলে—তার আর চারটি বোনের বিয়ে হবার বাধা সরে যাবে। দুনিয়ায় কেউ তাকে চায় না—কেউ তাকে ভালবাসে না। এমন প্রাণ সে আর রাখবে না। মরে সে নিজেও নিষ্কৃতি পাবে—আর পাঁচজনকেও নিষ্কৃতি দিয়ে যাবে।

অতি সন্তর্পণে খিল খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো বিন্দু। চাঁদনী রাত। গাছপালা, ঘর বাড়ী ভেসে যাচ্ছে চাঁদের আলোয়। বাগানের ভেতর গিয়ে ঢুকলো বিন্দু। পাড়লে এক কোঁচড় কল্কে ফুল। ঠাকুর দালানে বিচিগুলো থেঁতো করে শিলে বাটার মত করে বাটলে। নারকোল মালায় জলের সঙ্গে বিচির কাই গুলে খেয়ে ফেললে বিন্দু উত্তেজনা ও অভিমান ভরে।

সকাল বেলা খোঁজ পড়লো বিন্দুর।

দেখা গেল—ঠাকুর ঘরের পিছনের বারাণ্ডায় পড়ে আছে বিন্দু মরণের প্রতীক্ষায়, তখনও তার শেষ নিঃশ্বাস পড়েনি।

—কেন মা তুই এ কাজ করলি? সাশ্রুনেত্রে জিজ্ঞেস করলেন বিন্দুর বাবা।

বাবার প্রশ্নের উত্তরে বিন্দুর দু চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়লো দু' ফোঁটা জল।

কারণ প্রসূত আত্মহত্যা হলেও কি সমাজ কি রাষ্ট্র বিন্দুর এই অপকার্য্যকে সমর্থন করেনা। বিন্দুর কু-দৃষ্টান্ত সমাজ জীবনে এনে

দেবে বিশৃঙ্খলা। বেঁচে উঠলে এই আত্মহত্যা করার চেষ্টার জন্য আইন অনুসারে বিন্দুকে শাস্তি পেতে হতো।

মানুষ সব চেয়ে ভালবাসে নিজেকে। উত্তেজনার বশে নিজেকে যে হত্যা করতে পারে—অন্যকে হত্যা করতে তার নিশ্চয়ই বাধবে না। মানুষ নিজেকে হত্যা করে শুধু নিজেরই ক্ষতি করে না—পরোক্ষভাবে ক্ষতি করে সমাজের ও রাষ্ট্রের।

মনোবিকারের ঘোরে কোন একটা অমঙ্গল ঘটতে পারে এই অপ্রত্যাশিত অনিশ্চিত আশঙ্কায় দুর্ব্বলচিত্ত শিক্ষিত, সভ্য বিচক্ষণ মানুষও আত্মহত্যা করে থাকে। অকারণ প্রসূত এই ধরণের আত্মহত্যা সুস্থ মনের পরিচয় দেয় না। এরূপ ক্ষেত্রে অপ-স্পৃহা জাগবার সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে অনাগত অনিশ্চিত অমঙ্গল সম্বন্ধে কোন মনোবিজ্ঞানীর সঙ্গে আলাপ করা।

তবে এ কথাও সত্য যে আত্মহত্যার অপ-স্পৃহা মানুষের মনে একবার জাগলে তা দুর্নিবার হয়ে ওঠে। মানুষ তখন আর সুস্থ, স্বাভাবিক থাকে না—সাময়িক ভাবে সে ঘোর উন্মাদ হয়ে ওঠে।

শ্রী এম একজন চাকরী জীবি সাধারণ গৃহস্থ। শিক্ষিত, সভ্য, নিরীহ কেরাণী। দেশ থেকে ডেলিপ্যাসেঞ্জারী করে চাকরী বজায় করেন। গ্রামের লোক তাকে খাতির করে। দুর্গাপূজার সময় তিনিই হ'ন পূজা কমিটির সাধারণ সম্পাদক। লোকের আপদে-বিপদে শ্রী এম সাহায্য করেন, তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান তাঁর নিজের অবস্থা কিন্তু স্বচ্ছল নয়।

ভদ্রলোকের ছিল ন'টি ছেলে মেয়ে। কমতে কমতে ছ'টিতে এসে দাঁড়াল। কার বাড়ীতে আর না মরে লোকে কথায় বলে—'জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ' বিধাতার হাত।

কিন্তু ষষ্ঠ পুত্রটি যখন মারা গিয়ে পাঁচটিতে ঠেকলো তখন ভদ্রলোক যেন কেমন হয়ে গেলেন। মনে হলো—'তাই তো চোখের

সামনে একটার পর একটা করে চার চারটি ছেলেমেয়ে মরে গেল। খাইয়ে, পরিয়ে, লেখাপড়া শিখিয়ে এদের বড় করে তুলবো আর যম তার যখন খুশী—যেটাকে টেনে নেবে! এইভাবে বাকি কটাও যদি মরে যায় চোখের সামনে! মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কষ্ট করে আমি ছেলে মানুষ করবো অথচ তাদের বাঁচিয়ে রাখবার ক্ষমতা তো আমার নেই। না—না, বাকি ছেলে-মেয়ে কটার মৃত্যু আমি চোখের সামনে দেখতে পারবো না। কিছুতেই না। কিন্তু বেঁচে থাকলে তো দেখতেই হবে। তাহলে—উপায়? ছেলে মেয়ের মৃত্যু যাতে না দেখতে হয়—তার কি কোন উপায়ই নেই? আছে বইকি—নিশ্চয় আছে। নিজে বেঁচে থাকলে তবে তো ছেলে মেয়ের মৃত্যু দেখবো। ওদের আগে আমি যদি মরতে পারি তাহলে? তাহলে তো আর ওদের মৃত্যু আমায় দেখতে হবে না। অতএব আমি মরবো—মরতে আমায় হবেই। আমি আত্মহত্যাই করবো।'

উপরিউক্ত 'মনে হওয়' কথাগুলি তিনি তাঁর ডাইরিতে লিখলেন—ষষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুর দিন গভীর রাত্রে

পরের দিন ভোরে দেখা গেল—বাড়ীর পাশে তেঁতুল গাছের মোটা ডালে গলায় দড়ি দিয়ে ভদ্রলোক ঝুলছেন।

যে ছেলেমেয়েদের মৃত্যু দেখবার ভয়ে ভদ্রলোক আত্মহত্যা করলেন—সেই ছেলেমেয়েরা যে তাঁর অবর্তমানে না খেতে পেয়ে তাড়াতাড়ি মরণের মুখে এগিয়ে যাবে—এ কথাটা তিনি বারেকের জন্যও ভেবে দেখলেন না আত্মহত্যা করবার আগে।

এধরণের আত্মহত্যা নিছক পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়, অবশ্য সাময়িক ভাবে উন্মাদ না হলে কেউ আত্মহত্যা করতে পারে না। শ্রী এম এর বংশ তালিকা অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে তিন পুরুষের মধ্যে তাঁদের বংশে সাতজন আত্মহত্যা করেছে। এই সাত জনের মধ্যে দু'জন ছিল পাগল। বংশানুক্রমে এই অপ-স্পৃহা সুপ্ত অবস্থায় থাকে মানুষের অন্তরে। কারণে বা অকারণে মানুষের মনে

জাগ্রত হয়ে ওঠে এই অপ-স্পৃহা। তখন যদি মানুষ সৎ প্রেরণার সাহায্যে নিজেকে সংযত করতে পারে তবেই ভালো—নতুবা জাগ্রত অপ-স্পৃহা তাকে আত্মহত্যা করিয়ে তবে ছাড়ে।

সাধারণ মানুষ সাময়িক উন্মাদনার বশে আত্মহত্যা করতে গিয়ে যদি কোন গতিকে রক্ষা পায় তাহলে তাকে অনুতপ্ত হতে দেখা যায়।

গরীব গৃহস্থ ঘরের অশিক্ষিতা বধূ মেনকা দু' ছেলের মা। স্বামী তার চটকলে কাজ করে। শনিবার শনিবার হপ্তা পায় অর্থাৎ সারা সপ্তাহের পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে প্রতি শনিবারে।

হপ্তা পেয়ে সে একটু আধটু নেশা-ভাঙ করে বাড়ী আসে। বউ বকাবকি করলে সে বলে, হপ্তা ভোর হাড়ভাঙা খাটুনি খাটি। হপ্তায় একদিন যদি সের খানেক তাড়ি খাই আর তুই যদি তা বরদাস্ত না করিস তাহলে বাঁচি কেমন করে বল দেখি!

—অমন ছাই-পাঁস কি না খেলেই নয়! মুখঝামটা দিয়ে বৌ বলে।

স্বামী তার ঠাট্টা করে বলে, চাষা কি জানে মদের স্বাদ।

জাত চাষার মেয়ে মেনকা আরো চটে যায়।

এমনি হাসি কথা কৃত্রিম মন কষাকষির মধ্য দিয়ে কাটে তাদের শনিবারের প্রতিটি সুখের সন্ধ্যা। মেনকা হচ্ছে তার স্বামীর চোখের মণি।

মাস আষ্টেক পরের কথা।

আজ ক'দিন হলো ছোট ছেলেটার জ্বর আর কিছুতেই ছাড়ছে না। তার ওপর বড় ছেলেটা খেলতে গিয়ে জ্বর নিয়ে ফিরলো। জ্বর বলে জ্বর—গা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে। সন্তান-সম্ভবা মেনকা দুটো অসুস্থ ছেলে নিয়ে মহা বিব্রত হয়ে পড়লো।

আজ শনিবার। সকাল সকাল স্বামীকে বাড়ী আসবার কথা

মেনকা বলে দিয়েছে। আর আসবার সময় ডাক্তারবাবুকে বলে—ছোট ছেলেটার জন্য ওষুধ আনার কথা বার বার মনে করিয়ে দিয়েছে মহাদেবকে। কিন্তু সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল—রাত্রি হলো। এই আসে—এই আসে করে মেনকা সাগ্রহে দুয়ারের দিকে চেয়ে স্বামীর প্রতীক্ষা করে।

রাত দশটা বাজিয়ে মহাদেব ফিরলো বোম ভোলানাথ হয়ে। এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে তার আজ এই অবস্থা। কিন্তু কে শুনছে তার কৈফিয়ৎ! মহাদেব যত কাকুতি-মিনতি করে—মেনকা ততই রণচণ্ডী হ'য়ে তাকে যা মুখে আসে তাই বলে গালাগাল করতে থাকে।

হঠাৎ রাগের বশে মহাদেবের বাপ তুলে বসলো মেনকা। কাঁহাতক আর একঘেয়ে গালাগাল বরদাস্ত হয়, তার ওপর নেশার মাত্রাটা আজ একটু বেশীই হয়ে গেছে মহাদেবের। সে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিলে মেনকার গালে।

মেনকার গায়ে জীবনে সে এই প্রথম হাত তুললে মারবার সঙ্গে সঙ্গেই নেশা তার অর্দ্ধেক ছুটে গেল।

আর একটি কথাও বললে না মেনকা। সে খালি মেঝের ওপর পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। মাকে কাঁদতে দেখে—ছেলে দুটোও চীৎকার করে কেঁদে উঠলো।

বিহ্বল মহাদেব কি করবে ভেবে না পেয়ে দিশেহারার মত ছুটে বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে। রাগের বশে সে কিনা মেরে বসলো! এ মুখ সে কেমন করে দেখাবে মেনকাকে! অনুশোচনায় মুষড়ে পড়লো মহাদেব।

ঘণ্টাখানেক এধার ওধার ঘুরলো পাগলের মত। পঞ্চমীর এক ফালি চাঁদ প্রায় অস্তোন্মুখ। ভাল লাগলো না মহাদেবের। বাড়ী ফিরে এলো। কেরোসিন ল্যাম্পটা ঘরের মেঝেয় পিট্ পিট্ করে জ্বলছে। ছেলেদুটো জ্বরের ঘোরে অর্দ্ধ অচৈতন্য। কিন্তু মেনকা! মেনকা কোথায় গেল? তবে কি ঘাটে গেছে!

বৌ। ও বৌ। ডাকতে ডাকতে মহাদেব পুকুরধারে এসে কাকেও দেখতে পেল না।

অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় মনে হলো কি যেন পুকুরের মাঝ বরাবর ডুবছে আবার ভেসে উঠছে। দিক্ বিদিক্ জ্ঞান শূন্য মহাদেব ঝাপিয়ে পড়লো জলে।

ডুবন্ত লোকের খুব কাছে যেতে নেই। দূর থেকে হাত বাড়িয়ে তার চুল ধরে তীরে টেনে আনতে হয়, নইলে উদ্ধারকর্তার বিপদ সুনিশ্চিত।

ডুবন্ত মেনকা কাছে পেয়ে প্রাণপণ শক্তিতে চেপে ধরলে মহাদেবকে মেনকাকে উদ্ধার করবে কি - নিজেরই তখন জলের তলায় তলিয়ে যাবার অবস্থা।

পোদ্দারদের বড় গিন্নী সময় মত পুকুর ঘাটে এসে না পড়লে—মেনকা নিজেও ডুবতো আর মহাদেবকেও ডুবিয়ে মারতো।

পরের দিন সকালে

অসুস্থ মেনকার শিয়রে বসে মহাদেব বললে, আচ্ছা বৌ। তোর আক্কেলটা কি। মাগ ভাতারে ঝগড়া, মন কষাকষি কোন্ সংসারে না হয় কাল তুই নিজেও মরতিস—আমাকেও মারতিস। আর আমাদের অভাবে ছেলে দুটোও মরে যেতো! সাধে কি আর তোদের মেয়েছেলে বলে! বলা নেই—কওয়া নেই তুই অমনি জলে ডুবে মরতে গেলি!

সলজ্জভাবে মেনকা বললে, কেউ বুঝি আবার ঢোল সহরৎ করে জলে ডুবতে যায়!

—মুখ নেড়ে কথা বলতে তোর একটু লজ্জা করছে নারে বৌ।

—আমার গায়ে হাত তুলতে তোমার লজ্জা করেনি।

ভুল মানুষের হয় না! তা বলে তুই—

—তাই আমিও ভুল করে—! লজ্জায় মেনকার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল।.........

—নে—এই গরম দুধটুকু খেয়ে নে। মহাদেব একবাটি গরম দুধ নিয়ে এসে মেনকার মুখের সামনে ধরলে।

—ছেলেরা এক ফোঁটা দুধ পায় না আর আমি বুড়ো মাগি দুধ খাবো।

মুখভঙ্গি করে রহস্যভরা কণ্ঠে মহাদেব বললে, এখন তো খুব দরদ দেখছি। কাল জলে ডুবতে যাবার সময় মনে পড়েনি ছেলেদের কথা!

—আর বারে বারে আমায় লজ্জা দিওনি বাপু! কাল রাগের মাথায় কি দুর্ব্বুদ্ধি যে আমার মাথায় চাপলো—তা তোমায় কি করে বোঝাবো! মার তো তোমার হাতে কোনদিন খাইনি তাই মনে বড় দুঃক্ষু হলো। কে যেন বললে—এ পোড়া প্রাণ আর রাখিসনি। বিশ্বাস করো—ডুবতে যখন যাচ্ছি তখন তোমাদের কারুর কথাই আমার মনেই পড়েনি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ লোক-সমাজে মুখ দেখাবো কি করে! অনুতপ্ত কণ্ঠে বললে মেনকা।

এ ক্ষেত্রে মেনকার মনে অপ-স্পৃহা জাগবার কারণ দুঃখ আর আকস্মিক প্রহার জনিত অভিমান। ঐসময় যদি মহাদেব লজ্জা এবং ক্ষোভে বাড়ী ছেড়ে চলে না যেতো তাহলে মেনকার মনে আত্মহত্যার অপ-স্পৃহা মোটেই জাগতো না বা জাগলেও সুযোগ ও সুবিধার অভাবে ঐ জাগ্রত অপ-স্পৃহা কিছু সময় পরে আপনা আপনি সুপ্ত হ'য়ে যেতো। পারিপার্শ্বিক অবস্থা (যেমন অসুস্থ ছেলেদের যন্ত্রণাসূচক কাতরধ্বনি—ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, অনুতপ্ত স্বামীর শুকনো মুখ) সুস্থ, স্বাভাবিক করে তুলতো মেনকার অসুস্থ মন।

অপরাধের পর অনুতাপ যার আসে—সে হচ্ছে প্রাথমিক অপরাধী পর্য্যায়ভুক্ত। কাজেই তাদের সাধারণ অপরাধী পর্য্যায়-ভুক্ত করলে ভুল করা হবে। এদের শাস্তির পরিমাণ এমনই হওয়া

উচিত—যাতে এরা অনুশোচনার দ্বারা ভবিষ্যৎ জীবনে নিজেদের শুধরে নিতে পারে

প্রাথমিক অপরাধী সৃষ্টি হয় প্রথমতঃ অভাবের তাড়নায় আর দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে লোভ লোভের বশবর্তী হ'লে মানুষের মনের সুপ্ত অপ-স্পৃহা জাগ্রত হ'য়ে ওঠে। জাগ্রত অপ-স্পৃহা তখন মানুষের মনকে করে তোলে অপরাধ প্রবণ। অপরাধ প্রবণ মনের দ্বারা চালিত হ'য়ে মানুষ অপকার্য্য করে বসে।

ক্ষুধার জ্বালা—বড় জ্বালা। ক্ষুধার জ্বালার হাত থেকে বিশ্বের একটি প্রাণীরও নিষ্কৃতি নেই। ক্ষুধার উপশমের জন্য সারা বিশ্ব জুড়ে চলে আসছে যুদ্ধ বিগ্রহ, হানাহানি, কাটাকাটি, মারামারি। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ থেকে সুরু করে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ পর্যন্ত—কারুর নিষ্কৃতি নেই এই মমতাহীন রাক্ষসের হাত থেকে বিশ্বে স্থলভাগ এবং জলভাগের পরিমাণ সীমাবদ্ধ কিন্তু জীব ও অন্য জীবের কথা বাদ দিয়ে শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের কথাই ধরা যাক মানুষের সংখ্যার অন্ত শেষ নেই বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মৃত্যুহার যে অনুপাতে কমছে—জন্মহার তার তুলনায় কতগুণ বাড়ছে তা জন্ম-মৃত্যু-পরিসংখ্যা দেখলেই বোঝা যায়।

জন্মহার নিয়ন্ত্রণ না করলে খেতে পাওয়া তো দূরের কথা পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের পা রাখবারও জায়গা হবে না। এদিকে যে অনুপাতে সমাজ বা রাষ্ট্রের দৃষ্টি দেওয়া উচিত—তা তাঁরা আজও দেননি।

"দেশ ঘরে ঘরামির কাজ করতাম। আর চাষের সময় ভাগ-চাষে বাবুদের জমি চাষ-আবাদ করতাম। এলো পঞ্চাশের মন্বন্তর গাঁয়ে কাজ মিললো না ঘর যাদের ছাইতাম তাদেরই ঘর বাড়ী ভেঙে উড়িয়ে দিলে ঝড় ঝঞ্ঝাবাত। ঘর যারা ছাওয়াবে—তারাই তখন 'চাচা—আপন প্রাণ বাঁচা' করে গ্রাম ছেড়ে সরে পড়লো। দেখতে দেখতে গ্রাম শ্মশান হ'য়ে গেল। বৌটা আগেই বানের জলে

ভেসে গেসলো। ছোট ছেলেটা মরলো সাপের ছোবলে বড় ছেলেটার হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে এসে হাজির হলাম এই শহরে

আচ্ছাদন বিহীন ফুটপাথে শুয়ে থাকি আর লোকের বাড়ী ফেন চেয়ে চেয়ে দু'বাপ বেটায় খাই। বৃষ্টির জলে ভিজে আর ফেন খেয়ে খেয়ে ছেলেটা ফুলে পড়লো। বুঝলাম—এটাও আর বাঁচবে না। কিন্তু যে কদিন বাঁচে—খেতে তো দিতে হবে! ভিক্ষে-করা ফেন ছাড়া দেবার মত আর কোথায় কি আমি পাবো!

ভিক্ষে! কত লোককে ভিক্ষে দেবে বাবুরা? আমার মত হাজার হাজার অভাগা 'হা-অন্ন হা-অন্ন' করে হন্যে হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দু' একটা পয়সা ভিক্ষে করে ছেলেটাকে মুড়ি কিনে খাওয়াতাম

—বাবা! রোজ রোজ আর নুন দিয়ে ফেন খেতে ভাল লাগে না। আজ যদি দু খানা বাতাসা—, বলতে বলতে থেমে গেল ছেলেটা। বোধ হয় ভাবলে—বাবা আর কোথা থেকে বাতাসা যোগাড় করবে!

এমনি বরাত—সেদিন দয়া করে কেউ আমায় একটা পয়সাও ভিক্ষে দিলে না।—মুড়ি মুড়কীর দোকানে গিয়ে দু' খানা বাতাসা চাইলাম, ভাগিয়ে দিলে। ওদিকে বেলা দুপুর পেরিয়ে গেল। ছেলেটার পেটে সারাদিন এক ফোঁটা জলও পড়েনি।

খিদে, তেষ্টায়, দুর্ভাবনায় মাথা তখন আমার বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। বাতাসার দোকানের বিপরীত ফুটপাথে একটা রকের ওপর বসে পড়েছি। হঠাৎ দেখলাম একটি বছর দশেকের মেয়ে এক ঠোঙা বাতাসা কিনে পাশের গলিতে ঢুকলো। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত তার পিছু নিলাম। কিছুদূর গিয়ে আমি ছোঁ মেরে তার হাত থেকে বাতাসার ঠোঙাটা নিয়ে ছুট দিলাম। এগলি ওগলি ঘুরে এসে পড়লাম বড় রাস্তায়। বুক তখন আমার ভয়ে ধড়াস ধড়াস করছে। জীবনে চুরি করলাম এই প্রথম, চুরি করলে যে এতখানি ভয় হয়—তা আমার জানা ছিল না।

বাতাসা তো মিললো কিন্তু ফেন? পাঁচ সাতটা বাড়ী ঘুরলাম ফেনের জন্যে কিন্তু অত বেলায় কে আর আমার জন্যে ফেন বসিয়ে রেখেছে। হয় ফেন ফেলে দিয়েছে আর নয় কাকেও বিলিয়ে দিয়েছে। আমার মত দুর্ভাগার তো অভাব নেই ফুটপাথে।

এক হিন্দুস্থানী দ্বারোয়ান তখন সবে মাত্র ভাতের হাড়ি নামিয়েছে। ভাঁড়টি নিয়ে ধরতেই গরম ফেন ঢেলে দিলে খুশী হ'য়ে। যাক্, গরম ফেনের সঙ্গে বাতাসা পেলে ভারি খুশী হবে খোকা।

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলাম আমার সেই ফুটপাথের আস্তানায়। খিদের জ্বালায় নিশ্চয় ছট্ ফট্ করছে ছেলেটা। হায়রে বরাত!

যেখানে আমরা রাত কাটাই সেখানে এসে চমকে উঠলাম খোকাকে না দেখে! পাশের মরণাপন্ন বুড়োটাকে জিজ্ঞেস্ করলাম খোকার কথা। সে আঙুল দিয়ে অদূরে রাস্তার কলটা দেখিয়ে দিলে।

তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখি কলের ধারে মুখ থুবড়ে খোকা আমার পড়ে আছে। ডাকলাম চীৎকার করে, খোকা! খোকা! মণ্টু!

কে আর তখন সাড়া দেবে। খোকা চলে গেছে পরপারের ডাকে।

ফেনের ভাঁর আর বাতাসার ঠোঙা পড়ে গেল আমার হাত থেকে। খোকাকে বুকে জড়িয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলাম, বাপ হ'য়ে তোর মরণকালে এক ফোঁটা জলও দিতে পারলাম না। চোখ চা বাবা। তোর জন্যে যে আমি গরম ফেন আর বাতাসা—।

খোকা মরে বাঁচলো—তার হাড় জুড়ুলো, ক্ষুধার হাত থেকে সে নিষ্কৃতি পেলে কিন্তু আম। আমার মৃত্যু হলো না।

দিন দুই পরে।

পেটের জ্বালা তো পুত্রশোক মানে না। বেরুতেই হলো ফেনের চেষ্টায়। কোথাও পেলাম না এক ফোঁটা ফেন। তখন কলের জল ছাড়া পেটে কিছু পড়েনি।

দেখলাম—একটা রকের ওপর আমের ঝুড়ি মাথার কাছে রেখে পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত আমওলা ঘুমিয়ে পড়েছে। এই তো সুযোগ। এপাশ ওপাশ চেয়ে দু'হাতে দুটো আম তুলে নিলাম। কেউ দেখতে পায়নি ব'লে—ছুটলাম না। এবাব কিন্তু আগের বারের মত বুক অতটা কাঁপেনি।

পার্কে গিয়ে বসে আম দুটো গোগ্রাসে গিললাম। খেতে খেতে দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পডলো। খোকা আমাব না খেতে পেয়ে মবে গেছে।

সন্ধ্যের পর পার্কের এক কোণে ঘাসেব ওপর শুয়ে আছি। মনে বড় অনুশোচনা জাগলো। না খেতে পেয়ে শেষকালে চুরি করলাম। আমাদের বংশে কেউ কোনদিন চুরি ডাকাতি করেছে বলে তো শুনিনি। এ আমি কি কবলাম। নাঃ, খেতে না পেয়ে যদি মরেও যাই—চুরি আর করবো না।

পরদিন ভোরবেলা থেকে যে কোন একটা কাজের জন্যে ঘুরলাম কিন্তু কোথাও কাজ জোটাতে পাবলাম না। রাস্তার কলে একপেট জল খেয়ে ফুটপাথে শুয়ে পড়লাম। ভাবলাম, মুখে বলা যতটা সহজ—না খেয়ে মবা ততটা সহজ নয়।

নাইট-শো শেষ হলো। অদূরের সিনেমা হল থেকে কোলাহল মুখর নরনারী দলে দলে বেরিয়ে আসছে। পথ চলতি লোকের অসুবিধা হবে ভেবে দেয়াল ঘেঁসে শুলাম।

হঠাৎ হৈ হৈ চীৎকার। চোর! চোর! ধরুন—ধরে ফেলুন। ঐ যে—

বুকের ভেতরটা আমার ছাঁত্ করে উঠলো। দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুলাম—যেন আমারই উদ্দেশ্যে জনতা চীৎকার করে

ধরতে বলছে। যদিও জানি—আমার উদ্দেশ্যে ওরা বলছে না। হঠাৎ আমার বুকের কাছে কি একটা ছিটকে পড়লো আর একটা লোক ছুটে বেরিয়ে গেল আমার পাশ দিয়ে। ছুটন্ত লোকটার পিছনে ছুটছে অগুণতি লোক।

ছিট্‌কে পড়া জিনিষটা বুকের তলা থেকে একটু বার করে দেখি—সর্বনাশ! এ যে এক গাছা ছেঁড়া হার! বুঝতে আমার আর কিছুই বাকি রইলো না। ভয়ে আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে উঠলো, যেন আমিই চোর।

মহাদুর্ভাবনায় পড়লাম। তাইতো—এটাকে নিয়ে এখন কি করি! আমার মত লোকের কাছে এই হার দেখলে—নিশ্চয় লোকে আমাকে চোর সাব্যস্ত করবে। এ কি শুকনো বিপদে আমাকে ফেললে ভগবান! চুরি করে ধরা পড়লাম না—, এবার কি চুরি না করে আমায় ধরা পড়তে হবে! ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

—কি হে স্যাঙাৎ! ঘুমুলে নাকি! ধাক্কা দিয়ে একটা লোক আমার পিঠে ঠেস দিয়ে বসলো।

আচমকা ভেঙে গেল ঘুম। মুখ তুলে চাইলাম তার দিকে।

—চিনতে পারছো দোস্ত? মালটা কোথায়?

এতক্ষণে বুঝলাম—ইনি কে! হার ছড়াটা গুঁজে দিলাম ওর হাতে।

—হুঁ হুঁ বাবা! শোয়ার ভঙ্গি দেখেই বুঝেছিলাম—ঘাগী! তারপর—স্যাঙাৎ! কত দিন এ লাইনে?

—তোমার কথা তো আমি বুঝতে পাচ্ছিনি!

—তুমি দেখছি আমার চেয়েও সেয়ানা! বলে এধার ওধার চেয়ে পকেট থেকে একটা ধেনো মদের পাঁট বার করে খানিকটা গলায় ঢেলে দিয়ে আমার দিকে পাঁটটা এগিয়ে ধরলে।

—সারাদিন যার পেটে একটা দানা পড়েনি—সে খাবে মদ!

—সে কি! সারাদিন না খেয়ে আছিস! হারটা আমার

বুকের কাছে গুঁজে দিয়ে লোকটা চলে গেল।

ভাবছি নানা কথা—বিশেষ করে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা। এর পর অদৃষ্টে আরো কি আছে কে জানে। হঠাৎ হলো স্যাঙাতের আবির্ভাব। সালপাতায় মোড়া চারখানা মোটা মোটা পরটা আর দু'ভাড় মাংস!

—লে—সুরু কর! বলে দু'খানা পরটা আর এক ভাড় মাংস নিয়ে খেতে সুরু করলে।

সারাদিনে এক খুরি ফেন যার ভাগ্যে জুটলো না—তার সামনে পরোটা আর মাংস। একগুণ খিদে চারগুণ হয়ে উঠলো। গোগ্রাসে গিলতে সুরু করলাম।

সেদিন আর কোন কথা হলো না। দু'জনে পাশাপাশি শুয়ে পড়লাম—যেন কতদিনের বন্ধুত্ব।

—স্যাঙাৎ! চা—চা এনেছি।

কখন যে সে ঘুম থেকে উঠে চা আনতে চলে গেছে তা টেরও পাইনি। রাস্তার কলে মুখ ধুয়ে এসে দু'জনে তোয়াজ করে চা, বিস্কুট খেলাম।

আমার দুঃখের কথা বলতে বলতে দু'জনে পথ বেয়ে চলেছি। হেদোর কাছে এসে স্যাঙাৎ আমার হাতে দুটো টাকা দিয়ে বললে, হেদোর ভেতর ঐ ঝুপড়ি গাছটার তলায় তোর সঙ্গে দেখা করবো। এটার গতি করে আসি।

চোরাই হারটা বিক্রী করতে চলে গেল স্যাঙাৎ। এক সঙ্গে দুটো টাকার মুখ বহুদিন দেখিনি। খুশীতে মনটা ভরে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো খোকার কথা। স্যাঙাতের সঙ্গে আগে আলাপ হলে খোকাকে আমার না খেয়ে মরতে হতো না।

দুপুরে হোটেলে গিয়ে পেটপুরে খেলাম। ফেন খেয়ে খেয়ে ভাতের স্বাদ প্রায় ভুলেই গেসলাম। স্যাঙাতের ওপর কৃতজ্ঞতায় মনটা আমার ভরে উঠলো।

খেয়ে এসে সেই ঝুপড়ি গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়লাম। উঠলাম প্রায় সন্ধ্যার সময়। চা খাওয়া অভ্যাস নেই—তবু এক ভাঁর চা কিনে খেলাম। তাইতো—স্যাঙাৎ তো কই এলো না। ধাপ্পা দিয়ে হারটা নিয়ে চলে গেল! বিড়ি টানছি আর ভাবছি, ভাবছি আর বিড়ি টানছি।

হঠাৎ পিঠের ওপর একটা চাপোড় পড়লো, কি স্যাঙাৎ! ঘাবড়ে গেসলি তো? ওরে ভাই—আমরা হলাম জাত-সেযানা। নিমক-হারামী আমরা করি না। এই নে তোর হিস্যে!

ছোট্ট একতাড়া নোট আমার হাতে গুঁজে দিলো স্যাঙাৎ।

—চল—একটু ভাল চা খাওয়া যাক।

দু'জনে চা খেয়ে একটা সিনেমার কাছাকাছি এসে পডলাম গল্প করতে করতে।

কতগুলো হা-ঘরে পড়ে আছে ফুটপাথে। স্যাঙাৎ চলতে চলতে থেমে গিয়ে ওদেরই পাশে একটা জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বললে, আজ এইখানে শুয়ে থাকবি সিনেমা ভাওবার সঙ্গে সঙ্গে। এ শো নয়—নাইট শোয়ে। বুঝলি না—রাস্তা ঘাট তখন ফাঁকা হয়ে আসবে আর রাতের শোতে লোকজনও হয় কম। ঐ হচ্ছে ছিনতাইয়ের সময়। আচ্ছা, তুই খাওয়ার পাট চুকিয়ে নে। আমি একটু ডেরায় গিয়ে ড্রেস বদল করে আসি।

সে দন সুবিধা হলো না ছিনতাইয়ের।

বিরস বদনে স্যাঙাৎ ফিরে এসে বললে, ছুটি—কাল থেকে স্রেফ ছুটি।

—ছুটি!

—ছুটি মানে রেস্তো যে কদিন না ফুরুচ্ছে—সেই ক'দিন কাজে মন বসে না! স্রেফ খাও দাও স্ফুর্তি করো। চললুম—

—কোথায় দেখা হবে?

—ঐ যে—হেদোর ঐ ঝুপড়ি গাছের তলায়। যাই—বিনা মৌতাতে মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে।

—কোথায় থাকো তুমি?

—রামবাগানে ঝুমরি বিবির মাঠকোঠায়! বলেই স্যাঙাৎ চলতে সুরু করলে—একটা সিনেমা-গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে।

নোটের বাণ্ডিলটা গুণে দেখলাম—কুড়ি টাকা। গাঁয়ে দিন-মজুরি করে খেতাম। একসঙ্গে এতোগুলো টাকা জীবনে আমার হাতে কোন দিন এসেছে বলে তো মনে পড়ে না! টাকার আনন্দে দিশেহারা হ'য়ে গেলাম।

আর কাজ কর্মের চেষ্টা করতে মন চায় না। অনেক দিন খেতে পাইনি। আশা মিটিয়ে ভাল ভাল জিনিষ খাই খেতে খেতে মনে পড়ে বাচ্চাদের কথা, বৌটার কথা।

দু' দিন আর স্যাঙাতের দেখা নেই।

তিন দিনের দিন দুপুরে স্যাঙাৎ ফিরে এসে বললে, খেল্ খতম্—পয়সা হজম। পকেটে যা কিছু পুঁজি-পাটা ছিল—সব ফুঁকে দিয়েছি। দে—একটা বিড়ি দে!

খাওয়া তো দূরের কথা—বিড়ি খাবারও পয়সা নেই স্যাঙাতের পকেটে। খাবারের দোকান থেকে আমারই পয়সায় পুরী কিনে এনে খাওয়ালাম তাকে। বললে, আজ রাতে শিকার জোটাতেই হবে! প্রথম দিন তুই যেখানে শুয়েছিলি—সেখানে শুয়ে থাকবি, ঐ জায়গাটার পয় আছে।

এই ভাবে একদিন রোজগার আর সেই রোজগার ফুরিয়ে না যাওয়া পর্য্যন্ত বিশ্রাম।

মাস তিনেক এইভাবে কাটলো।

ধরা পড়লাম আজ। ছিনতাই হারটা আমার বুকের কাছে ছুঁড়ে দিয়ে স্যাঙাৎ হাওয়ার মত ছুটে বেরিয়ে গেল। একটু বেকায়দায় ছোঁড়ার দরুন রাস্তার লোকের দৃষ্টি আমার ওপর পড়লো।

আমি তাদের বুঝিয়ে বললাম, হার চুরি করলে একজন আর আমি হলাম চোর!

—তুই যদি ওর দলের লোক নস—ও তাহলে হারটা ছুঁড়ে দিল কেন?

—তা আমি কেমন করে বলবো!

আমার কথায় কেউ বিশ্বাস করলে না। চোরের সাকরেদ ভেবে ঐ হার সমেত আমাকে থানায় ধরে নিয়ে এলো। আমার কিন্তু বাবু একটা অনুরোধ। দোষ যখন করেছি তখন যা খুশী সাজা আপনারা আমায় দিন, কিন্তু একটা পেট চালাবার মত যে কোন কাজ আমায় জোগাড় করে দিন—যাতে ভবিষ্যতে পেটের জ্বালায় চুরি-চামারি আর না আমায় কোনদিন করতে হয়।

লোকটির কাজে এবং কথায় প্রমাণ হচ্ছে যে সে প্রাথমিক অপরাধী বা দৈব অপরাধী। অপরাধ করবার ইচ্ছা তার ছিল না কিন্তু দৈবের বিড়ম্বনায় বেচারা বাধ্য হলো অপকার্য্য করতে। তার সুপ্ত অপ-স্পৃহাকে জাগিয়ে তুললে সবার চেয়ে বড় জ্বালা—পেটের জ্বালা।

অনুতপ্ত হ'য়ে যখনই সে অপ-স্পৃহার হাত এড়াতে চাইছে তখনই তাতে ইন্ধন যোগালে অভ্যাস অপরাধী 'স্যাঙাৎ'। তার অবচেতন মন এই বলে তাকে সান্ত্বনা দিলে—প্রত্যক্ষ চুরি তো সে করছে না, করছে অন্য লোক। পরোক্ষ ভাবে সে স্যাঙাত্‌কে সাহায্য করছে মাত্র। সৎভাবে থেকে খেটে খেতে সে তো চেয়েছিল কিন্তু কেউ তাকে কাজ দিলে না। বেঁচে থাকতে সকলেই চায়—বেঁচে থাকার অধিকার সকলেরই আছে, কিন্তু শুধু মাত্র কলের জল খেয়ে তো আর মানুষ বাঁচতে পারে না! স্যাঙাৎ তাকে কাজ দিয়েছে—খেতে দিচ্ছে—বাঁচতে সাহায্য করছে। স্যাঙাতের ওপর কৃতজ্ঞ হ'য়ে উঠতে প্ররোচিত করলে তার অবচেতন মন—জাগ্রত অপ-স্পৃহা।

ঠিক সময়ে ধরা না পড়লে সে যে অভ্যাস-অপরাধীতে পরিণত হতো এ কথা ধ্রুব সত্য। এখন শোধবাবার সময় আছে ও খেটে খাবার কাজ যদি না পায় তাহলে বাধ্য হ'য়ে আবার অপকার্য্যই স্রুরু করবে—কারণ অপকার্য্যের স্বাদ সে একবার পেয়েছে। অৰ্দ্ধ সুপ্ত অপ-স্পৃহা পূর্ণ মাত্রায় জাগ্রত হ'য়ে সহজেই তাকে অভ্যাস-অপরাধীতে পরিণত করবে।

জমিদারী সেরেস্তায় গোমস্তাগিরির কাজ করেন প্রতুল ব্যানার্জি নায়েবের অধীনে। প্রজাদের খাজনা তাকে আদায় করতে হয়। মাইনে যা পায় তাতেই কষ্টে-শিষ্টে চলে যায় সংসার। সাতটি ছেলে মেয়ে, বুড়ো মা আর স্ত্রী—এই নিয়ে তার সংসার। তরি-তরকারী বড় একটা কেনে না। পুকুরের কলমী শাক, শুষনী শাক, বাগানের ঢেড়স, বেগুণ, কুমড়ো, উচ্ছে, চিচিঙ্গে—আর পুকুর, ডোবা থেকে কুড়ো-জাউলিতে ধরা চুণো-চানা মাছ—জোগাড় করে দেয় বুড়ো মা আর বাড়ীর ছেলেপুলেরা, স্ত্রী রান্না করে—করে সংসারের যাবতীয় কাজ। জামা কাপড় ধোপার বাড়ী দেবার সামর্থ না থাকায় ক্ষারেই সিদ্ধ করে কেচে নেয়। ইস্ত্রি করার বালাই নেই।

বড় দুটি মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, আরো দুটি বিয়ের উপযুক্ত হ'য়ে উঠেছে কিন্তু অর্থাভাবে তাদের বিয়ে দিতে পাচ্ছেন না বাড়ুজ্যে মশাই। দু'পাঁচ ঘর যজমান আছে কিন্তু পূজো-আচ্চার বালাই সবাই কমিয়ে এনেছে। বার মাসে তের পার্বণ আর নেই। শ্রাদ্ধ-শান্তি করে দু'পাঁচ পয়সা আগে যা হোক ঘরে আসতো—আজকাল তাও নেই। মৃত্যুহার কমে গিয়ে মানুষের মরবার আর নামটি নেই। দু'একজন মাঝে মিশলে যমের খপ্পরে যদিও বা পড়ে—তা তাদের আত্মীয় স্বজন বৃষ-উৎসর্গ বা তিলকাঞ্চনের বা ষোড়শের পরিবর্তে কলার পাতে পিণ্ডদান করেই স্বর্গীয় বা স্বর্গীয়ার আত্মার তৃপ্তি সাধন করে থাকেন।

হাজার দুঃখ কষ্টের মধ্যেও বাড়ুয্যে মশাই কোনদিন আদায়ী খাজনা তছরূপ করবেন না বা ও কথা তাঁর মনেই জাগে না।

হঠাৎ বাড়ুয্যে মশাইয়ের মা একরকম বিনা নোটিশেই মারা গেলেন। ঘরে নেই একটি পাই পয়সা। গিন্নীর হাতে কাচের চুড়ি, নোয়া গাছটি সম্বল। নায়েবমশাই গেছেন মহলে। সেদিন তার ফেরা সম্ভব নয়। মায়ের শেষ কাজ করবার জন্য গাঁয়ের লোকের কাছে হাত পাততে তাঁর মর্য্যাদায় বাধলো।

প্রজাদের আদায় করা খাজনার কিছু টাকা তাঁর কাছে ছিল—সেই টাকা দিয়ে মায়ের শেষ কাজ শেষ করে এলেন। কাছা গলায় দিয়েই ভাবতে হলো শ্রাদ্ধের ভাবনা।

যজমানরা যা সাহায্য করলেন তা যৎসামান্য। মাথা কামিয়ে ঘাটে ওঠবার পয়সাও হলো না। চিন্তায় পড়লেন ভদ্রলোক। যে টাকা সেরেস্তা থেকে লুকিয়ে নিয়েছেন তা-ই শোধ হলো না আবার তা থেকে টাকা ভাঙা কি সমীচিন হবে।

দেখতে দেখতে শ্রাদ্ধের দিন ঘনিয়ে এলো। নায়েবমশাই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। একেই বলে—বরাত! না চাইতেই তিনি কিছু সাহায্য করলেন। কিন্তু সব দিক বজায় কবতে না পেরে নিরুপায় বাড়ুয্যেমশাই আবার খাজনার টাকা ভেঙে বসলেন।

মিটে গেল শ্রাদ্ধ-শান্তি। কিন্তু অশান্তিতে মনটা তাঁর ভরে উঠলো। কেমন করে লুকিয়ে নেওয়া টাকা তিনি পূরণ করবেন তা কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারলেন না।

হঠাৎ নায়েবমশাই মারা গেলেন। তাঁর জায়গায় সদর থেকে এলো এক নতুন নায়েব! সর্বনাশ আর কাকে বলে। চোখে অন্ধকার দেখলেন বাড়ুয্যেমশাই। ভেবে চিন্তে বাপ-পিতামহের বাস্তুভিটেটা বাঁধা দেওয়াই সাব্যস্ত করলেন। কিন্তু বাঁধা রাখবে কে! নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে তিনি টাকার জোগাড় করতে উঠে পড়ে লাগলেন। কিন্তু কোথাও টাকার যোগাড় করতে পারলেন না।

সদরে খাজনা জমা দেবার দিন তিনি নতুন নায়েবকে গিয়ে সব কথা খুলে বললেন।

অশ্রুসজল চোখে নায়েবের ছুটি হাত ধরে বললেন বাড়ুয্যে মশাই, কি অবস্থায় পড়ে আমি একাজ করতে বাধ্য হয়েছি তাতো সব আপনাকে বললাম। এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে আপনি বাঁচান!

—বাঁচাবার মালিক আমি নই। ষ্টেটের ম্যানেজার ইচ্ছে করলে আপনাকে বাঁচাতে পারেন। আপনার হয়ে আমি তাঁকে বলবো। বললেন নতুন নায়েব।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বাঁচা তার হলো না। তহবিল তছরূপ করার জন্য শেষ পর্য্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে জেলেই যেতে হলো।

লোভ মানুষের আর এক শত্রু। এই তৃতীয় রিপুর বশবর্তী হ'য়ে লোকে অপকার্য্য করে থাকে বিনা প্রয়োজনে। দুষ্টু প্রকৃতির লোক নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ভাল লোকের মনে অপ-স্পৃহা জাগিয়ে তুলে তাকে দিয়ে অপকার্য্য করিয়ে নেয়। বাক্-চাতুর্য্যে সুস্থ মনোবৃত্তি সম্পন্ন লোকের সুপ্ত অপ-স্পৃহা জাগিয়ে তোলা খুব বেশী শক্ত কাজ নয়। —বিশেষ করে সেই সুস্থ মনোবৃত্তি সম্পন্ন লোক যদি দুর্বল চিত্ত হয়।

সিমেণ্ট কণ্ট্রোলের যুগ।

খড়্গাপুর থেকে হাওড়া পর্য্যন্ত ইলেকট্রিক ট্রেণ চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ট্রেণ চালু হবে—নতুন লাইন পাতার তোড় জোড় সুরু হ'য়ে গেছে। প্রায় প্রতিটি ষ্টেশনে তৈরী হচ্ছে নতুন প্লাটফর্ম, নতুন কেবিন ঘর। কনট্রাক্টারদের ভেতর ষ্টেশন ভাগ করে দেওয়া হয়েছে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করবার জন্য।

কোন একটি বড় ষ্টেশনের কনট্রাক্ট পেয়েছেন মিষ্টার পি। বিল্ডিং কনট্রাক্টারী কাজে অভিজ্ঞ প্রৌঢ় মিত্র মশাইকে তিনি তাঁর

প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত করলেন। বিশ্বাসী লোক হিসাবে মিত্র মশাইয়ের নাম আছে। টাকা পয়সা থেকে সুরু করে গো-ডাউনের চাবিটি পর্য্যন্ত থাকে তাঁরই জিম্মায়। করিতকর্মা লোক এই মিত্র মশাই। কেমন করে অল্প খরচে লোকজনকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হয় তা তাঁর ভাল রকমই জানা আছে। দরকার হলে চোখও রাঙান আবার পিঠ চাপড়ে সময় বিশেষে হেসেও কথা বলেন। তবে ফাঁকি দিয়ে কেউ তার কাছ থেকে একটি কাণা কড়িও আদায় করতে পারে না—এমনি তাঁর সজাগ দৃষ্টি।

—আসবার সময় এক ঠোঙা সিমেন্ট তোমাদের অফিস থেকে এনো তো! বলেছিলেন তাঁর স্ত্রী।

এক ঠোঙা সিমেন্টই তিনি নিয়ে গেসলেন—তবে তাঁর অফিস থেকে নয়—দোকান থেকে ব্র্যাকে কিনে

মাটিকাটা দেড়শো কুলির সর্দার ভুবন প্রায়ই এসে গল্প করে অন্যান্য ষ্টেশনের কুলির সর্দারদের কথা, এবং তারা যে ভুবনের চেয়ে অনেক বেশী আয় করে সেটাও বলে আকারে ইঙ্গিতে। মিত্র মশাই বোঝেন সব তবে কোন প্রশ্রয় দেন না।

সেদিন ভুবন মাইতি এসে বললে, বাবু! আজ হপ্তা শেষ হলো—আমাদের হিসেব গণ্ডা চুকিয়ে দিন

—তা নিয়ে যা। তবে তোদের হঠাৎ এক সঙ্গে সবার টাকার দরকার পড়লো কিনা, তাইতো আমার খটকা লাগছে।

—খটকা লাগার আর কি আছে বাবু। আমি আপনার কাজে ইস্তফা দিলুম।

—তার মানে?

—অমুক ইষ্টিশনে আমি কাজ পেয়ে গেছি। তেনারা আমার দেড়শো লোককেই নিতে চাইছেন।

—তাদের রোজ কি বেশী?

—না হুজুর, রেট একই।

—তবে আমি কি অপরাধ করলাম যে তুই আমায় ছেড়ে ওদের ওখানে যাচ্ছিস? তা ছাড়া তোরা হঠাৎ বিনা নোটিশে চলে গেলে আমার অবস্থাটা কি হবে ভেবে দেখেছিস? মাত্র আর কটা মাস আছে, এর মধ্যে আমার কাজ তুলে দিতে হবে।

—সে আর আমরা কি করবে: গরীব মানুষ আমরা। আমাদেরও তো খেয়ে পরে বাঁচতে হবে আপনি যেমন আপনার দিকটা দেখছেন—আমাদেরও তো তেমনি আমাদের দিকটা দেখতে হবে!

—মজুরির রেট যখন এক তখন তুই ওদের ওখানে যেতে চাস কেন?

—রেট এক হলে কি হবে হুজুর' ওখানে যে উপরি আছে

—উপরি।

—তা, ধরুন—একশো এবং কুড়ি কুলি কাজে এলো—খাতায় লেখা হয়ে গেল একশো চল্লিশ জন ঐ বিশ জনের মজুরিটা বাবুর সঙ্গে কুলি সর্দারের আধাআধি বখরা হয়ে গেল কুলি-সর্দারেরও তো দলের লোককে ঠিক রাখতে খরচা আছে বাবু' মাঝে মাঝে ওদের খুশী না করলে দল যে ভেঙে যাবে ওদের খাটিয়েই তো আমি খাই! বললে ভুবন মাইতি মোলায়েম কণ্ঠে।

গুম খেয়ে বসে রইলেন মিত্র মশাই প্রকারান্তরে ভুবন মাইতি তাঁকে চুরি করতে উৎসাহিত করছে। তিনি যদি তার প্রস্তাবে সম্মত না হন—তা হলে তাঁর সমূহ বিপদ। নির্দ্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করতে না পারলে বিল পাশ হবে না, মনিব তাঁর পথে বসবেন। ভুবন মাইতি বাইরে গিয়ে তাঁর নামে যে বদনাম না দেবে—এ কথাও জোর করে বলা যায় না এমন 'সাপের ছুঁচো গেলা' অবস্থায় জীবনে তিনি কোনদিন পড়েননি। টোপ যা ফেলেছে ভুবন মাইতি —এমনই সাঙ্ঘাতিক টোপ যা না গিলে সাঁচ্চা মিত্তির মশাইয়ের

গত্যন্তর নেই। যেমন করেই হোক কাজ তাঁকে শেষ করে দিতেই হবে নইলে মনিবের কাছে মুখ দেখাবেন কেমন করে!

রাজি হ'য়ে গেলেন মিত্র মশাই।

মাস কয়েকের মধ্যে অনিচ্ছাকৃত উপরি উপার্জ্জনের পয়সায় তাঁর সিন্দুকের একটা কোণ ভরে উঠলো। সিন্দুক খুললেই চোখে পড়ে—সিন্দুকের আর তিনটে কোণ একেবারে খালি।

অর্দ্ধসুপ্ত অপ-স্পৃহা জাগ্রত হ'য়ে বলে, ভরবে—ভরবে—ও তিনটে কোণও ভরবে। একটু চেষ্টা করলেই ভরবে।

দিন যায়।

—কি হে মাইতি! কি খবর?

এধার ওধার চেয়ে মাইতি বললে, হুজুর! সিন্দুকের পর সিন্দুক লোকে ভরিয়ে ফেললে—শুধু আপনিই কিছু করতে পারলেন না।

তিন কোণ খালি সিন্দুকের কথা মনে পড়লো মিত্র মশাইয়ের। অন্তরের অর্দ্ধসুপ্ত অপ-স্পৃহা চোখ মেলে চাইলে। তৃতীয় রিপু মনের কানে কানে বললে, লোকের সিন্দুকের পর সিন্দুক ভর্ত্তি হচ্ছে কিন্তু তোর একটা সিন্দুকও ভর্তি হলো না। সময় থাকতে কাজ গুছিয়ে নিতে পাচ্ছিস না! তুই একটা অপদার্থ

—বুঝলাম না তোর কথা!

—আর কবে বুঝবেন হুজুর! এ হচ্ছে মুলো ক্ষেত। সময় থাকতে না তুললে—

মিত্র মশাই সাগ্রহে বললেন, তোর ও সব হেঁয়ালী রাখ বাবা! স্পষ্টা-স্পষ্টি বল—কি বলতে চাস?

টুলটা এগিয়ে নিয়ে এলো মাইতি টেবিলের ধারে। ঈষৎ চাপা গলায় বললে, সিমেন্ট তো গুদোমে পচছে। কাজ যা বাকি আছে—তাতে ওর অর্দ্ধেকও লাগবে না। সময় থাকতে কিছু করে নিন না।

—তা কেমন করে সম্ভব মাইতি। রোজ যে-ক'বস্তা খরচ হয় তার তো একটা হিসাব রাখতে হয় খাতা কলমে।

—আরে মশাই! খাতা কলম তো আপনারই হাতে। খরচ হলো পনের বস্তা—খাতায় লেখা হলো বিশ বস্তা। দিনকে দিন কে আপনার খাতা হালটে দেখতে আসছে?

ক্ষণেক নীরবতার পর মিত্র মশাই বললেন, কিন্তু এ যে একেবারে পুকুরচুরি মাইতি! না—না, এতটা অবিশ্বাসের কাজ আমি করতে পারি না।

খেদ-বিজড়িত কণ্ঠে বললে মাইতি, কি আর আপনাকে বলবো হুজুর! আচ্ছা—একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করি। সেদিন খোদ মালিকের তো আপনি দেড় লাখ টাকার বিল পাশ করিয়ে আনলেন। যা লাভ হলো তার টাকা পিছু একটা নয়া পয়সা কি আপনি বকশিস হিসেবে পেয়েছেন? কিন্তু টাকাটা তিনি পেলেন কার জন্যে—আপনার আমার জন্যেই তো? মাস-কাবারি আপনার যা আটকে বাঁধা—তাই। তাহলে আপনার বিশ্বাসের মর্য্যাদাটা কোথায় রইলো আমাকে বলবেন?

—তুমি যে দেখছি আজকালকার কম্যুনিষ্টদের মত কথা বলছো হে?

—আজ্ঞে—গাঁয়ের স্কুলে ক্লাস সিক্স অবধি পড়ে আজ কুলির সর্দারি কচ্ছি। আমি ওসব 'ইষ্ট্ ফিষ্ট্' বুঝি না—আমি বুঝি আমার পেট

মিত্র মশাইয়ের অপ-স্পৃহা মাইতির বাকচাতুর্য্যে সজাগ হ'য়ে উঠেছে। কাঁচা টাকা উপরি পাওনার লোভে বেশ উৎসাহের সঙ্গেই বললেন, তা তুমি আমায় কি করতে বল?

—ঝেড়ে দিন ব্ল্যাকে।

—খদ্দের—মানে বিশ্বাসী খদ্দের পাবো কোথায়?

—সে ভাব আমার। এক বস্তা সিমেন্টের জন্যে লোক হন্যে কুকুর হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে পথে ঘাটে।

—কিন্তু গুদোম থেকে পাচার করবো কেমন করে?

—আমাদের তো দু'খানা লরী আছে। কাজের তাগিদ দেখিয়ে হপ্তায় একদিন করে আর একখানা বাড়তি লরী ভাড়া নিন। আমার লোক ঐ ভাড়া করা লরীতে দিন দুপুরে মাল তুলেও দেবে আবার খালাস করেও দিয়ে আসবে। আগাম টাকা—পরে ডেলিভারী!

মুখ চুণ করে মিত্র মশাই বললেন, দেখো—শেষকালে হাতে দড়ি পড়বে না তো?

—আমার ভাগটা হুজুর—ঠিক ঠিক দিয়ে যাবেন, ব্যস। সব ঝক্কি আমার। আজ তাহলে আসি হুজুর! বলে সানন্দে চলে গেল মাইতি।

ছ'মাসের মধ্যে মিত্র মশাইয়ের সিন্দুকের চারটি কোণই ভরে উঠলো চুরি করা সিমেণ্ট বিক্রির উপরি পয়সায়। মাইতি এখন আর বিড়ি খায় না—খায় কাঁচি সিগারেট।

কাজ প্রায় শেষ হয়ে আসছে। মাইতির সাহায্যে মুলো ক্ষেত উজাড় করতে সুরু করলেন মিত্র মশাই বে-পরোয়া ভাবে।

নিয়তির চক্র আর কাকে বলে!

আট-ঘাট বেঁধে কাজ করলে কি হয়—শেষ পর্য্যন্ত কাল করলে এক ব্যাটা কুলি। তার বেয়াদপীর জন্যে মাইতি তাকে জবাব দিয়েছিল। সে তখন ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে এলো মিত্র মশাইয়ের কাছে। মাইতি যাকে জবাব দিয়েছে তাকে তিনি কাজ দেন কেমন করে! মাইতি আরো চটে গেল তার ওপর। কাজ সে পেলে না।

থানায় গিয়ে আগেই সে জানিয়ে রেখেছিল। ছদ্মবেশী পুলিশ আশ পাশেই গা ঢাকা দিয়ে ছিল, লরী থেকে সিমেণ্ট খালাসের সময় হাতে-নাতে ধরিয়ে দিলে কুলিটা।

একসঙ্গে ধরা পড়লো মাইতি আর মিত্র মশাই। ব্ল্যাকে যে

লোকটি সিমেণ্ট কিনেছিল—প্রমাণ অভাবে সে কেটে বেরিয়ে গেল। 'হুজুরের' হুকুম তামিল করেছে বলে মাইতিও রেহাই পেলে—রেহাই পেলেন না শুধু মিত্র মশাই।

বিচারে তাঁর সাজা হলো মোটা টাকা জরিমানা—অনাদায়ে জেল।

—না বাপু—জেনে শুনে তোমায় আমি চাকরী দিতে পারি না! একবার যখন তোমায় হাত-টান রোগে ধরেছে তখন ও রোগ তোমার বাড়বে বই সারবে না। বললেন বড় একটি তেল কলের মালিক।

কাকুতি-মিনতি করে যুবকটি বললে, দেখুন—ভুল মানুষ মাত্রেই করে থাকে!

—কিছু মনে করো না বাপু। সব ভুলের ক্ষমা আছে কিন্তু চুরি করে কেউ যদি বলে 'ভুল করে ফেলেছি' তাহলে তাকে কেউ ক্ষমা করেনা, যে জন্যে তোমাকে ছ'টি মাস খেটে আসতে হ'য়েছে।

—দেখুন—ক্যাস থেকে টাকা আমি ভেঙেছিলুম সত্যি কথা, কিন্তু সে টাকা মেরে দেবার মতলব আমার ছিল না।

—ভেবেছিলে—রেশে মোটা টাকা জিতে লাভের অঙ্ক পকেটস্থ করে ক্যাসের টাকা ক্যাসে ফিরিয়ে দেবে সবার অজান্তে। কিন্তু রেশ খেলতে গিয়ে অফিসের টাকা তো গেলই—উপরন্তু হ'লে সর্বস্বান্ত। তাহলে বুঝে দেখ—লোভ তোমায় কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলেছে!

ক্ষণেক নীরবতার পর যুবকটি বললে, এক রেশুড়ে বন্ধু আমার মাথায় ঐ কুবুদ্ধি না ঢোকালে আজ আর আমায় পথে বসতে হতো না!

—লোভের জন্যে চোর সাব্যস্ত হ'য়ে তোমায় জেল পর্য্যন্ত খাটতে হলো! এর চেয়ে দুঃখের কথা—

—আপনি আমায় বাঁচান। ছেলে পুলে নিয়ে এই দুর্দিনে না

খেয়ে মরতে বসেছি। যে কোন সরকারী-টরকারী একটা কাজ দিয়ে—, বলতে বলতে কেঁদে ফেললে যুবকটি।

মালিক ক্ষণেক চিন্তার পর বললেন, জেনে শুনে তোমার মত জেল ফেরতা আসামীকে আমি সরকারী কাজে বহাল করি কি করে। সরকাররাই তো বাজার থেকে টাকা-কড়ি আদায় করে। ক্যাস ভেঙে যে জেলে গেছে তাকে আমি বিশ্বাস করি কেমন করে!

—আপনার গদিতে খাতা লেখার একটা কাজ দিন। যা মাইনে দেবেন তাতেই আমি রাজি।

—অন্য জায়গা চেষ্টা-চরিত্র করে দেখ না বাপু! আমায় রেহাই দাও।

—বহু জায়গায় গেছি। জেল ফেরতা শুনে কেউ কাজ দিলে না।

—হুঁ। আচ্ছা, কাল থেকে তুমি কাজে এসো। অনিচ্ছাসত্বেও কেন তোমায় আমি কাজ দিলাম জানো? তোমার সত্যিকথার জন্যে। তুমি যে জেল ফেরতা আসামী—একথা গোপন করোনি বলে।

অপ-স্পৃহা মানুষ মাত্রেরই অন্তরে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। সেই সুপ্ত অপ-স্পৃহা জাগ্রত হয় পারিপার্শ্বিক অবস্থা-বিপর্যায়ে। যুবকটির অবচেতন মনের সুপ্ত অপ-স্পৃহাকে জাগিয়ে তুললে তার বন্ধু। রেশ খেলে রাতারাতি বড়লোক হবার লোভ দেখালে। লোভের মোহে পড়ে অফিসের ক্যাস ভাঙা যে একটা মারাত্মক অপরাধ—তা সে ভাবতেও পারলে না। চোর যখন চুরি করে তখন সে ভাবে না যে সে ধরা পড়বে, অবশ্য স্বভাব-অপরাধীদের কথা স্বতন্ত্র।

যুবকটিও ভেবেছিল যে ঠিক সময়ে সে ভাঙা-ক্যাস পূরণ করে দেবে—অন্য লোকে জানবার আগেই। জাগ্রত অপ-স্পৃহা তাকে ভাবতে দেয়নি যে রেশ খেলায় লাভের চেয়ে লোকসানের মাত্রাই

বেশী। ভাগ্য যদি তার প্রসন্ন না হয় তাহলে তার ক্যাস ভাঙার পরিণাম কি হবে—সেটা তার অপরাধ-প্রবণ মনে একবারও জাগেনি। লোভের বশবর্তী হ'য়ে এইভাবেই মানুষ প্রাথমিক অপরাধী হয়ে থাকে।

অবস্থা বিপর্য্যয়ে আজ সে অনুতপ্ত। সৎপ্রেরণা জেগেছে তার মনে। তা যদি না জাগতো তাহলে অতীব দুঃখের সঙ্গে সে তার বিগত দিনের ইতিহাস চাকরী যোগাড় করতে গিয়ে ব্যক্ত করতে পারতো না। আত্মগোপন করে অন্যত্র কাজে বহাল হয়ে আবার অপকার্য্য করে বসতো।

অনুতপ্ত যুবক যদি কোন কাজ জোগাড় করতে না পারতো তাহলে বাঁচার তাগিদে হয়তো তার মনে প্রবল হ'য়ে উঠতো অপ-স্পৃহা। সে অপকার্য্যের পর অপকার্য্য করে একদিন পরিণত হতো অভ্যাস অপরাধীতে।

জেল ফেরতা আসামী আর পথ-ভ্রষ্টা নারী মাত্রেই যে পরিত্যজ্য —একথা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলে সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষতি ছাড়া মঙ্গল হবে না।

অভ্যাস অপরাধীদের মত পাকা প্রাথমিক অপরাধীরা সহজেই ধৈর্য্য হারায় না। অভ্যাস অপরাধীদের কাজ হচ্ছে—'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকির খাতায় শূন্য থাক'। ধৈর্য্য ধরে তারা চুরি করতে পারে না। পাকা পোক্ত প্রাথমিক অপরাধীদের ধৈর্য্য অসীম। অপকার্য্য করতে করতে ক্রমশঃ এরা সাহসী হ'য়ে ওঠে। একাধারে ধৈর্য্য, সাহস এবং বুদ্ধি হয় এদের অপকার্য্যের সহায়ক

গ্রীষ্মকাল।

পল্লীগ্রামে রাত শেষ হতে না হতেই অর্দ্ধেক জেগে যায়। ভোরের আলো তখনও ফুটে ওঠেনি। অস্পষ্ট আলো-আঁধারে দূর থেকে লোক দেখা যায় কিন্তু চেনা যায় না।

বিশ্বেশ্বর শারিরীক কাজ শেষ করে গাড়ু হাতে নিয়ে বাগানের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। দেখলেন—মস্ত বড় একটা পুঁটুলি আর একটি ট্রাঙ্ক মাথায় নিয়ে একটা লোক খিড়কী দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো।

—কে—কে যায় ?

লোকটা বামাল সমেত ছুট মারলে। গাড়ু ফেলে বিশ্বেশ্বরবাবু "চোর! চোর!" বলে চেঁচাতে চেঁচাতে তার পিছনে ধাওয়া করলেন। সামনে একটা বেড়া ছিল। সেটা লাফিয়ে ডিঙুতে গিয়ে পায়ে বেধে হুমড়ি খেয়ে পড়া মাত্র বিশ্বেশ্বরবাবু পিছন থেকে গিয়ে তার একটা হাত সজোরে চেপে ধরলেন। কিন্তু তেল বা ঐ জাতীয় কোন জিনিষ লোকটা গায়ে মেখেছিল তাই ধরেও ধরতে পারলেন না, পিছলে গেল হাতটা।

বিশ্বেশ্বরবাবুর চীৎকারে লোকজন তখন এসে গেছে। ধরা পড়ার ভয়ে বামাল ফেলে স্থলপথ ছেড়ে জলপথের আশ্রয় নিলে—ঝাঁপিয়ে পড়লো পুকুরে। উদ্দেশ্য—লোকজন বিপরীত পাড়ে গিয়ে পৌঁছাবার আগেই সে সাঁতরে ও পাড়ে উঠে পাড়ি জমাবে বন বাদাড় ভেঙে।

এক দমে ডুব সাঁতার কেটে ওপারে উঠে দেখলে—লোকজন আগেই এসে গেছে। কারো হাতে লাঠি, কারো হাতে বর্ষা, কারো বা হাতে রাম দা। বেশী পাঁয়তাড়া না করে চোরটা বললে, ধরা তো আমি পড়েইছি তবে আপনারা আমায় মেরোনি।

কে তার কথা শুনছে! রাম ধোলাই দিয়ে তাকে পিছমোড়া করে বাঁধা হলো। পায়ে শুদ্ধো দড়ি বেঁধে খবর দেওয়া হলো থানায়।

চোরের আত্মকাহিনী :—এর আগে দু'দিন ভিখিরী সেজে এসে সুযোগ সন্ধান সব নিয়ে গেছি। গতকাল সন্ধ্যে জ্বালবার ঠিক আগে—বাড়ীর মেয়েরা যখন পুকুর ঘাটে গা-হাত ধুতে কাপড় কাচতে

গেল—তারই এক ফাঁকে সদর দরজা দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ি। কর্তাবাবু একা থাকেন—সেটা আগেই খবর নিয়েছিলুম আর ঘরটাও তাঁর চিনে গেসলুম। কর্তাবাবুর ঘরের নাদনায় উঠে চুপ করে বসে রইলুম। মশার ভনভনানির জ্বালায় কান পাতা দায়। হাজার হাজার মশা কামড়াতে এসে গায়ের সঙ্গে লেপ্টে গেল। লেপ্টে যাবে না—চর্বি গালিয়ে রেড়ির তেলের সঙ্গে মিশিয়ে সারা গায়ে মাথায় মেখে এসেছি।

গরম কালে লোকে ঘুমিয়ে পড়ে শেষ রাতে। তাই বাড়ীর লোক ঘুমিয়ে পড়তে আমি চুপিসাড়ে নাদনা থেকে নেমে সব গোছগাছ করে নিতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু গোছগাছ আমার শেষ হবার আগেই কর্তামশাইয়ের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি গাড়ু নিয়ে খিড়কী দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লেন। লোকে কথায় বলে, 'অতি লোভে তাঁতি নষ্ট!' আমার দশা ঠিক তাই হলো। যা হাতিয়ে-ছিলাম তাই নিয়েই কর্তামশাইয়ের পেছনে পেছনে বেরিয়ে পড়লে কেউ আমার টিকির নাগালও পেতো না। পাঁচ মিনিটের এদিক ওদিকে সব পণ্ড হ'য়ে গেল। দাগী আসামী আমি। হাতে-নাতে ধরা যখন পড়েছি তখন মাস কয়েক জেলের ভাত খেতেই হবে।

—লোকটির অভ্যাস-অপরাধীতে পরিণত হতে আর দেরি নেই। অপকার্য্যের জন্য তার মনে অনুতাপ বা অনুশোচনার বালাই নেই। তার অন্তর্নিহিত সুপ্ত অপ-স্পৃহা জাগ্রত হ'য়ে উঠেছে। অপরাধকে সে আর অপরাধ বলেই ভাবতে পারছে না। তবে এই ধরণের অভ্যাস অপরাধীদের এমন একটা সময় আসে যখন তাদের মনে জাগে সাময়িক অনুতাপ। অপরাধকে তখন তারা অপরাধ বলে বুঝতে পারে। কিন্তু তাদের মনের এই সুস্থ ভাব বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। সাময়িক ভাবে সুপ্ত অপ-স্পৃহা জাগার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনোভাব বদলে যায়। অসুস্থ মন হ'য়ে ওঠে অপরাধ প্রবণ। অপকার্য্য না করতে পারা পর্য্যন্ত সে স্বস্তি পায় না।

—পকেট মেরেছে—পকেট। ধরুন—ঐ—স্যুটপরা—

সঙ্গে সঙ্গে স্যুটধারী লাফিয়ে পড়লো চলন্ত ট্রাম থেকে। জরুরী ঘণ্টায় ট্রাম বাঁধতে বাঁধতে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেল—ওদিকে স্যুটধারীও ছুটে ঢুকে পড়লো একটা গলির মধ্যে। যার পকেট মারা গেছে সে এবং সঙ্গে সঙ্গে আরো জন কয়েক ছুটলো ট্রাম থেকে নেমে ঐ গলির উদ্দেশ্যে।

কিন্তু স্যুটধারীর কোন সন্ধানই মিললো না। কিছুক্ষণ এধার ওধার ঘোরাঘুরি করে ভদ্রলোক হতাশ হয়ে ঐ গলির ভিতর একটা চায়ের দোকানে গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন।

—বাবু! চা দেবো ?

—এ্যা—হ্যা। তবে তার আগে এক গ্লাস জল দাও ভাই!

জলের গ্লাস এগিয়ে দিয়ে দোকানী বললে, আপনার কি শরীর খারাপ ?

ভদ্রলোক নীরবে জলের গ্লাস শেষ করলেন। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হলো—চা খাবার পয়সা তো তাঁর পকেটে নেই। যা কিছু ছিল—সব তো ঐ ব্যাগে ; ইতিমধ্যে বয় চা এনে হাজির।

—দেখুন—আমার মাথার ঠিক ছিল না। চা খাবার পয়সা আমার পকেটে নেই। একেবারে নিঃস্ব করে দিয়েছে। বলতে বলতে ভদ্রলোকের দু'চোখ জলে ভরে উঠলো। দোকানী ও আর পাঁচজন খদ্দের ঠিক যেন বুঝতে পারলে না ভদ্রলোকের কথা।

আজ সবে অফিসের মাইনে পেয়েছি—আর আজই চোখের সামনে পেকেটমার হ'য়ে গেল মশাই! গরীব ছাপোষা লোক—সারাটা মাস কি খাওয়াবো কাচ্চাবাচ্চাদের! বাড়ী ভাড়া দেবো কোত্থেকে!

—চা যে জুড়িয়ে গেল—খান। বললে দোকানী।

—কিন্তু—কিন্তু ব্যাগটাই যে গেছে! বাড়ী ফেরবার বাস ভাড়াও—

আচ্ছা, ঠিক আছে মশাই! খান না! বললে দোকানী।

একে একে পুরাতন খদ্দেরবা চলে গেল। ভদ্রলোককে একপাশে ডেকে নিয়ে দোকানী বললে, কি ধরনের ব্যাগটা বলুন তো? আর ছিলই বা কত টাকা আপনার ব্যাগে? দেখি চেষ্টা করে— যদি আদায় করতে পারি!

ভদ্রলোক সংক্ষেপে দোকানীর প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলেন।

—এ নিয়ে কিন্তু আপনি থানা পুলিশ করবেন না। করলে টাকা তো আপনি পাবেনই না উপরন্তু ফল বিপরীত হয়ে দাঁড়াবে। কাল আফিস ফেরতা এসে চা খেয়ে যাবেন। বলে একটা টাকা দোকানী গুঁজে দিলে ভদ্রলোকেব হাতে!

পরের দিন অফিস ফেরতা ভদ্রলোক দুরু দুরু বুকে এসে দোকানে ঢুকলেন। দোকানীকে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ ভাই! পাওয়া গেছে?

—চা তো খান আগে! বেশ খুশী মনেই বললে দোকানী।

চা-টা খাওয়ার পর ভদ্রলোককে একটা ব্যাগ দেখিয়ে দোকানী বললে, এই ব্যাগ?

—হ্যাঁ ভাই! সাগ্রহে বললেন ভদ্রলোক।

—টাকাকড়ি সব ঠিক আছে! বলে ভদ্রলোকের হাতে ব্যাগটা দিলে দোকানী।

—কি উপকার যে ভাই করলে তা আর তোমায় কি বলবো! দুর্ভাবনায়, দুশ্চিন্তায় কাল সারাটা রাত আমি ঘুমুতে পারিনি।

—যান—আজ নিশ্চিন্ত হয়ে নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমুনগে। ব্যাগটা আর পকেটে না রেখে পেট কাপড়ে রাখুন। আচ্ছা, নমস্কার! আসবেন এদিকে এলে—বলতে বলতে দোকানী ভেতরে চলে গেল।

ভদ্রলোক বাড়ীতে এসে দেখলেন যে তাঁর পাই-পয়সাটি পর্য্যন্ত ঠিক আছে ব্যাগে!

পিক-পকেটাররা হচ্ছে শহুরে চোর। ট্রেনে, ট্রামে, বাসে বা জনবহুল স্থানে—যেমন হাটে, বাজারে, মেলায়, ষ্টেশনে—এরা দল বেঁধে অপকার্য্য করতে অভ্যস্ত। এরা একা বড় একটা বেরোয় না—দলে অন্ততঃ দুই থেকে তিন জন বা আরো বেশীই থাকে। পকেট-কাটার আধুনিক অস্ত্র হচ্ছে আনকোরা নতুন ব্লেড। আগে অবশ্য কাঁচি আর কাঁচের সাহায্যে পকেট কাটা হতো কিন্তু ও দুটো অস্ত্রই বর্তমানে ব্যাক-ডেটেড। বোতল ভাঙা কাঁচকে ঘষে এমন ধারালো করতো ওরা—যা দিয়ে পকেট তো পকেট, মানুষের গলা পর্য্যন্ত কেটে দু'ফাঁক করে ফেলা যায়। দু'টি আঙুল ঠিক কাঁচির মত করে শিকারের পকেট থেকে টাকা বা নোট চোখের পলকে তুলে নিতে অভ্যস্ত। পকেট যে কাটে—সে কিন্তু টাকা বা জিনিষ নিজের কাছে রাখে না—সঙ্গে সঙ্গে চালান করে দেয় দু'নম্বরের কাছে—দু'নম্বর চালান করে তিন নম্বরের কাছে। তিন নম্বর মালটি হস্তগত হওয়া মাত্র অকুস্থল থেকে সরে পড়ে।

সাধারণ লোকের হাব-ভাব, চলন-বলন দেখে অভিজ্ঞ পকেটমার বুঝে নিতে পারে যে কার কাছে টাকা পয়সা আছে আর কার কাছে নেই। মানুষের অন্যমনস্কতার সুযোগে এরা অপকার্য্য করে থাকে। সময়ের মাত্রাজ্ঞান এদের খুবই প্রখর। ঠিক যে মুহূর্তে মানুষ অন্যমনস্ক হয়—মানুষের সেই দুর্বল মুহূর্তটিকে নিজেদের কাজে লাগাতে এরা কদাচিৎ ভুল করে।

একজন সর্দারের তাঁবে এরা কাজ করে থাকে। সংগৃহীত মাল এদের জমা দিতে হয় সর্দারের কাছে। এদিকে এরা কিন্তু ভয়ানক সাঁচ্চা। সংগৃহীত বামাল থেকে এরা একটি কানাকড়িও লুকিয়ে রাখে না। নিজেদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা করা অমার্জনীয় অপরাধ।

দলের সারাদিনের সংগৃহীত অর্থ বা অন্য কিছু—নিজের হিস্যা রেখে বাকিটা সর্দার দলের মধ্যে ভাগ করে দেন। কেউ যদি কোন শিকার জোটাতে নাও পেরে থাকে তথাপি সেও উপোস যাবে না, সেও একটা ভাগ পাবে দলের আর পাঁচজনের মত। কেউ যদি ধরা পড়ে তাহলে তাকে ছাড়িয়ে আনার দায়িত্বও দলের সর্দারের। কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে যে—দলের কোন লোকের জেল হ'লে—ঐ সর্দার তার অবর্তমানে তার পোষ্যদেরও ভরণ-পোষণ করে থাকে। তবে এই জাতীয় পিক-পকেটাবরা সাধারণতঃ হ'য়ে থাকে ভবঘুরে। নিম্নশ্রেণীর এক রক্ষিতা ছাড়া এদের আর কোন দ্বিতীয় পোষ্য থাকে না।

সাধারণতঃ এদের 'গদিঘরে'র সন্ধান পাওয়া যায় বস্তি সংলগ্ন মাঠকোঠায়। পুলিসের চোখে ধূলো দেবার জন্য মাঝে মাঝে 'গদিঘর' বদলানো হয়ে থাকে

এলাকা এদের ভাগকরা। এক একটি দলের এক একটি এলাকা। কেউ কারুর এলাকায় পারতপক্ষে অনধিকার প্রবেশ করে না। করলে দু'দলের মধ্যে মারামাবি হয়, ছোরাছুরিও চলে যায়।

গলির মোড়ের চায়ের দোকান, পানের দোকান, কাফিখানা, সস্তার হোটেল—এদের ইনফরমারের কাজে করে থাকে।

নিজেদেব এলাকার লোকের জিনিষ এরা দালাল বা জানাশোনা লোক মারফৎ ফেবৎও দিয়ে থাকে।

এদের আস্তানা হলো নিম্নশ্রেণীর পতিতালয়—বস্তিবাড়ীর মাঠ-কোঠা। এই ধরণের বস্তিতে থাকে সাধারণত স্বভাব বেশ্যারা। স্বভাব চোরদের সঙ্গে স্বভাব বেশ্যাদের অখণ্ড যোগাযোগ। এখান-কার নরনারী ভালবাসে হৈ-হৈ, রৈ রৈ, হুল্লোড়। অপর্যাপ্ত নেশা করে এরা অকথ্য ভাষায় পরস্পর পরস্পরকে গালিগালাজ করে, মারামারি করে, রক্তারক্তি করে। দুঃখের বদলে এতেই এরা উপভোগ করে আনন্দ।

সেফার্ড পেনের পুনর্জীবন।

অফিসের ছুটি হ'য়েছে। ট্রামে ওঠা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। অথচ ডালহৌসী স্কোয়ার থেকে হেঁটে শ্যামবাজার আসাও কষ্টকর। ছ'টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে কোন রকমে একটা ট্রামের মধ্যে নিজেকে ঠেসে দিলাম। ট্রামের ভিতরে ডাণ্ডা ধরে ঝুলে আছি, হঠাৎ মনে পড়লো পেনটার কথা। চেয়ে দেখলাম—ঠিকই আছে। নিজের পকেট সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠলাম।

শ্রীমানী মার্কেটে একটু দরকার ছিল। পেনটার দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে এঁকে বেঁকে পথ করে নিয়ে এগিয়ে এলাম দরজার ধারে; ইচ্ছে করলে পথরোধকারীদল অনায়াসে ভিতরে গিয়ে দাঁড়াতে পারেন কিন্তু তা তাঁরা কিছুতেই করবেন না। নামা-ওঠার অসুবিধা সৃষ্টি করাই যেন তাঁদের ধর্ম। সকলেই যে বদ মতলবে দরজা আগলে থাকেন তা নয়—এ কেমন একটা আমাদের জাতীয় শৈথিল্য, অহেতুক ঔদাসীন্য—সিভিক সেন্সের অভাব। কোনগতিকে ঠেলে ঠুলে লাফ দিয়ে রাস্তায় পড়লাম। জামার ইস্ত্রিব তো বারোটা বাজলোই—তার বদলে নিজে ইস্ত্রি হ'য়ে চলন্ত ট্রাম থেকে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম।

পেনের কথা তখন ভুলেই গেছি, নতুন ভাঙা পাঞ্জাবীটা যে 'ইয়ে' হ'য়ে গেল ভিড়ের চাপে—হঠাৎ দৃষ্টি পড়লো পকেটে! মাথা ঘুরে গেল পেনটা না দেখে। এই তো নামবার আগেও দেখলাম—পেনটা! এক লহমায় হাত সাফাই হ'য়ে গেল। বড় লাগলো মনে। কম করে দশখানা বই লিখেছি ঐ পেনে। ওর সঙ্গে গড়ে উঠেছিল আমার মনের নিবীড় আত্মীয়তা।

মনের দুঃখ মনে চেপে কাজ শেষ করে অমুক এম্পোরিয়ম থেকে বেরিয়ে আসছি—প্রকাশক মশাই বললেন, কি হ'য়েছে বলুন তো? হঠাৎ আজ এত অন্যমনস্ক কেন? চাও খেলেন না—কি ব্যাপার?

—দেখলেন না। আপনারই টাকা নিলাম আবার ভাউচার সই করে দিলাম আপনারই পেন চেয়ে নিয়ে। যা পেলাম—সবটাই মুফত্‌সে—পেন খরচাও করতে হলো না।

—তার মানে ?

—বহুদিনের পুরাতন বন্ধু আজ আমায় ছেড়ে গেছে! বলুন—চা আনতে বলুন!

চা খেতে খেতে পেন-হারানোর ইতিবৃত্ত প্রকাশক মশাইকে বললাম।

—এ নিশ্চয় এই এলাকার গ্যাঙ্‌। কোন মাতব্বরের সঙ্গে জানাশোনা আছে ? জিজ্ঞেস করলেন প্রকাশক বন্ধু।

—ও সব গ্যাঙের ভেতর জানাশোনা কোন বন্ধু বান্ধব তো আমার নেই।।

—তাহলে পেনের আশা ছেড়ে দিন!

দিন সাতেক পরে।

—অমুক বাবু! ও অমুকবাবু! শুনুন—কদিন ধরে আপনাকেই খুঁজছি! বললেন প্রকাশক বন্ধু।

দোকানে গিয়ে বসলাম।

আপনার জন্যে একটা সস্তায় ভাল পেন পেয়েছি মশাই। আপনার যা মেকার ছিল—ঠিক তাই, সেফার্ড! বলে একটি পেন ড্রয়ারের ভেতর থেকে বাব করে টেবিলে রাখলেন।

—পেনটা যেন আমার বলেই মনে হচ্ছে! হুঁ—এ আমারই পেন! আগে ওটা 'অটোমেটিক—সাকিং সিষ্টেম' ছিল। পেছনের সরু ষ্টিকটা একদিন কালি ভর্তে গিয়ে ভেঙে ফেলি। তাই পেছনটা সিল করে দিয়ে সেল্ সিষ্টেম করে নিয়েছি। বিশ্বাস না হয়—খুলে দেখতে পারেন।

বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে প্রকাশক বন্ধু বললেন, সেকি! আশ্চর্য্য তো! অমুক বাড়ীর ছেলে এই পেনটি নিয়ে এসে বললে—কুড়িয়ে

পেয়েছি। পঁচিশ টাকা পেলে বিক্রী করবো। ভাবলাম—আপনার তো একটা পেনের দরকার—তাই আপনাকে দেখাবো বলে রেখে দিয়েছি।

প্রকাশক বন্ধুর মধ্যস্থতায় শেষ পর্য্যন্ত পঁচিশের জায়গায় পনের টাকায় অমুক বাড়ীর ছেলের সঙ্গে রফা হলো। নিজের পেন নিজে দ্বিতীয় বার কিনলাম পনের টাকা দিয়ে।

আমার বহু দিনের সাথীকে ফিরে পেয়ে সত্যিই আমার সেদিন যে কি আনন্দ হ'য়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। পনের টাকা তো কা কথা—পেনটার যা দর তার পাঁচগুণ চাইলেও বোধ হয় আমি পেছপা হতাম না পেনটা ফিরে পেতে। এতো দরদামের প্রশ্ন নয়—প্রেমের প্রশ্ন! পেনটার আমি প্রেমে পড়ে গেসলাম।

আগে হিন্দুস্থানী আর মুসলমানদের প্রায় এক চেটিয়া ছিল এই অপকার্য্য। আজকাল বহু বাঙালী এই অপকার্য্যে যোগ দিয়েছে। পোষাকের পারিপাট্য আর সুন্দর সুপুরুষ চেহারা, হাতে একটি সুদৃশ্য চামড়ার ফাইল—কার সাধ্য অনুমান করে যে ইনি একটি পকেটমার! অথচ এই ধরণের পলাশ ফুলেরা ভিড়ের মধ্যে ট্রামে বাসে উঠে বাঁ হাতে ধরা ফাইলটা শিকারের দুর্বল মুহূর্তে তার চোখের সামনে কায়দা মাফিক ধরে পকেট সাফ করতে ওস্তাদ কোন সময়ে শিকার অন্যমনস্ক হবে এরা থাকে সেই সুযোগের প্রতীক্ষায়।

—মশাই! সাবধান! যে যার পকেট সামলান' এটা হচ্ছে পকেটমারের ডিপো! হাওড়ার ব্রীজের মুখে (ষ্টেশনের দিকে) দাঁড়িয়ে একটি লোক চীৎকার করছে ঠিক সন্ধ্যার সময়।

ডেলিপ্যাসেঞ্জার ও অন্যান্য যাত্রীরা যে যার পকেট সামলে ছুটছে ট্রেণ ধরতে। প্রায় ঘণ্টাখানেক চেঁচামেচি করে লোকটা চলে গেল।

আবার পরের দিন ঐ একই সময়ে লোকটির চীৎকারের পুনরাবৃত্তি। যাত্রীরা সন্ত্রস্ত ও সাবধান হয়ে ছোটে ট্রেণ ধরতে।

তৃতীয় দিন লোকটি চীৎকার সুরু করতেই একটা লুঙ্গি পরা আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে রোগা ডিগডিগে ছোকরা এসে বললে, এ মশা ' শুনো এদিকে !

—যা বলবে—এখানে দাঁড়িয়ে বল। আমি কোথাও যাবো না।

—আরে মশা ! এই ধারটায় এসো না।

ব্রীজের রেলিঙের ধার ঘেঁসে দাঁড়িয়ে লোকটি বললে, কি বলবে ঝট্‌পট্ বল, আমার ট্রেণের সময় হয়ে যাচ্ছে।

—হাঁ—হামি তো ঝট্‌পট্ই বলবে। হাপনি মশা হামাদের ব্যবসা মাটি করে দিচ্ছ কেনে ? আজ দো রোজ একটা কাণা কড়ি ভি নেহি মিলা কাহে এ্যায়সা ডুষমনি—

খেঁকিয়ে উঠলো লোকটি, ডুষমনি আমি করছি ! আমার পকেট এইখানে যারা মেরেছিল তারা ডুষমনি করেনি। যতদিন পর্য্যন্ত সেই টাকার তিনগুণ না পাবো ততদিন আমি এইভাবে ডুষমনি করবো।

—গোসা হচ্ছো কেনে বাবু। আপনার কেত্তো খোয়া গেছে উ তো বলিয়ে।

—তিন টকা চুয়ান্ন নয়া পয়সা নগদ আর একটা মণিব্যাগ।

—রফা ভি তো করিয়ে !

—কোন রফা-টফা চলবে না। তিনগুণ আমার চা-ই চাই ! বলেই লোকটি ফুটের মাঝামাঝি এসে চীৎকার করতে সুরু করলে, সাবধান মশাই ! পকেট সামলান যে যার। আমার তিন টাকা চুয়ান্ন নয়া পয়সা পকেটমার হয়েছে !

ছোকরাটি তাড়াতাড়ি লোকটার পকেটে একখানা দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে চাপা গলায় বললে, বেইমানি করোনা মশা ! তাহলে কিন্তু—

সত্যিই সে কোন বেইমানি করেনি। যা কথা তাই কাজ।

পরের দিন থেকে আর কিন্তু লোকটি যাত্রীদের সাবধান করে দিয়ে পকেটমারদের ব্যবসার ক্ষতি করেনি।

দলবদ্ধ ছাড়া একক পকেটমারও যে নেই তা নয়, তাদের এলাকা ব'লে কিছু নেই। এ ধরণের স্ব স্ব প্রধান পকেটমার ধরা পড়লে শুধু জনসাধারণ নয়—জাতে পকেটমাররাও এদের মেরে ধুনে দেয় এবং জনসাধারণকে উৎসাহিত বা উত্তেজিত করে এদের পুলিশের হাতে তুলে দিতে।

আগে পকেট কাটা বা পকেটমারা অপকার্যটি ছিল পুরুষের এক চেটিয়া—'মনোপলি' কিন্তু আজকাল মেয়েরাও একাজে নেমেছে। সুবেশা তরুণী, পায়ে স্যাণ্ডেল, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, বাঁ হাতে রিষ্টওয়াচ—বোঝার ওপর শাকের আঁটি অর্থাৎ ভ্যানিটি ব্যাগের সঙ্গে একখানি বই বা ম্যাগাজিন নিয়ে বেনী দুলিয়ে ব্যস্ত সমস্তভাবে বাসের দরজার ভিড় ঠেলে চাপাচাপি করে বাসে উঠে পড়ে। মেয়েদের বসবার সিট না থাকলেও 'দাঁড়িয়ে যাবো' বলে এ ধরণের মেয়েদের সগর্বে উঠতে দেখা যায়। এরা সাধারণতঃ পুরুষদের পকেটই মেরে থাকে। বামালটি টপ্ করে নিয়েই ফেলে দেয় বুকের তলায় ব্লাউজের ফাঁকে। সন্দেহ হলেও চটকরে কেউ কিছু বলতে সাহস করে না, অনুমান যদি সত্য না হয় তাহলে অপদস্থের আর সীমা থাকবে না, মারধোরও বরাতে জুটতে পারে—ভদ্রমহিলার নামে বদনাম দেওয়ার জন্য। পকেটমারা গেলেও অনেক ক্ষেত্রে লোকে কিল খেয়ে কিল চুরি করে থাকেন। পুরুষের মত এরা পকেট মেরে দৌড় মারে না জানাজানি হলেও কারণ শারীরিক অক্ষমতা। মুখের দাপট দেখিয়ে তাড়াতাড়ি ট্রাম বা বাস অথবা সেই পকেট মারার স্থানটি থেকে সরে পড়ার চেষ্টা করে মেয়ে পকেটমার।

মেয়েটি একা একটি লেডিজ সিটে বসেছিল। হাতে একখানি

মোটা বই, গলায় ষ্টেথিসকোপ ঝুলিয়ে একটি ছাত্র ট্রামে উঠলো। অন্য সব সিট ভর্তি থাকায় ছাত্রটি গিয়ে দাঁড়াল ঐ লেডিজ সিটের কাছাকাছি। মেয়েটি ধারের দিকে একটু সরে গিয়ে বললে, বসুন।

ছাত্রটির পরনে প্যাণ্ট, গায়ে বুস সার্ট। বুক পকেটে পেন আর মণিব্যাগ। ষ্টপেজ থেকে ট্রাম ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি উঠে ছাত্রটির মুখের ওপর ভ্যানিটি ব্যাগটা এক লহমার জন্য আড়াল করে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বেরিয়ে এলো সিট ছেড়ে—যেন পরের ষ্টপেজেই তাকে নামতে হবে। দরজার গোড়ায় তখন ভিড় জমে গেছে যেমন সাধারণতঃ জমে থাকে।

কণ্ডাকটর টিকিট চাইতে ছাত্রটি পকেটের দিকে চেয়ে দেখে—মণিব্যাগ স্থানচ্যুত। পরের ষ্টপেজে ট্রাম তখনও এসে পৌছায়নি, মেয়েটি তাড়াহুড়ো করে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছে দরজার দিকে।

ছাত্রটি চীৎকার করে মেয়েটির উদ্দেশ্যে বললে, আপনি আমার মণিব্যাগ নিয়েছেন। নামবার চেষ্টা করবেন না—দাঁড়ান।

ছাত্রটি ভিড় ঠেলে এসে মেয়েটির পথ আগলে দাঁড়াল।

—আমাকে কি ভেবেছেন আপনি! পথ ছেড়ে দাঁড়ান। সদম্ভে বললে মেয়েটি।

—দয়া করে আমার মণিব্যাগটি দিয়ে দিন। আমি কিছু বলবো না।

—আপনি দেখেছেন নিতে?

—দয়া করে কথা বাড়াবেন না। দিয়ে দিন। আপনার বুকের তলায় আমার ব্যাগ রয়েছে—আমি দেখতে পাচ্ছি। না দিলে আমি জোর করে তুলে নেবো!

—ও আমার ব্যাগ!

—বেশ—তাহলে থানায় চলুন!

থানার নাম শুনে মেয়েটি ভড়কে গিয়ে ব্যাগটা ট্রামের পাদানির ওপর ফেলে দিলে। তার এই ফেলাটা ছাত্রটির এবং অন্যান্য যাত্রীদের দৃষ্টি এড়াল না। যাদের সন্দেহ ছিল তারাও বুঝতে পারলে —মেয়েটি কি চীজ।

—উল্টে আপনি আমাকে অপদস্থ করতে চান। আর ছাড়ছি না—থানায় আপনাকে যেতেই হবে। পালাবার চেষ্টা করবেন না তাহলে গায়ে হাত দিতে বাধ্য হবো। আপনারা কেউ যদি দয়া করে আমায় একটু সাহায্য করেন—, যাত্রীদের উদ্দেশে বললে ছাত্রটি।

সাহায্য করার লোকের অভাব হলো না। মজা দেখতে অনেক লোকই আশ পাশে জুটে গেল। থানার পথে যেতে যেতে মেয়েটি অনেক কাকুতি-মিনতি করলে তাকে এ বারের মত ছেড়ে দেবার জন্য কিন্তু ছাত্রটি রাজি থাকলেও তার সাহায্যকারীরা রাজি হলো না।

থানায় গিয়ে মেয়েটি যা বললে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই —কারণ এ ধরণের অপরাধিনীদের মুখেই তা শোভা পায়।

মেয়েটি বললে ছাত্রটির উদ্দেশে, ভদ্রলোক আধটি ঘণ্টা ধরে আমায় ফলো করে যা-তা কথা বলছিলেন, ওঁর জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে আমি ট্রামে উঠতে বাধ্য হই। ভদ্রলোকও আমাকে ফলো করে ট্রামে ওঠেন আর জোর করে আমার পাশে বসেন। আমি আপত্তি করতে সিট ছেড়ে উঠে নিজের মণিব্যাগটা আমার বুকের মধ্যে ফেলে দিয়ে বলেন—আমি ওঁর পকেট মেরেছি।

প্রত্যক্ষদর্শীরা সাক্ষী না দিলে ছাত্রটির অবস্থা যে কি দাঁড়াতো তা সত্যিই ভেবে দেখবার মত।

সমাজের ভেতর থেকে মেয়েরা যদি পকেটমার হয়, চোর, খুনী হয় তাহলে সমাজ-ব্যবস্থায় যে অচীরে ভাঙন ধরবে—এ কথা ধ্রুব সত্য। অপ-স্পৃহা নর-নারী সবার মধ্যেই অল্প-বিস্তর আছে কিন্তু

নারী সেই অপ-স্পৃহা দমন করে চিরদিন সংসার ও সমাজের মঙ্গলই করে আসছে। কিন্তু বর্তমান 'অন্নচিন্তা চমৎকারম' এর যুগে ক্ষুধার জ্বালায় বহু নারী আজ নারীত্বে জলাঞ্জলি দিয়ে পথভ্রষ্টা। কোন পথে গেলে অন্নের সংস্থান হবে—ক্ষুধার হাত থেকে রক্ষা পাবে বৃদ্ধ পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, পুত্র কন্যা—তা তাঁরা খুঁজে পাচ্ছেন না। শিক্ষার অভাবে স্বভাবতই মন হয়ে উঠছে—অপরাধপ্রবণ। দোষ কার? সমাজের, রাষ্ট্রের, না বুভুক্ষু মানুষের?

অপ-স্পৃহা চরিতার্থ করবার জন্য বিনা প্রয়োজনে অনেক সময় মেয়েদেব অপকার্য্য করতে দেখা গেছে। এরা সাধারণতঃ অপরাধ-রোগী। বিকারগ্রস্ত মন নিয়ে এরা অপকার্য্য করে থাকে।

জনৈক চিত্র পরিচালকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা

"নারকেলডাঙ্গা নর্থ রোড দিয়ে হাঁটছি—হঠাৎ একটি মেয়ে চোখে পড়লো। মেয়েটি আসছে বিপরীত দিক থেকে। আমার চোখে চোখ পড়তেই মেয়েটি রাস্তা ঘেঁসে চলতে সুরু করলে মুখ নীচু করে। কেমন যেন চেনা চেনা মনে হলো।

মেয়েটি চলে গেল আমাকে ভাবিয়ে দিয়ে।

নীল চোখ, কটা কোঁকড়ান চুল, টকটকে ফর্সা রঙ, দোহারা গড়ন—কোথায় যেন দেখেছি মেয়েটিকে। কিন্তু কোথায় যে দেখেছি—তা কিছুতেই স্মরণ করতে পারলাম না।

কাজ সেরে ঐ পথেই ফিরছি। যেখানে দেখা হ'য়েছিল মেয়েটির সঙ্গে ঠিক সেইখানে আসতেই মেয়েটির কথা আমার মনে পড়লো আর সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ হয়ে গেল—কোথায় তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল। মেয়েটির সঙ্গে আমার দেখা হ'য়েছিল প্রথম—জেলে—প্রেসিডেন্সী সেন্ট্রাল জেলে।

ভূতপূর্ব ইন্সপেক্টর জেনারেল অব প্রিজন ডাঃ বিশ্বাস এর আমলে পশ্চিম বঙ্গ সরকার, প্রচার বিভাগের প্রযোজনায় "জেলেও মানুষ

গড়ে" নামে একখানি তথ্যচিত্র তৈরী হয়। ঐ চিত্রের পরিচালক হিসাবে বাংলা দেশের যে কয়েকটি সেণ্ট্রাল জেলে আমায় স্যুটিং করতে হ'য়েছিল তার মধ্যে প্রেসিডেন্সী সেণ্ট্রাল জেল অন্যতম।

জেল অভ্যন্তরে সেদিন স্যুটিং করতে করতে হঠাৎ একটি নীলনয়না আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মেয়েটিকে চিত্রে অভিনয় করতে দেবার জন্য ওদের ইনচার্জ (মহিলা) কে আমি বলি।

—একদিনে তো আপনার স্যুটিং শেষ হবে না। ও কিন্তু এই সপ্তাহে রিলিজ হ'য়ে যাবে। এখন আপনি ভেবে দেখুন—ওকে নিলে আপনাকে কোন অসুবিধায় পড়তে হবে কিনা!

চিন্তার কথা। কনটিনিউটি আর্টিষ্ট করা তো তাহলে চলবে না। দেবার মত একদিনের কাজ তো কিছু নেই। অতএব নীলনয়নাকে অনিচ্ছা-সত্বেও বাদ দিতে হলো।

এই সেই নীলনয়না!

এমন সুন্দর যার চেহারা—সে কি অপরাধে জেলে এসেছে—জানবার বড় আগ্রহ জাগলো মনে।

খবর নিয়ে জানলাম—মেয়েটি একটি পকেটমার। শ'পাঁচেক টাকার একটি নোটের বাণ্ডিল নীলনয়না না বলে তুলে নিয়েছিলেন কোন এক ভদ্রলোকের পকেট থেকে—চলন্ত বাসে। কিন্তু হাতে-হাতে ধরা পড়ার পরিণাম—এই প্রেসিডেন্সী সেণ্ট্রাল জেল।

নীলনয়নার দাদামশাই লক্ষপতি। বড়লোকের মেয়ে—বড় লোকের নাতনী—ধনীর দুলালী সে। সুপ্ত অপ-স্পৃহা জাগ্রত হ'য়ে তাকে অপকার্য্য করতে বাধ্য করে। বিনা প্রয়োজনে নির্লোভী হ'য়ে অপকার্য্য করে মানসিক বিকারের ঘোরে। অপকার্য্য করতে না পারা পর্য্যন্ত তার অপ-স্পৃহা প্রশমিত হয় না।

ভদ্রপল্লীতে ভদ্রপরিবেশের মধ্যে থেকেও ভদ্রতার মুখোস পরে লোকে দিনের পর দিন লোকচক্ষুর অন্তরালে অপকার্য্য করে চলে।

এরা হচ্ছে সমাজের দুষ্ট ব্রণ। এরাই সমাজ-জীবন ক'রে তোলে বিষময়। অসৎ সঙ্গে, পঙ্কিল পরিবেশে যারা থাকে তাদের সহজে চেনা যায়, দূরে সরে গিয়ে সাবধান হওয়া যায় তাদের কাছ থেকে। কিন্তু ছদ্মবেশী সয়তানদের চিনতে পারা বড় শক্ত। চিনতে না পারলে সাধারণ মানুষ দূরে সরেই বা থাকবে কেমন করে আর সাবধানই বা হয় কেমন করে।

আমাদের বৈঠকখানার পাশের ঘরটা এতদিন খালিই পড়ে ছিল। এক ভদ্রলোক বাবাকে ধরে-করে ঘরটা ভাড়া নিলেন। পরের দিন ঘরটা সাজিয়ে ফেললেন দামী দামী আসবাব পত্তর দিয়ে। একটাও খেলো জিনিষ নয়। খাট, বিছানা, সো-কেস, সেক্রেটেরিয়েট টেবিল, রিভলভিং চেয়ার, সোফা সেট, রেডিও ইত্যাদিতে ঘরখানা ঝকমকিয়ে উঠলো।

অফিসের বড় চাকরে। মোটা টাকা কামাই করেন। বড়-লোকের ছেলে। ভদ্রলোকের বাবা বিদেশে চাকরী করেন। ভদ্রলোক অবিবাহিত। বাবা তাঁকে খুবই খাতির কবেন।

খাতির করার দুটি কারণ। একটি হচ্ছে আমার চাকরি আর দু'নম্বর হচ্ছে আমার মেজ বোনের সঙ্গে ভদ্রলোকের বিয়ে।

বিয়ের কথা রয়ে-সয়ে হবে। আমার চাকরির কথাটাই বাবা প্রথম পেড়ে বসলেন ভদ্রলোকের কাছে। ভদ্রলোক আশ্বাস দিলেন। কোন ভাল পোষ্ট খালি হলেই সাহেবকে বলে তিনি আমায় অফিসে ঢুকিয়ে নেবেন।

দু'মাস যায়—চার মাস যায়—ছ'মাস যায়। ভাল পোষ্টও খালি হয় না আর আমারও অদৃষ্ট প্রসন্ন হয় না।

বাবার তাগাদার ঠেলায় একদিন ভদ্রলোক বললেন, আচ্ছা—কাল থেকে আপনার ছেলেকে আমার সঙ্গে বেরুতে বলবেন। কাজ ঠিক করেছি।

প্রথম দিন চাকরীতে জয়েন করতে যাবো—মা সাত সকালে

শুভোচিনির পূজার ব্যবস্থা করলেন। ঠাকুরের ফুল পকেটে নিয়ে আমি ভদ্রলোকের সঙ্গে 'দুর্গা বলে' চাকরি করতে বেরিয়ে পড়লাম। বাড়ী থেকে বেরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম ভদ্রলোককে, আচ্ছা, চাকরিটা কি বলুন তো?

—ঠিক চাকরি তো নয়, তোলা কারবার।

ঠিক বুঝলাম না। তবু জিজ্ঞের করলাম, ও কারবারে মাসে কি রকম আয় হবে?

—যতটা করতে পারা যায়।

ভদ্রলোকের কথাবার্তা সবই যেন হেঁয়ালী। বড় রাস্তায় এসে ট্রাম ধরলাম। বসবার জায়গা থাকা সত্তেও বসলেন না। আমি বসে পড়লাম।

কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে ভিড়টা বেশ জমে উঠলো। কলুটোলার মোড়ে এক ভদ্রলোক ট্রামের পাদানিতে পা দেওয়া মাত্র আমার পরিচিত ভদ্রলোক তাঁর পকেট থেকে মণিব্যাগটা তুলে নিয়ে চলন্ত ট্রাম থেকে নেমে পড়লেন আমার চোখের সামনে।

ভদ্রলোকের তোলা কারবারের নমুনা দেখে আমি ঘামতে সুরু করলাম। ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে গেল। কি জানি—তোলা কারবারির সঙ্গী হিসাবে কেউ যদি আমায় চিনে রেখে থাকে। ট্রামের টিকিট কেনবার সময় ভদ্রলোক ব্যাগ না পেয়ে নিশ্চয় একটা হৈ-চৈ তুলে দেবেন। তার চেয়ে আগে থাকতেই নেমে পড়া ভালো।

বাড়ী ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম—রাগে আর দুঃখে।

বাবা বললেন, কি হলো—চলে এলি যে?

—আমি ও চাকরি করবো না!

বাবা চটে-মটে লাল। বললেন, তোর দ্বারা কিস্সু হবে না তা আমি আগে থেকেই জানতাম। কত কষ্টে একটা চাকরি জোগার করে দিলেন ভদ্রলোক আর তুই কিনা অগ্রাহ্য করে চাকরিটা হাতে পেয়ে ছেড়ে দিয়ে এলি।

—না বাবা! কাজটা তোর ভাল হয়নি। এমন হাতের লক্ষ্মী কেউ পায়ে ঠেলে! কি আর বলবো! সবই আমার বরাত। মা আক্ষেপ করে বললেন।

বাবাকে সব কথা খুলে বললাম। ভাবী জামাতার কীর্তিকলাপ শুনে বাবার তো চক্ষু স্থির! কি সর্বনাশ! এ যে বর্ণচোরা আম!

ভদ্রলোক সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে বললেন, কি হলো—চলে এলে কেন? আমি তো চোখ-ইসারায় বললাম—কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে থাকবো! এই নাও তোমার আজকের সেয়ার!

বাবা এসে পড়ে বললেন, ও কিসের টাকা দিচ্ছেন?

—আপনার ছেলের পাওনা টাকা!

—হুঁ, বুঝেছি। আসুন—আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে!

দুদিন পরে ভদ্রলোক ঝক্কি-ঝামেলা না করে ভদ্রলোকের মত আমাদের বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলেন। অবশ্য যাবার সময় একটি পাই পয়সাও ভাড়া বাবদ মেরে যাননি।

—চোর—চোর—চোর—

হাজার কণ্ঠে চীৎকার উঠলো—চোর—চোর—ঐ যে ব্যাগ হাতে—

—ঐ—ঐ—ছুটছে।

—আরে মশাই—ঐ সুটপরা লোকটাই তো—

—উঠেছে—চলন্ত ডবল ডেকারে লাফিয়ে উঠেছে!

—সর্দারজী—এ সর্দারজী বাঁধকে!

যে কোম্পানীর দ্বারোয়ানের হাত থেকে ব্যাগটা ছিনিয়ে

নিয়েছিল—সেই কোম্পানীর গাড়ীটা ছুটে বেরিয়ে গিয়ে ডবল ডেকারের পথ রোধ করে দাঁড়াল।

দ্বারোয়ান এবং পথচারী অনুসন্ধানকারীর দল বাসে গিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো। সুটধারী তো অনেকেই আছেন—কিন্তু কোন সুটধারী এই অপকার্য্য করেছেন তা কেমন করে চিনে বের করা যায়! কিন্তু ব্যাগ সমেত ছিন্‌তাইয়াকে বাসে উঠতে দেখা গেছে—ব্যাগটাও তো চোখে পড়ছে না। বাসের দুটো দরজা আটকে ফেলা হলো। খোঁজাখুঁজি হচ্ছে ব্যাগটার—এক সুটধারী ভদ্রলোক বিরক্ত হ'য়ে বললেন, আপনারা করুন মশাই খোঁজাখুঁজি। I cant waip any more. আমার সময়ের দাম আছে। আমায় নামতে দিন!

—কিছু মনে করবেন না। আপনাকে সাচ করে নামতে দিতে পারি।

—তার মানে! আমি চোর! আপনারা তো ব্যাগ খুঁজছেন! আমি তো কোন ব্যাগ দিয়ে যাচ্ছি না! বলতে বলতে ভদ্রলোক জোর করে দরজার ধারে এগিয়ে যাচ্ছেন

ভদ্রলোক যে সিটে বসেছিলেন—তার তলায় কাৎ হ'য়ে পড়ে থাকতে দেখা গেল একটা ব্যাগ। দ্বারোয়ান বললে, কোম্পানীর নাম খোদাই করা এই ব্যাগে করেই আমি টাকা এনেছি।

ব্যাগটা খালি অর্থাৎ বাসে উঠেই ছিন্‌তাইয়া ব্যাগের টাকাগুলি অন্যত্র সরিয়ে দিয়েছে।

নামবার জন্য উদগ্রীব ভদ্রলোক যেখানে বসেছিলেন তারই তলায় ব্যাগটা পাওয়া যেতে ভদ্রলোকের ওপর সন্দেহ আরো ঘনীভূত হ'য়ে উঠলো।

—ব্যাগ তো আপনাদের মিলেছে—ব্যস্, এবার আমি যেতে পারি? বলেই বাসের পাদানিতে পা দিয়েছেন নামবার জন্য—পিছন থেকে টান পড়লো তাঁর সার্টের কলারে।

ভদ্রলোক ঘুষি পাকিয়ে ফিরে দাঁড়াতেই তাঁর সার্টের বোতাম খুলে গেল—পাঁচ-সাতটা নোটের বাণ্ডিল মেঝের ওপর পড়ে গেল। নোটের ঐ বাণ্ডিলগুলো তিনি সার্টের তলায় বুকের কাছে ফেলে দিয়েছিলেন—যেমন করে মেয়েরা তাঁদের মণিব্যাগ রাখেন বুকের তলায় ব্লাউজের ভেতর। এ ছাড়া ছিনতাইয়ার প্যাণ্টের পকেট থেকেও কটা বাণ্ডিল বেরুলো। প্যাণ্টের ইনসাইড পকেটে পাওয়া গেল একটা মোড়া-ছোরা !

কয়েকজন সাক্ষী সমেত ঐ স্যুটধারী ছিনতাইয়াকে কোম্পানীর গাড়ী করে থানায় নিয়ে যাওয়া হলো।

উক্ত কোম্পানীর কেনা বেচার টাকা প্রতিদিন ব্যাঙ্কে জমা পড়ে। আগামী কাল মাইনের দিন। আজ তাই সাত হাজার টাকা তোলা হলো। কাউন্টারে দ্বারোয়ান যখন গনে গনে নোটের বাণ্ডিলগুলো তার ব্যাগে রাখছিল তখন ঐ স্যুটধারী অদূরে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করছিল। সিঁড়ি দিয়ে কত লোক নামা ওঠা করছে, ঐ দ্বারোয়ানের পাঁচ সাত ধাপ এগিয়ে লোকটা নেমে এসে ফুটপাথে দাঁড়াল। কোম্পানীর গাড়ি একটু দূরেই রাখা ছিল। দ্বারোয়ান ব্যাগ নিয়ে গাড়ীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে—ছিনতাইয়া আচমকা তার হাত থেকে ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে ছুটে গিয়ে চলন্ত বাসে উঠে পড়লো।

হঠাৎ দাম্ভিক হ'য়ে মেজাজ না দেখিয়ে চুপ চাপ ভাল মানুষের মত ব্যাগটি আড়াল করে বসে থাকলে সে যাত্রা হয়তো স্যুটধারী ছিন্‌তাইয়া বেঁচে গেলেও যেতে পাবতো কিন্তু দাম্ভিকতাই তার কাল হলো। তার অপরাধপ্রবণ মন তাকে সাচ্চা সেজে দাম্ভিকতা প্রকাশ করতে উত্তেজিত করলে। বাধা পেতে সে হয়ে উঠলো নিষ্ঠুর। ঘুষি পাকিয়ে মারতে চেষ্টা না করলে হয়তো তার জামার বোতামও খুলে যেতো না আর বামালও সবার সামনে বেরিয়ে পড়তো না। ঐ অবস্থায় ওরা এমন মরিয়া হয়ে যায় যে ঘুষি তো কা কথা—ফট্ করে ছোরাই বাগিয়ে ধরতো।

বাধা পেলে আধুনিক ছিনতাইয়ারা বলপ্রয়োগ করে থাকে এবং দরকার মনে করলে ছোরা ছুরিও চালায়।

ছিনতাইয়াদের মধ্যে বাঙালী ও পশ্চিমা হিন্দুস্থানীর সংখ্যাই বেশী দেখা যায়। দু'তিন জনের বেশী এদের দলে লোক থাকে না। অনেকে আবার একা একাও কারবার চালায়।

হার, কানের দুল প্রভৃতি গয়না এবং টাকা পয়সা এরা ধরা পড়ার পূর্ব মুহূর্তে খেয়ে ফেলে। বামাল সমেত ধরা পড়লেই বিপদ। বামাল না পেলে প্রমাণ অভাবে ছাড়া পাবার সম্ভাবনাই বেশী। X. Ray এর সাহায্যে বোঝা যায়—এদের পেটের মধ্যে খেয়ে ফেলা কোন জিনিষ লুকানো আছে কি না।

খেয়ে ফেলা জিনিষ পাইখানার সঙ্গে বেরিয়ে আসে, তাই এরা খেয়ে ফেলে—পরে বার করে নেবার জন্য।

লুড়িতে চূণ মাখিয়ে এরা গালের কসে রেখে গর্ত্ত তৈরী করে। অপহৃত দ্রব্য মুখে পুরে ওরা রেখে দেয় সেই গর্তে। সাধারণ লোক্ অপহৃত দ্রব্য মুখে পুরে ফেলতে দেখে ভাবে—খেয়ে ফেললে কিন্তু আসলে তা নয়।

শিকারের সন্ধানে এরা ঘোরা ফেরা করে—সিনেমার আশে পাশে, রেলওয়ে ষ্টেশনে, থিয়েটার হলের সামনে, মেলায়, কালীঘাটের মত ধর্মস্থানে।

—ও মশাই! শুনছেন! জড়িত কণ্ঠে বলতে বলতে একটা মাতাল পিছন থেকে সামনে এসে আমার পথ রোধ করে দাঁড়াল।

—পাঁচটা টাকা দিন মশাই! মাল খাবো!

—ইয়ারকি মারবার আর জায়গা পাওনি! ভাগো! বলে পাশ কাটিয়ে আমি এগিয়ে চললাম।

—ভাল হবে না বলে দিচ্ছি মশাই! টাকা বার করুন! বলতে বলতে আগের চেয়ে বেশী জোর দেখিয়ে সামনে দাঁড়াল।

—পুলিশ ডাকবো কিন্তু!

—খবরদার ! ছোরা মেরে দেবো !

ছোরার নাম শুনে ঘাবড়ে গেলাম। এ পাশ ও পাশ চেয়ে দেখি—কেউ কোথাও নেই। একটা লোকও সারকুলার রোড থেকে গলিটায় ঢুকছে না বা এধার থেকে কোন লোক সারকুলার রোডের দিকেও যাচ্ছে না। আমি সম্পূর্ণ একা—সামনে আমার এক মাতাল দুষমণ।

—টাকা দেবেন কিনা বলুন !

—টাকা আমি দেবো না

একটা ছোরা সত্যি সত্যি আমাব চোখের সামনে উঠিয়ে ধরলে মাতালটা। এই সঙ্কটজনক মুহূর্তে ম্যাজিকের মত কোথা থেকে যে দু'জন লোক চোখের পলকে এসে গেল তা আমি বুঝতেই পারলাম না।

মাতালটাব উদ্দেশে বণ্ডামার্কা লোকটি বললে, এই শালা। দেখছিস না ভদ্দোরলোক ! শালা তুমি ভদ্দোরলোকের ওপর জুলুম করছো ! দেবো শালাকে একটা রদ্দা।

আকস্মিক উদ্ধার কর্তাব আবির্ভাবে মনে মনে একটু আশ্বস্ত হলাম।

—দিন মশাই—টাকা সিকেটা কি আছে দিয়ে দিন। মাতাল শালাদের কাণ্ড—ছোরাছুরি চালিয়ে দিতে কতক্ষণ। মুখ নীচু করে পরম হিতৈষীর মত চাপাগলায় আমার কানে কানে বললেন আমার বিপদ-ত্রাতা।

তাড়াতাড়ি বিপদ থেকে আমায উদ্ধার করতে—কোন কিছু বলার অবসর না দিয়েই বিপদ-তারণ আমার জহর-কোটের ইনসাইড পকেট থেকে মণিব্যাগটি তুলে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পার্কার পেনটিও যে হাত সাফাই হয়ে গেল তা আমি পরে বুঝেছিলাম।

ব্যাগটি শূন্য করে টাকা পয়সাগুলি মাতালটার হাতে দিয়ে ষণ্ডামার্কা বললে, এই নিন মশাই—আপনার ব্যাগে কি সব দরকারি কাগজ—

ব্যাস্! মাতালের পা আর টললো না। তিনজনে বিদ্যুৎ গতিতে যেন হাওয়ার সঙ্গে মিশে গেল।

ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীটের প্যারালাল একটা সরু গলিতে সারকুলার রোড থেকে ঢুকে সর্টকাট কচ্ছিলাম। খান তিনেক বাড়ী এগোবার পরই আমায় পড়তে হলো ছিনতাইয়াদের হাতে। রাত তখন মাত্র সাড়ে আটটা—অবশ্য শীতের রাত।

অপরাধীর ওপরই হোক আর শিকারের ওপরই হোক—কোন লোককে সহানুভূতি দেখাতে বা তেরিয়া হ'য়ে উঠতে দেখলে ভেবে নিতে হবে যে সে ঐ অপরাধীরই দলভুক্ত লোক। থানায় নিয়ে যাবার জন্য অপরাধীকে কোনদিন এদের হাতে ছেড়ে দিতে নেই। এরা সব চোরে চোরে মাসতুতো ভাই!

চোরের ওপর বাটপাড়ি।

চিৎপুর রোড আর দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীটের জংসনের কাছাকাছি ট্রাম ষ্টপেজ। রাস্তার ধারের সিটে একটি মহিলা ঈষৎ জানলার দিকে হেলে পার্শ্ববর্তিনীর সঙ্গে কথায় মসগুল। ট্রাম ছাড়লো। রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে এক ছিনতাইয়া মহিলার হারটি ছিনিয়ে দোড় মারলে। কিন্তু ধরা পড়ে গেল বামাল সমেত।

ট্রামটা তাড়াতাড়ি থামিয়ে ফেললে। ভদ্রমহিলা তার স্বামীর সঙ্গে নেমে এলেন ট্রাম থেকে। জনতা বললে, থানায় নিয়ে যান মশাই। এদের প্রশ্রয় দেওয়া মোটেই উচিত নয়।

ধোপদুরস্ত পোষাকধারী দুজন শুভানুধ্যায়ী হঠাৎ জনতা ফুঁড়ে ধৃত অপরাধীটিকে বেদম প্রহার করতে সুরু করলে। মার ধোর দিয়ে ভদ্রলোককে বললে, চলুন মশাই, বামাল সমেত ব্যাটাকে থানায় নিয়ে যাই। হারটা ওর হাতেই থাক। ব্যাটা অস্বীকার করতে পারবে না।

অগত্যা চোরের হাতেই হারটা দিতে হয় ভদ্রলোককে।

কে একজন ভিড়ের ভেতর থেকে বললে, জিনিষ যখন পাওয়া গেছে তখন আর থানায় গিয়ে নাইবা হাঙ্গাম হুজ্জুত করলেন। ব্যাটাকে বরং আরো ঘা কয়েক দিয়ে ছেড়ে দিন। পুলিশ—মানে 'বাঘে ছুঁলেই আঠার ঘা!'

—আপনি কি মশাই এই দলেরই নাকি? বললেন প্রথম ধোপ-দুরস্ত পোষাকধারী।

দ্বিতীয় ধোপদুরস্ত পাঞ্জাবীর আস্তিন গোটাতে গোটাতে বললেন, মুখ সামলে কথা বলবেন। নইলে একটি ঘুষিতে—

সুরু হলো মারামারি। মারামারি করতে করতে একজন ঢুকলো দুর্গাচরণ ষ্ট্রীটের ভিতর, অন্যজন বিপুল বিক্রমে ধাওয়া করলে তার পিছনে। এই সুযোগে চোরটি কখন সরে পড়লো কেউ তা লক্ষ্য করেনি। সবার মন তখন আকর্ষণ করেছে ঐ মারামারি।

আপনাতে আপনি ফিরে এসে সবাই দেখলে—যাকে নিয়ে এই দক্ষযজ্ঞ সে-ই অদৃশ্য।

হাতে পেয়েও হারটা নিজের বুদ্ধির দোষে বা অজ্ঞতার জন্য হারাতে হলো ভদ্রলোককে।

আসলে ঐ ধোপদুরস্ত পোষাকধারী দুটি শুভানুধ্যায়ী হচ্ছে ঐ ছিনতাইয়ার দলের লোক। ওরা থাকে আশে পাশে ভদ্রলোকের ছদ্মবেশে। বিপদ দেখলে ওরা এগিয়ে এসে অদ্ভুত অভিনয়ের মাধ্যমে বামাল সমেত উদ্ধার করে নিজেদের সঙ্গীকে।

এদের বুদ্ধির এবং প্রত্যুৎপন্নমতির প্রশংসা করতে হয়। এই বুদ্ধি যদি সৎ প্রেরণার দ্বারা পরিচালিত হতো তাহলে এদের দ্বারা অনেক ভাল কাজ হ'তে পারতো।

সন্ধ্যার একটু আগে বৃষ্টি হ'য়ে গেছে। পথ ঘাট এমনিতেই পিছল। লোকে সাবধানে পা টিপে টিপে পথ চলতে চেষ্টা করছে।

আবার বৃষ্টি নামলেও নামতে পারে। আকাশে মেঘ জমছে তাড়াতাড়ি যে যার কাজ সেরে বাড়ীর পথে পা চালিয়ে দিয়েছে।

হ্যারিসন রোড আর চিৎপুরের জংসনে ফুটপাথের ধারে লাইট পোষ্টে হেলান দিয়ে একটা লোক কলা খেয়ে খোসাগুলো ইচ্ছে করে ফুটপাথের ওপর ফেলছে। সেই কলার চোপায় পা পড়ে কেউ বা সামলে নিচ্ছে আবার কেউ বা পড়তে পড়তে রয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ এক ভদ্রলোক কলার খোসায় পা দিয়ে চিৎপাত হ'য়ে পড়ে গেল ফুটপাথের ওপর। তিন দিক থেকে তিনজন ছুটে এলো তাকে তোলবার জন্য—যেন এতক্ষণ এরা যে কোন মালদার লোকের পড়ার প্রতীক্ষাতেই ছিল। আজে বাজে লোক পড়ে অজ্ঞান হ'য়ে গেলেও তারা কাছে ঘেঁসবে না।

—কি মশা! বড্ড লেগেছে? বলে একজন ভদ্রলোককে টেনে তুললে।

—আরে মশাই! বরষা বাদলের দিন—একটু হুসিয়ারসে পথ চলতে হয়। এঃ হেঃ হেঃ—জামা কাপড় বিলকুল নোংরা হইয়ে গেল।

অন্য একজন পানের দোকান থেকে এক মগ জল নিয়ে এসে ভদ্রলোকের জামা, কাপড় ধুইয়ে দিতে লাগলো। কলকাতায় সব ইদুর দেখতে ভিড় জমে এতো আস্তো একটা জ্যান্ত মানুষ। 'কি হয়েছে মশাই' বা 'কি হলো ভাই' বলতে বলতে বিশ পঁচিশ জন জমে যেতে বিশ সেকেণ্ডও লাগলো না।

—আমার মণিব্যাগ! পকেটের দিকে চেয়ে প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন ভদ্রলোক।

কাজ শেষ করে শুভানুধ্যায়ীরা তখন গা ঢাকা দিয়েছে ভদ্রলোকের তখন 'আমি কার মেসো গো! আমি কার মেসো গো'! অবস্থা।

—আমার মণিব্যাগ কি হলো? পড়ে গেল? না কেউ নিয়ে

নিলে? ভদ্রলোকের এ প্রশ্নের উত্তর একমাত্র সে-ই দিতে পারে—যে ছিনতাই করেছে তাঁর মণিব্যাগ।

—আমি কার মেসো গো! আমি কার মেসো গো' বলে একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভিজে গামছা পরা অবস্থায় গঙ্গার ঘাটের প্রায় প্রতি লোকটিকে আকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করছেন।

—আপনি কার মেসো তা আপনি জানেন! আমরা কেমন করে জানবো!

—আমি যার মেসো তাকে তো খুঁজে পাচ্ছি না প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।

—ভিড়ের মধ্যে কোথাও না কোথাও আছে নিশ্চয়। ভাল করে খুঁজে দেখুন!

সারা ঘাটটা শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে ব্রাহ্মণ ঘুরতে লাগলেন, আমি কার মেসো গো—হ্যাগা আমি কার মেসো গো!

—কি হলো?

—আমি যার মেসো তাকেই খুঁজছি তার কাছে আমার গরম জামা কাপড়, ব্যাগ! আর টাকা পয়সা যা কিছু সব ঐ ব্যাগে! বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।

—বলি—ব্যাপারটা কি খুলে বলুন তো?

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যা বললেন তার সংক্ষিপ্ত সার:—বাগবাজারে মদন-মোহনের অন্নকোট দর্শন করলে কি ইহ জনমে কি পরজনমে অন্নের অভাব হয় না! তাই কয়েকটা টাকা যোগাড় করে দেশ পাড়াগাঁ থেকে এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এসেছেন কলকাতায় মদনমোহনের অন্নকোট দর্শনে। সকালে ট্রেণ থেকে নেমে হেঁটেই এসেছেন গঙ্গার ঘাটে। উদ্দেশ্য—গঙ্গাস্নান সেরে মদনমোহনের পূজো দেওয়া ও অন্নকোট দর্শন।

গঙ্গার ঘাটে বার কয়েক ঘোরাঘুরি করলেন কিন্তু কোন উড়ে ঠাকুরের কাছে বিশ্বাস করে ব্যাগ আর জামা কাপড় রেখে গঙ্গাস্নানে

যেতে তাঁর মন চাইলো না। কি জানি—বিদেশী লোক! পৈতে গলায় দিলেই আর ব্রাহ্মণ হয়না। শেষ কালে যদি বলে—না, আপনি কিছু রাখেননি! তখন—? তখন অন্নকোট দর্শনই বা হবে কেমন করে আর বাড়ীই বা ফিরবো কেমন করে!

মোট কথা—কাকেও বিশ্বাস করে তিনি জিনিষগুলি সঁপে দিতে পারছিলেন না। ঘুরছিলেন মনের মত বিশ্বাসী লোকের সন্ধানে।

—আরে! মেসোমশাই যে। বলেই একটি ছোকরা তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে পায়ের ধুলো মাথায় নিলে।

—কে বলতো বাবা! আমি তোমায় তো ঠিক—

—হেঁ হেঁ—তা চিনতে না পারারই কথা। কত ছোট বেলায় দেখেছেন। মা ঐ মেয়েদের ঘাটে স্নান করছেন। দেখলেই চিনতে পারবেন আমি কে? স্নান করবেন? আমাকেও একটা ডুব দিতে হবে। আচ্ছা, আপনিই আগে সেরে আসুন! বলে পরম আত্মীয়ের মত মেসোমশাইযেব হাত থেকে ব্যাগটা নিজের হাতে নিলে।

—তুমি তাহলে পরেই করবে—কি বল! আচ্ছা, ধর এই জামা কাপড়। তুমি গামছা আননি বুঝি?

—মা যে স্নান কবছেন—একখানা গামছা আনা হ'য়েছে।

মোসামশাই বললেন, ঠিক আছে। আমি তো এনেছি। একখানাতেই দু'জনের চলে যাবে। আচ্ছা, আমি তাহলে স্নানটা চটকরে সেবে আসি।

এতক্ষণ পরে তিনি বিশ্বাসী লোক পেলেন। সব কিছু তার হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে গামছাখানি সম্বল করে গঙ্গায় গিয়ে নামলেন। স্নান করলেন। আহ্নিক করলেন। ফিরে এসে দেখলেন —তাঁর পরম আত্মীয়টি যেখানে ছিল সেখানে নেই ছেলেটিব নামটাও জেনে নেওয়া হয়নি। তাইতো—গেল কোথায়? মুখটাও মনে পড়ছে না।

—হ্যাঁগা—আমি কার মেসোমশাই গা! হ্যাঁ গা—আমি কার মেসো গা।

উত্তর কোলকাতার কোন একটি পার্ক।

পার্কের একাংশে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খেলবার দোলনা প্রভৃতি নানা রকমের সাজ সরঞ্জাম আছে। অপরাহ্ণে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে বিভিন্ন বাড়ীর ঝিয়েরা এখানে জমায়েত হয়। ছেলেমেয়েদের ছেড়ে দেয়। তারা ছুটোছুটি লাফালাফি করে—ওরা গল্পে মসগুল হয়ে ওঠে।

গল্প মানে পরচর্চা—পরনিন্দা। যে যার মনিববাড়ীর কেচ্ছা ক'রে গায়ের ঝাল মেটায়। দু'একজন যে প্রশংসা না করে এমন নয়।

—বাবুদের বিবিদের জন্যে ভাই আসে কাটা পোনা আর আমাদের ভাগ্যে হয় চুনো পুঁটি আর নয় ঘাড় ভাঙা চিঙড়ি।

—যা বলেছো ভাই। বাঁধা কপি যখন মানুষে গরুকে খেতে দেয়—তখনও আমার মনিববাড়ী বাঁধাকপি আমদানি করে আমাদের জন্যে।

—শুধু কি তাই! নিজেদের বেলা পিঁপড়ের ঠ্যাঙের মত সরু দাদখানি চাল—আমাদের বরাতে বগড়া বিচি। কি বলবো দিদি—কড়াইয়ের ডাল নইলে সে ভাত গলা দিয়ে কি ছাই নামতে চায়!

—আমার মনিববা কিন্তু ভাই ওরকম চশমখোর নয়। নিজেরাও যা খাবে—আমাদেরও তাই খেতে দেবো। তবে বড্ড মুখ ঐ ছোট বৌটার। বড়লোকের মেয়ে বলে ঠ্যাকারে আর মাটিতে পা পড়ে না। মানুষকে মানুষ বলেই গ্রাহ্যি নেই। অথচ ওর ঐ মেজ জা—তিন তিনটে পাস করা মেয়ে। মুখে হাসিটি লেগেই আছে। তুই তোকারি করে কথা বলতে জানে না।

ওদিকে তখন চলেছে আর এক কাণ্ড।

—খোকা! লজেন্স খাবে? বলে সাদাসিদে পোষাকপরা একটা লোক ছেলেটির হাতে দুটো লজেন্স দিলে।

পাওয়া মাত্র লজেন্স দুটো মুখে পুরে দিয়ে আবার হাত বাড়ালে ছেলেটি, আলো দাও ?

—এই নাও—এগিয়ে এসো ! একটু দূর থেকে দুটো লজেন্স দেখালে লোকটি ।

ছেলেটি পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে সে লজেন্স দুটোও নিয়ে মুখে পুরলে। লোকটা আরো খানিকটা দূরে সরে গিয়ে ঠোঙা ভর্তি লজেন্সটা তুলে ধরলে ছেলেটির দিকে। ঠোঙা ভর্তি লজেন্স হাতে পাবার লোভে ছেলেটি তার কাছে এগিয়ে গেল।

লোকে ভাবছে—ওদেরই বাড়ীর চাকর ওকে নিয়ে খেলা করছে। ছোট ছেলেটি তখন বেশ খানিকটা দূরে চলে এসেছে—ঐ ঝিয়েদের চোখের অন্তরালে একটা ঝোপের ধারে ছেলেটিকে নিয়ে গিয়ে তার হাতে ঐ ঠোঙা শুদ্ধো লজেন্স দিয়ে লোকটি তাকে আদর করতে করতে হারটি খুলে নিলে এপাশ ওপাশ চেয়ে।

ছেলেটি বললে, আমাল হাল দাও—হাল--

লোকটি তখন কোন কথা না বলে—ছুটলো না ঠিক, তবে জোরে পা চালিয়ে দিলে।

—আমাল হাল—আমাল হাল—, বলতে বলতে ছেলেটা দু'এক পা লোকটার দিকে এগুতেই সে ছুটতে শুরু করলে।

ছেলেটার কান্না আর লোকটার ছোটা—লোকের মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুললে লোকটা ধরা পড়লো। ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে খেয়ে ফেললে হারটা। খেয়ে ঠিক ফেললে না—গলার কসে তৈরী করা গর্তে পুরে রাখলে।

লোকটাকে থানায় ধরে নিয়ে যাওয়া হলো।

যে সব ভদ্রমহিলা ভ্যানিটি ব্যাগে টাকা পয়সা নিয়ে মারকেটিঙে যান তাঁদের উচিত সাবধানে চলা ফেরা করা। অসতর্ক মুহূর্তে ভ্যানিটি ব্যাগ ছিনিয়ে নিতে এরা অভ্যস্ত। কার ব্যাগে টাকা

আছে আর কার ব্যাগে টাকা নেই তা এরা চোখ মুখ দেখে বুঝে নিতে পারে।

ব্যাঙ্কের কাউন্টারে এরা ভালমানুষের মত দাঁড়িয়ে থাকে। দেখলে মনে হবে—চেক্ জমা দিয়ে এরাও আছে টাকা তোলার প্রতীক্ষায়। মিষ্টার R টোকোন দিয়ে টাকা নিয়ে গণছেন আর একটা বাণ্ডিল রেখেছেন তাঁর পকেটে। হঠাৎ ভদ্রলোককে অন্য-মনস্ক করে দেবার জন্য একটা কি দুটো টাকা তার পাশে ফেলে দেয়—ভদ্রলোক পাশে চোখ ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পকেটে রাখা নোটের বাণ্ডিলটি ছিনতাই হ'য়ে যায় সন্দেহ করার কিছু নেই পাশের লোকটিকে। নোটের বাণ্ডিল সঙ্গীর হাতে পাচার করে দিয়ে সে যেখন দাঁড়িয়েছিল ভাল মানুষটির মত—তেমনি দাঁড়িয়েই থাকে। সন্দেহ করে তাকে সার্চ করলেও কিছু পাওয়া যাবে না।

দিন দুপুরে।

বাড়ীর সকলে গেছে নিমন্ত্রণ খেতে। বাড়ী পাহারা দেবার জন্য আছে শুধু আমার বড়দা নিমন্ত্রণ বাড়ীতে আমি তাড়াতাড়ি খেয়ে টিফিন কেরিয়ারে করে বড়দার জন্যে খাবার নিয়ে বাড়ী আসছি। গলির মোড়ে বড় রাস্তার ওপর বড়দার সঙ্গে দেখা। তিনি দরজায় তালা দিয়ে সিগারেট কিনতে বেরিয়েছেন। বহুদিন পরে হঠাৎ দেখা হ'য়ে গেছে তার এক পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে। তারই সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছেন।

—এই চাবি নে। আমি সিগারেট কিনেই যাচ্ছি। বললেন বড়দা।

—দেরী করোনা বেশী। বলে আমি বড় রাস্তা থেকে গলিতে ঢুকলাম।

লেনের ভেতর আছে একটা সরু বাই-লেন। আমাদের বাড়ীটা

ঐ বাই-লেনের ভিতর। লেনটা ব্লাইণ্ড বলে বাসীন্দারা ছাড়া অন্য কেউ এ গলিতে বড় একটা ঢোকে না। ফলে—লেনটা একটু নিরিবিলি।

পকেট থেকে চাবি বার করতে করতে আমি আমাদের দরজার কাছাকাছি এসে পড়লাম। চাবি নিয়ে তালা খুলতে গিয়ে দেখি—দরজায় তালাই নেই। এটা কি রকম হলো! বড়দা যে বললে—দরজায় তালা দিয়ে এসেছি। তালাটা গেল কোথায়? ভাবতে ভাবতে দরজা ঠেললাম। একি! দরজা যে ভিতর থেকে বন্ধ! আশ্চর্য্য তো! ওরা নিশ্চয় আমার আগে নিমন্ত্রণ খেয়ে ফেরেনি। ফিরলেও তাদের কাছে চাবি নেই। অথচ বড়দা এইমাত্র চাবি দিয়ে গেছে।

তবে কি এই ভর দুপুরে তালা ভেঙে বাড়ীতে চোর ঢুকলো। দরজার গায়ে ছিল একটা ছোট্ট ফুটো। সেই ফুটোটার ভেতর দিয়ে দেখি—ভেতরে কে যেন নড়াচড়া করছে। নিশ্চয় চোর! •

দরজার কড়া দুটো প্রাণপণে বাইরে থেকে টেনে ধরে 'চোর চোর' 'চোর ঢুকেছে' বলে পরিত্রাহী চীৎকার করতে লাগলাম। আমার চীৎকারে আশপাশের বাড়ী থেকে লোকজন বেরিয়ে পড়লো।

দরজায় ধাককা ধাককি করে ফল যখন কিছুই হলো না তখন অন্য বাড়ীর ছাদ দিয়ে পাড়ার কজন ছেলে আমাদের বাড়ীতে নামলো। নেমে তারা আমাদের বাইরের দরজার খিলটা খুলে দিলে। ভেতরে ঢুকে দেখি—তালাটা উঠোনে পড়ে আছে।

লোকটা চুপ করে বসে আছে ঘরের মেঝেয়। তার সামনে একটা পুঁটুলি। পুঁটুলিটা খুলে দেখা গেল—তার মধ্যে নিয়েছে দামি কাপড় আর অল্প কিছু টাকা। সো-কেস আর আলমারির চাবি খোলা। বামাল সমেত লোকটিকে হাতে হাতে ধরে ফেলা হলো। খবর পেয়ে থানার লোক এলো তদন্তে।

চোরের সংক্ষিপ্ত স্বীকারোক্তিঃ— আমি একজন তালাতোড়। ঐ কানা গলিটার ওপর অনেকদিন থেকেই আমার লক্ষ্য ছিল। ঐ গলির ভেতর ঢুকে দেখি—দরজায় তালা। তালা দিয়ে ভর দুপুরে বড় একটা কাছে-পিঠে কেউ যায় না। নিশ্চয় দূর পাল্লায় গেছে। সরু সিক দিয়ে তালাটা খুলে ফেলতে দেরী হলো না। ভেতরে ঢুকে খিলটা বন্ধ করে দিলাম। পাড়ার লোক দরজা ভিতর থেকে বন্ধ দেখে ভাববে—বাড়ীর লোকই বন্ধ করেছে।

তাড়াতাড়ি কাজ সারতে পারলে—এভাবে ধরা পড়তাম না। বাড়ীতে ঢুকে এমন একটা কুড়েমি ভাব এলো—যা কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম না। বসে বসে পর পর তিন চারটে বিড়ি খেয়ে তবে একটু চাঙ্গা হলাম। কাজ সেরে সবে মাত্র বোঁচকাটি বেঁধেছি—অমনি দরজার কড়া নড়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই আলস্য আমায় পেয়ে বসলো। চাঙ্গা থাকলে যে ছাদ বেয়ে বাবুরা ঐ বাড়ীতে নেমে এসে আমায় ধরলেন—ওঁদের আসবার আগেই আমি ঐ বাড়ীর ছাদে উঠে পালাতে পারতাম। মাঝে মাঝে কাজ করতে এসে এই রকম কুড়েমি আমায় পেয়ে বসে।

লোকটা দাগি আসামী। অলস অবস্থায় এরা কিছু করতে পারে না! এমন কি ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকলেও পালিয়ে আত্মরক্ষা করার স্পৃহাও হারিয়ে ফেলে। সাধারণতঃ অলসতা না কাটলে এরা কোন অপকার্য্য করতে বের হয় না।

ভাবপ্রবণতার বশে এরা পরিষ্কার ভাবে বলে ফেলে এদের অপকার্য্যের কথা। নিজের মুখে নিজের দোষ স্বীকার করতেও কুণ্ঠিত হয় না। ভাবপ্রবণতার জন্য নিজেদের বিপদ নিজেরাই ডেকে আনে। তবে এদের আলস্য বেশীক্ষণ থাকে না, আলস্য ভাব কেটে গেলেই কর্মতৎপর হ'য়ে ওঠে, ভাবপ্রবণতার ভাব কেটে গেলে এদের মুখ দিয়ে একটি সত্য কথাও বার করা যায় না।

এরাও এদের দুষ্কার্য্যের জন্য অনুতপ্ত হয়, এদেরও মনে জাগে অনুশোচনা। তবে এ অনুশোচনা একান্তই সাময়িক। তন্দ্রাচ্ছন্ন অপ-স্পৃহাকে এদের জাগাতে হয় না, তন্দ্রা টুটে গেলেই এদের অপরাধপ্রবণ মনে জাগে অপ-স্পৃহা, তখন আর এরা অনুতাপ বা অনুশোচনার ধার ধারে না। এরা হচ্ছে প্রকৃত অভ্যাস অপরাধী।

শহুরে চোরেদের কর্ম-পদ্ধতির সঙ্গে গ্রাম্য-চোরেদের কর্মপদ্ধতির তফাৎ আছে।

শহরের তালাতোড় বা সিঁধেল চোরেরা আগে ভাব জমায় বাড়ীর ঝি বা চাকরদের সঙ্গে। শুধু হাত মুখে ওঠে না। ঝি, চাকরদের নগদ কিছু দিয়ে বাড়ীর সব কিছু খোঁজ খবর নিতে শহরে সিঁধেল চোরেরা অভ্যস্ত। শহুরে লোকের ঝি, চাকর রাখতে হলে খুবই বিচার-বিবেচনা করে রাখতে হয়। কোন অজানা ঝি বা চাকর কোন মতেই রাখা উচিত নয়। অনেক সময় চাকরের ছদ্মবেশে এই সব বর্ণ চোরারাই গৃহস্থ বাড়ীতে ঢুকে—কিছুদিন থাকার পর এক দিন সুযোগ মত গৃহস্থের সর্বনাশ করে সরে পড়ে। জানা শোনা বিশ্বাসী ঝি, চাকররাই অনেক সময় লোভের বশবর্তী হয়ে চোরেদের অনুগত হ'য়ে পড়ে। ঝি, চাকরদের কাছ থেকে সব কিছু খোঁজ খবর নিয়ে এরা কাজে হাত দেয়। ঝি, চাকররাই এদের দরজা খুলে দিয়ে পরোক্ষ ভাবে করে মনিবের সর্বনাশ। বাড়ীতে কুকুর থাকলে চোর বা চোরেরা চুরি করতে যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে যায় মাংস আর নয় কুকুর। যে বাড়ীতে চুরি করবে সেই বাড়ীর কুকুর যদি নর হয় তাহলে সঙ্গে মাদী কুকুর আর মাদী কুকুর বাড়ীতে থাকলে নিয়ে যায় নর।

এছাড়া আগে থেকে কুকুরের সঙ্গে ভাব-আলাপ জমান থাকলে তো কথাই নেই। পরিচিত লোক হিসাবে চোরকে দেখে চাৎকার করা বা কামড়ানো দূরে থাক—কুকুরটা আনন্দে লেজ নাড়বে।

পার্কের একাংশ।

ঘাসের ওপব বসে বসে বিড়ি টানছে ছেদিলাল। বিরাট এ্যালসেসিয়ান কুকুরটা আধ-হাত জীব বাব করে ছেদিলালের পাশে শুয়ে আছে। বেলা প্রায় অপরাহ্ণ। প্রায়ই এই সময় কুকুরটাকে নিয়ে পার্কে আসে ছেদিলাল।

গতকাল ছেদিলালের পিছু নিযে পঞ্চানন দেখে এসেছে—তাব মনিব-বাড়ী। হ্যাঁ—মালদার আসামী। চাকবটাকে বাগাতে পারলে বেশ মোটা রকমের কিছু হাতানো যেতে পাবে।

পঞ্চানন এক ঠোঙা বিস্কুট নিয়ে ছেদিলালের পাশে বসে খেতে শুরু করলে। কুকুবটা বিস্কুটেব গন্ধে মুখ তুলে পঞ্চাননের দিকে চাইলে।

পঞ্চানন হেসে খানকয়েক বিস্কুট ছুড়ে দিলে কুকুবটাব মুখের কাছে।

—কি নাম ওব? ছেদিলালেব দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে পঞ্চানন।

ছেদিলাল বললে, লর্ড!

—বাঃ বেড়ে নাম চেহারার সঙ্গে নামেব মিল আছে কি রে লর্ড! এই নে বিস্কুট! বলে একখানা বিস্কুট নিজের হাতে ধবে রইলো পঞ্চানন। কুকুরটা উঠে এসে পঞ্চাননেব হাত থেকে বিস্কুটটা মুখে করে নিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে গেল।

নিজে হাতে ধরে কুকুবটাকে খাওয়ানোব উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকে বশ করা—তার সঙ্গে আলাপ জমানো।

পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগাবেট বার করলে পঞ্চানন। নিজে একটা মুখে দিয়ে আর একটা এগিযে ধবলে ছেদিলালের দিকে। সিগারেট টানতে টানতে ছেদিলালের সঙ্গে তার দেশের গল্প, বাড়ীর গল্প—মানে, বেশ ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠতে চেষ্টা করলে পঞ্চানন।

কলসীর চা দু' ভাঁড় নিয়ে দু'জনে খেলে, পয়সা দিলে পঞ্চানন।

এতদিন পার্কে আসছে ছেদিলাল—চা, সিগারেট খাওয়ানো দূরে থাক, কেউ তাকে একটা বিড়িও যেচে দেয় না। পঞ্চাননের ওপর মুগ্ধ হলো ছেদিলাল।

আবার তার পরদিন যথা সময় যথাস্থানে দেখা। আবার চা, সিগারেট, কুকুরের জন্য বিস্কুট। এই ভাবে সপ্তাহখানেকের মধ্যে আগাম দশটি টাকা ছেদিলালের হাতে নগদ দিয়ে পঞ্চানন তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে নিলে।

সেদিন শনিবার।

বাড়ীর রাধুনী বামুন বৈকালে রান্নার কাজে ছুটি নিয়ে গেল তার এক দেশওয়ালী ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে খিদিরপুর। সে রাত্রে ঠাকুর আর ফিরবে না। ছুটি অবশ্য সে আগে থাকতেই গৃহকর্ত্রীর কাছ থেকে নিয়ে রেখেছিল।

ছেলেমেয়েদের দেখবার মত একখানা ইংরিজি ছবি এসেছে মেট্রোয়। সবার জন্যে কর্তা আগে থেকেই টিকেট কিনে রেখেছেন ইভিনিং শোর। ছবি দেখে সবাই হোটেল থেকে খেয়েই ফিরবেন—এই হলো সাব্যস্ত।

ছেদিলাল—বিশ্বাসী ছেদিলাল রইলো লর্ডকে নিয়ে বাড়ী পাহারা দেবার জন্য।

ছেলেমেয়েদের নিয়ে মিষ্টার B-র ফিরতে রাত সাড়ে দশটা হ'য়ে গেল। দরজার কড়া ধরে নাড়া দিলেন। কোন সাড়া নেই। কি আশ্চর্য্য! ছেদিলাল কি ঘুমিয়ে পড়লো। আবার সজোরে কড়া-ধরে নাড়া দিলেন। কেউ এসে খুলে দিলে না। ভিতর থেকে ভেসে এলো লর্ডের চীৎকার।

ধাক্কা দিতেই খুলে গেল দরজাটা। সব অন্ধকার! একটা বাতিও কোথাও জ্বালা নেই। দরজায় নেই খিল—সারা বাড়ী অন্ধকার। কি ব্যাপার! সুইচ অন্ করেও বাতি জ্বলছে না, তবে কি যেন ফিউজ হ'য়ে গেছে!

—ছেদিলাল! ছেদিলাল! ও ছেদিলাল!

কোন সাড়া নেই।

দরজার পাশেই মিটার বক্স। দেশলাই জ্বেলে মিষ্টার B দেখলেন—মেন সুইচ অফ করা রয়েছে। অন্ করে দিলেন মেন সুইচ।

প্রথমেই চোখে পড়লো লর্ডকে চেন দিয়ে বেঁধে রাখা হ'য়েছে। অথচ বাড়ীতে সে ছাড়াই থাকে। আর একটু লক্ষ্য করতেই দেখা গেল—দু'এক টুকরো মাংসের হাড় পড়ে আছে লর্ডের মুখের কাছে।

সিঁড়ির আলো জ্বেলে মিষ্টার B তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে গেলেন। তিনটে ঘরের দরজাই খোলা পড়ে রয়েছে। ঘরের জিনিষপত্তর কেমন যেন এলো-মেলো। ষ্টিল-আলমারির দরজাটা একটা টান দিতেই খুলে গেল। ষ্টিল-আলমারির চাবি খুলতে এ্যাসিডের সাহায্য নেওয়া হ'য়েছে। গহনা, টাকা পয়সার চিহ্ন মাত্র নেই। চাবি বন্ধ সো-কেসের ডালাটা খোলাই পড়ে আছে। ভাল এবং দামী জামা কাপড় একখানাও নেই। নাম খোদাই করা রূপোর বাসনও নিয়ে গেছে। কাঁসা পিতলের বাসনে হাত দেয়নি।

ছেদিলাল উধাও।

ছেদিলাল যে দোষী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। চোর বা চোরেরা ছেদিলালকে চুরি করেও নিয়ে যায়নি আর খুন করেও রেখে যায়নি। আর ছেদিলালের একার দ্বারাও এ কাজ হয়নি, তার প্রমাণ—আলমারির তালা খুলতে এ্যাসিড ব্যবহার। তবে ছেদিলালের যোগাযোগে যে এই অপকার্য্য হয়েছে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। ঘর শত্রু বিভীষণ ছেদিলাল সব কিছু সুযোগ সন্ধান আগে থেকে দিয়ে রেখেছিল দুষ্কৃতকারীদের। নইলে আজকের এই অনুপস্থিতির সুযোগ তারা নিলে কেমন করে?

তদন্তের সময় পুলিশের চোখে পড়লো একটুকরো ভাঁজ করা কাগজ—চৌকাঠের ধারে। সেটা একটা লণ্ড্রীর বিল।

মিষ্টার B বললেন, এ বিল আমাদের নয়।

রাত প্রায় দুটো।

বিলের ওপর লেখা কাচতে দেওয়া কাপড়ের মালিকের নাম ও ঠিকানা অনুসারে সদলে পুলিশ গিয়ে হানা দিলে এক কুখ্যাত বস্তি বাড়ীতে। এখানে থাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর বেশ্যারা।

বাড়ীটা তিন তলা। এক একখানি ঘড় ভাড়া নিয়ে থাকে এক একটি বেশ্যা। অভ্যাস বেশ্যারাই এই ধরণের বস্তিবাড়ীতে বাস করে। দেহের বেসাতীই এদের একমাত্র পেশা। ঠিকে ঝি বা চাকর এদের ঘরের কাজ করে, বাজার করে, রান্নার উনুন ধরিয়ে দেয়। এরা শুধু দু'বেলার রান্না এক বেলায় সেরে নেয় অথবা রাত্রে দোকান থেকে রুটি পরোটা আনিয়ে খায়। এদের অধিকাংশেরই থাকে একটি করে ভালবাসার বাবু। তারা এদের পোষে না—এই বেশ্যারাই তাদের অনেক ক্ষেত্রে ভাত কাপড় দিয়ে পুষে থাকে। অনেকে ঐ সব পোষা বাবুদের ঠাট্টা করে বলে থাকে—রাত বারোটার বাবু।

সন্ধ্যা থেকে এরা বাড়ীর দরজার ধারে সেজেগুজে দাঁড়ায় খরিদ্দারের প্রতীক্ষায়। দরে পোষালে তারা তাকে ঘরে নিয়ে যায় আর নয় বাড়ীর দরজার ধার থেকেই ধূলো পায়ে বিদায় দেয়।

সারা রাতের বাবু পেলেও এরা ফেরায় না। ভালবাসার বাবুর যদি বাড়ী ঘরদোর থাকে তাহলে সে নিজের বাড়ী চলে যায় আর ও বাসাই না থাকলে বেচারাকে মশা চাবড়াতে হয় প্রেমিকার রান্নাঘরে বা বাড়ীর ছাদে, আনাচে-কানাচে শুয়ে।

নির্দিষ্ট ঘরের সামনে গিয়ে পুলিশ দেখলে—দরজা ভিতর থেকে বন্ধ, জানলায় পর্দার ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। ভেতরে গান হচ্ছে।

দরজায় ধাক্কা দেবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েলি গলায় বললে, কে! কে—!

—শীগগীর দরজা খোল।

এক মিনিট যায়—দু-মিনিট যায়—তিন মিনিট যায়—দরজা আর খোলে না। পুলিশের সবুট আঘাতে দরজা সশব্দে খুলে গেল।

—কি নাম তোমার? জিজ্ঞাসা করা হলো মেয়েটিকে।

—আজ্ঞে, মিতা।

—মিতা—না মিতালী?

—ডাক নাম মিতা আর ভালো নাম—

তদন্তের সুবিধার জন্য মিষ্টার B-কে পুলিশ সঙ্গেই এনেছিলেন। মিষ্টার B কি যেন বললেন পুলিশ অফিসারের কানে কানে।

তাকিয়ায় ঠেসান দেওয়া মাতালটিকে দেখিয়ে পুলিশ অফিসার বললেন, আপাততঃ এটির সঙ্গেই কি তোমার মিতালী চলছে?

—আমি ওর কাছেই বাঁধা আছি।

—হুঁ! পরণের ঐ বেনারসীটি কি উনিই কিনে এনেছেন আজকে? আর গলার ঐ হারটা?

মিতালীর পাংশু মুখ যে কতখানি বিবর্ণ হ'য়ে গেল তা বলে বোঝান শক্ত! সে কি যেন বলতে চেষ্টা করলে—মুখ নড়লো কিন্তু কথা ফুটলো না।

—কি নাম তোমার বাবুটির?

জড়িত কণ্ঠে মাতালটি বললে, আজ্ঞে—আমার নাম হরি—হরিহর—হরিহর মণ্ডল!

—Shut up।

জোড় হাত করে মাতালটি বললে, আজ্ঞে—মাইতি। হরিপদ মাইতি।

মিতালীর দিকে চেয়ে অফিসার দৃপ্ত কণ্ঠে বললেন, সত্যি করে বল—এর কি নাম?

মিতালী নীরব।

—যদি বাঁচতে চাও—বল এর কি নাম?

—আজ্ঞে—পঞ্চু ওর ডাক নাম। ভাল নাম পঞ্চানন।

—হারমোনিয়মটা পড়ে আছে। সরিয়ে ফেলেছো মদের বোতল! আর কোথায় কি সরিয়েছো বল তো? বলতে বলতে অফিসার নিজেই গিয়ে হারমোনিয়মের বাক্সোর ডালাটা খুলে ফেললেন।

বেরিয়ে পড়লো টাকা কড়ি, গহনা আর রূপোর বাসন

—ও হে মক্কেল! গা তোল তো?

—আজ্ঞে, আমায় বলছেন? বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল পঞ্চানন।

—এখানটা এত উঁচু কেন। বলে পাতলা তোষকটা ধরে টান দিতেই তার তলা থেকে বেরিয়ে পড়লো মিষ্টার B-র চুরি যাওয়া দামী শাল আর কাপড় চোপড়।

মালতী আর পঞ্চাননকে গ্রেফতার করে বামাল সমেত থানায় নিয়ে আসা হলো

পরদিন জেরার মুখে পঞ্চানন বললে, বাদ বাকি যে সব জিনিষ পাওয়া যাচ্ছে না তা নিয়ে গেছে ছেদিলাল তার ভাগ হিসাবে

ছেদিলাল সম্বন্ধে পঞ্চানন বিশেষ কিছুই বলতে পারলে না তার দরকার ছিল মিষ্টার B-এর বাড়ী আর কোথায় কি রাখা আছে তারই ঠিকুজি কুষ্ঠির—ছেদিলালের নয়।

ছেদিলাল ধরা পড়লো কিছুদিন পরে তার দেশের বাড়ীতে মিষ্টার B-র নামাঙ্কিত কয়েকখানি রূপার বাসন ছাড়া আর তার কাছে কিছুই পাওয়া গেল না।

বিচারে সাজা হ'য়ে গেল পঞ্চানন আর ছেদিলালের.

পঞ্চাননের মত অভ্যাস অপরাধীদের আস্তানা হচ্ছে কোঠা বস্তি বাড়ী। কারণ অভ্যাস অপরাধীদের সঙ্গে মিল খায় অভ্যাস বেশ্যাদের। মিতালীর লণ্ড্রীর বিলখানা অসাবধানে পকেট থেকে পড়ে যাওয়ায় তাকে তাড়াতাড়ি গ্রেফতার করার সুবিধা হলো।

শহরে এমন অনেক ব্যারাক বাড়ী আছে যার সদর দরজা বলে কিছু নেই, থাকলেও রাত্রে সে দরজায় না পড়ে খিল বা না পড়ে তালা। বারোয়াবির বাড়ী—খিল, তালা দিলে বাসীন্দাদের অসুবিধা হয় তাই সারা রাত খোলাই পড়ে থাকে। কে কখন আসছে—কে কখন যাচ্ছে—কে বাবে বাবে খুলবে খিল বা তালা।

এ হেন বাড়ীতে যে কেউ যে কোন সময় বিনা কৈফিয়তে যাওয়া আসা করতে পাব।

চোরেরা দিনের বেলা এসে কোন্ ঘরে রাত্রে কে বা ক'জন থাকে—ঘরের কোথায় কি জিনিষপত্তর রাখা আছে—সব হদিস নিয়ে যায় কোন্ ঘরে রাত্রে চাবি লাগিয়ে কে নাইট-ডিউটিতে যায়—এ সব খোঁজ খবরও রেখে থাকে তস্করকারীরা।

শহরের এইরকম একটা ব্যারাক বাড়ীতে চুরির হিড়িক পড়ে গেল একবার। আজ এর ঘরের তালা ভেঙে চুরি হলো, কাল ওর ঘরের জানলার গরাদ বেঁকিয়ে ঘরের দামী দামী জিনিষপত্তর নিয়ে গেল পরশু তার ঘরের খিল বাইরে থেকে খুলে টাকা-পয়সা সমেত সুটকেস এমন ভাবে নিয়ে উধাও হলো যে ঘরের লোকটি ঘুমন্ত অবস্থায় তা টের পেলে না।

পুলিশ আসে—তদন্ত করে কিন্তু চুরির কোন কিনারা করতে পারে না। সমানে চুরি চলতে থাকে।

চুরি বন্ধ করার জন্য রাত এগারটায় বাড়ীর গেটে তালা দেওয়ার ব্যবস্থা হলো। চুরি কিন্তু বন্ধ হয় না।

বোঝা গেল—চোর বাইরের নয়, ভেতরের। নাইট গার্ডের ব্যবস্থা হলো কিন্তু চুরি চলে সমানে।

চুরির পরদিন ভোরে সব ঘর তন্ন তন্ন করে সার্চ করা হয় কিন্তু কারো ঘরে চুরির জিনিষ পাওয়া যায় না।

ঐ ব্যারাকবাড়ীর একখানা ঘরের দরজার ওপর ছোট্ট প্লেটে লেখা আছে—T. R. D. Co. order Supplier.

দিনের বেলায় এই ঘরে অফিসের কাজ হয় খাতাপত্র নিয়ে আর ভোরের দিকে সুরু হয় মালপত্র বাঁধাছাঁদা—প্যাকিঙের কাজে।

মজা এই—T. R. D. Co. থেকে মাল বাইরে চালান যায় কিন্তু মালটা আসে কোথা থেকে? বাইরে থেকে এখানে মাল-পত্তর আসতে কেউ কোনদিন দেখেনি!

পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী দ্বারোয়ান চুপি চুপি রাত সাড়ে চারটের সময় বাড়ীর গেট খুলে দিলে। ছদ্মবেশী পুলিশ গিয়ে T. R D কোম্পানীর ভেজানো দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলো ভিতরে তখন সবে মাত্র প্যাকিঙের কাজ সুরু হ'য়েছে পাশে পড়ে আছে একটি নামাঙ্কিত সুটকেশ—প্যাকিঙের প্রতীক্ষায়. কাঠের বাকসোর ভিতর যে বস্তুটি ভরে চট দিয়ে সেলাই হচ্ছিল— সেটি একটি ট্রাঙ্ক।

অনুসন্ধানে জানা গেল সেদিন রাতে যার ঘরে চুরি হ'য়েছে তারই নাম লেখা এই সুটকেশে আর ট্রাঙ্কটাও তারই •

বামাল সমেত দুষ্কৃতকারীদের গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হলো।

এরা টিনের পাত দরজার ফাঁকে ঢুকিয়ে দিযে অতি সন্তর্পণে খিল খুলে ঘরে ঢুকতো। দিনের বেলায় দেখে রাখা জিনিষ অন্ধকারে আন্দাজ করে তুলে নিয়ে চুপিসাড়ে বেরিয়ে হাজির হতো T. R D কোম্পানীতে। তারপর ভোর বেলাই ডেসপ্যাচ্। ডেসপ্যাচ হোত চোরাকারবারিদের কাছে—চোরাই মাল যারা কেনে। দিনের পর দিন লোকের চোখের সামনে দিয়ে তাদেরই জিনিষ এরা কারবারীর ছদ্মবেশে বাড়ীর বাইরে নিয়ে যেতো. লোহার সিন্দুক খুলে ফেলতো এ্যাসিডের সাহায্যে' চুরির আধুনিক যন্ত্রপাতী সব কিছুই ছিল এদের সংগৃহীত।

এদের কার্য্য পদ্ধতি দেখলে—এদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। সৎ প্রেরণার দ্বারা পরিচালিত হলে এদের সুপ্ত অপ-স্পৃহা

জাগ্রত হবার সুযোগ পেত না। বুদ্ধির জোরে অনেক ভাল কাঁ
মাথা ঘামিয়ে প্রচুর পয়সা উপায় করতে পারতো কিন্তু অপরাধপ্রবণ
মন সৎকাজ করতে দিলে না, করে তুললে অভ্যাস-অপরাধী।

রাজ মিস্ত্রী, ছুতোর মিস্ত্রী, ইলেকট্রিক মিস্ত্রী, ঝাড়ুদার, বাসন-ওয়ালী, প্রভৃতির কাছ থেকে বাড়ীর আভ্যন্তরিক খোঁজ খবর নেয় আর নিজেরা শিশি বোতলওয়ালা পুরাতন কাগজওলা হিসাবে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বাড়ীর বাইরেটা ভাল করে দেখে নেয় দিনের বেলা। অনেক বাড়ীর গা বেয়ে উঠে গেছে জলের ট্যাঙ্কের পাইপ। কোন বাড়ীর পিছন দিকে ফিট করা থাকে লোহার একহারা ঘুরানো সিঁড়ি। কোন বাড়ীর পাইখানার দিকের দরজাটা ঈষৎ পলকা—এ সব তথ্য এরা অপকার্য্যের সুবিধার জন্য আগে থাকতেই সংগ্রহ করে।

চুরির আধুনিক সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে দ'ড়র মইও একটি।

বড়বাজার অঞ্চলে কোন একটি পাঁচতলা বাড়ীর উপর তলায় এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের গদি ঘর। নীচের তলায় তাঁর গো-ডাউন। সারা বাড়ীখানা জুড়ে বিভিন্ন লোকের কারবার আর কারবার সংক্রান্ত অফিস। বারোয়ারীর এই বাড়ীখানায় সূর্য্য উদয় থেকে অস্ত পর্য্যন্ত শুধু হৈ চৈ আর হট্টোগোল। রাতের বেলা—জনমানব শূন্য। দু'জন দ্বারোয়ান নিত্য ভাঙ খেয়ে তাদের দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে নাসিকা গর্জন করে বাড়ী পাহারা দেয়।

মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের গদি ঘরের ছাদের অল্প কিছুটা অংশ মোটা তারের জালের ওপর কাচ দিয়ে ঢাকা—আলো আসবার জন্য।

সেদিন অফিস টাইমে গদি ঘরের দরজা খুলেই দেখা গেল—একটা লোক চুপচাপ বসে বিড়ি টানছে। তার পাশে পড়ে আছে তারের জাল কাটা যন্ত্র, ইস্পাত বা লোহা ছেঁদা করা আধুনিক ড্রিল,

একটা হাতুড়ি। অদূরে মেঝের ওপর এঁকে বেঁকে পড়ে আছে কুণ্ডলি পাকানো সাপের মত একটা দড়ির মই।

ঘরের অন্যান্য জিনিষপত্র সব ঠিকই আছে, শুধু লোহার সিন্দুকটি খোলা আর তার ভিতরের ক্যাস বাকসোটি পাওয়া যাচ্ছে না।

থানায় খবর দেওয়া হলো। পুলিশ এলো তদন্তে।

—কি নাম তোর ?

—নামের কি দরকার! চোরের নাম চোর! আমার ঠাকুদা ছিল ডাকাত, বাবা ছিল পাড়াগেঁয়ে সিঁধেল চোর আর আমি হ'য়েছি শহুরে চোর! লোকটির কথায় বোঝা গেল—অলসতা কাটিয়ে সে বেশ দাম্ভিক হ'য়ে উঠেছে, যা সচরাচর অভ্যাস অপরাধীরা হ'য়ে থাকে।

—দড়ির সিঁড়িটা তো নীচে পড়ে আছে। ছাদ থেকে নামলি কি করে ?

—নেমেছি ঐ সিঁড়ি বেয়ে আমরা দু জনে।

—তার মানে ?

—ছাতের রডের সঙ্গে সিঁড়িটা বেঁধে নীচে নেমেছি। সিন্দুক ভেঙে ক্যাস-বাকসো বার করেছি। তারপর ঐ ক্যাস-বাকসো সিঁড়ি বেয়ে ওপরে নিয়ে গিয়ে আমার সঙ্গী সিঁড়িটা রড থেকে খুলে দিয়ে চলে গেছে। শালা কত বড় বিশ্বাসঘাতক এবার ভেবে দেখুন। ছাড়ান আমি একদিন না একদিন পাবোই—তখন যদি ঐ হারামকে খুন না করি তো আমার নাম নিকুঞ্জ দুলে নয়। ঝড়ের মত এক নিঃশ্বাসে সদম্ভে বলে গেল নিকুঞ্জ দুলে।

—কোথায় থাকে তোর সাঙাৎ ?

—স্যাঙাৎ—স্যাঙাৎ বলবেন না হুজুর। ও শালা বেইমান। কোন বেইমানের সঙ্গে নিকুঞ্জ দুলে দোস্তি করে না। আমরা হলুম জাত সেয়ানা! ও ব্যাটা হলো ছিঁচকে। ব্যাটা ভবঘুরে খেতে না পেয়ে পথে পথে ঘুরে মরতো আর কাজের জন্যে তাগিদ দিতো। তাই আজ

কাজ করতে আসার সময় ভালো লোক না পেয়ে ও ব্যাটাকেই আমার এসিস্টেন্ট করে নিলুম—কাজ শেখাবো বলে। ব্যাগার খাটিয়ে শুধু হাতে ছেড়ে দিতাম না তো—ওর হিস্সে ওকে চুল চিরে ভাগ করে দিতাম।

—একেই বলে চোরের ওপর বাটপাড়ি। তা সঙ্গীটি থাকে কোথায় বললি না তো?

—ওর কি হুজুর—কোন চুলো আছে থাকবার। ও থাকে ভিখিরীদের সঙ্গে—হয় ফুটপাথে আর নয়তো তাদের ডেরায়। বললে নিকুঞ্জ।

—তোর সঙ্গীকে যদি ধরিয়ে দিতে পারিস তাহলে তোর সাজা অনেকখানি হালকা হ'যে যাবে।

সদম্ভে নিকুঞ্জ বললে, 'হালকা-ভারির' ভয় নিকুঞ্জ ভুলে করে না হুজুর। তিনবার খেটেছি—এবার হলে না হয় গণ্ডা পুরো হবে। আমি শুধু ঐ নেমকহারামটাকে একবার দেখে নেবো! আমার কোমরে দড়ি বাঁধুন। চলুন—ওর আস্তানাগুলো একটা একটা করে আপনাদের দেখিয়ে দিই!

সেদিন সন্ধ্যায় এক চণ্ডুখানায় নিয়ে গিয়ে নিজের অপকার্য্যের সঙ্গী ভূষণকে ধরিয়ে দিলে নিকুঞ্জ। শ'খানেক টাকা তার কাছে পাওয়া গেল। বাকি টাকা সে রেখে এসেছে খোলার বস্তীর এক বেশ্যার ঘরে।

নিকুঞ্জর সাকরেদ ভূষণ পুলিশকে নিয়ে গিয়ে তুললে সেই বেশ্যার ঘরে। এটি একটি স্বভাব-বেশ্যা। সকালে বৈকালে কোঠাবাড়ীর বাসীন্দা অভ্যাস-বেশ্যাদের বাসন মাজে, জল তোলে, ঘর ঝাঁট দেয়। বখশিসের বিনিময়ে 'বাবুদের' এনে দেয় মদ, চানাচুর, সোডা, পানের দোনা প্রভৃতি। রাত্রে করে দেহের বেসাতী। রিকসাওলা, মোষের গাড়ীর গাড়োয়ান, লরী ড্রাইভার, ঠেলাওয়ালা প্রভৃতি হচ্ছে এদের সন্ধ্যা-রাত্রের খরিদ্দার। গভীর রাত্রে এদের ঘরে আগমন হয় যত সব চোর,

জুয়াচোর, জুয়াড়ী, খুনে, বদমাইসদের। এই শেষোক্ত লোকেদের সঙ্গেই এদের জমে ভাল। অকথ্য ভাষায় গালাগাল, মার-পিট, জাপটা-জাপটি, খেয়ো-খেয়ি—না হলে এরা ঠিক তৃপ্তি পায় না। চোলাই মদ হচ্ছে এখানকার নেশার প্রধান উপকরণ।

ভূষণ যার ঘরে নিয়ে গেল—নাম তার বাতাসী। ভূষণের বয়স পঁচিশ—বাতাসীর বয়স পঁয়ত্রিশ। যেমনি রুক্ষ চেহারা—তেমনি রুক্ষ কথাবার্তা। বাণিজ্যের ছাপ তার কুশ্রী মুখখানাকে এমন জঘন্য কুশ্রী করে তুলেছে যে সে মুখের দিকে চাওয়া যায় না।

বাতাসী অস্বীকার করে বললে—ভূষণ তার কাছে কিছুই রেখে যায়নি, মিথ্যা কথা বলছে। বাতাসীর ঘর সার্চ করে ঘুটের স্তূপের ভেতর থেকে পাওয়া গেল একটা ছোট্ট পুঁটুলি। পুঁটুলির ভেতর পাওয়া গেল নগদ সাতশো টাকা আর খান তিনেক চেক। ক্যাস বাকসোটা ভাঙা অবস্থায় পাওয়া গেল একটা ডাষ্টবিনে জঞ্জাল চাপা অবস্থায়

বাতাসী বললে, ও টাকা তার নিজের উপার্জনের টাকা!

কিন্তু ঐ তিনখানা চেকই সব বেফাস করে দিলে। তার টাকার সঙ্গে 'চেক' এলো কোথা থেকে? এ কথার কোন সঙ্গত উত্তরই খুঁজে পেলে না বাতাসী। বাকী টাকা? বাতাসী স্বীকার করতে বাধ্য হলো—যে বাকি টাকা নিয়ে গেছে তার এক ভালবাসার বাবু! ভূষণের সঙ্গে বাতাসীর মুখ চেনা ছিল, আলাপ জমেছে গত ভোর রাত্রে

বাতাসীর ভালবাসার বাবুটিও শেষ পর্য্যন্ত ধরা পড়লো—কিন্তু টাকার কিনারা হলো না। বাতাসীর দেওয়া টাকা নেশা ভাঙ্ করে আর অন্য মেয়েমানুষের সঙ্গে স্ফুর্তি করে প্রায় সবই ফুঁকে দিয়েছে।

নিকুঞ্জ, ভূষণ আর বাতাসীর সাজা হ'য়ে গেল। প্রমাণ অভাবে রেহাই পেলে বাতাসীর ভালবাসার বাবু। বাটপাড়ির টাকাটা ভূষণের

পরিপূর্ণ ভোগে না আসায় সব চেয়ে বেশী খুশী হলো নিকুঞ্জ। জেলের ভেতরেই হোক আর বাইরেই হোক—বিশ্বাসঘাতক ভূষণকে কিছুতেই ক্ষমা করবে না নিকুঞ্জ—প্রতিশোধ সে নেবেই। দরকার হলে—ছিল চোর—হবে খুনী। ডাকাতি করতো ঠাকুর্দা—নিকুঞ্জ করবে খুন! অপরাধীরা বলাৎকার আর বিশ্বাসঘাতকতাকেই একমাত্র অপরাধ বলে গণ্য করে—অন্য যে কোন অপরাধ তাদের বিচারে, তাদের বিবেক বুদ্ধিতে অপরাধই নয়।

মদ, বেশ্যা এবং জুয়া অভ্যাস-অপরাধীদের অপরাধপ্রবণ চৌর্য্যবৃত্তি মনকে অপরাধ করতে সাহায্য করে। মাদকদ্রব্য পেটে না পড়া পর্য্যন্ত এদের মনে অপকার্য্য করার ঝোঁক চাপে না।

অভ্যাস-অপরাধী মেয়েছেলে চোরের সংখ্যা এ দেশে একেবারে নগণ্য নয়। সাধারণতঃ অভ্যাস-বেশ্যারাই এ ধবণের চৌর্যবৃত্তি করে থাকে।

মধ্য-বিত্ত সম্প্রদায় ভুক্ত লোক যৌনজ-প্রয়োজনে হানা দিয়ে থাকেন অভ্যাস-বেশ্যাদের কোঠাবাড়ীতে। খরিদ্দারদের মত্ততার সুযোগ নিয়ে এরা তাদের আংটি, টাকা, পেন, ঘড়ি প্রভৃতি আত্মসাৎ করে থাকে। তবে খুব সাবধানে এবং সতর্কতার সঙ্গে তাদের এই সকল অপকার্য করতে হয়। এ সমাজে এইভাবে চুরি করা অত্যন্ত দোষনীয় ও নিন্দনীয়। বদনাম একবার রটলে—এটা হয় তাদের সমাজের বদনাম। এই অপরাধের জন্য সমাজের বিচারে অনেক সময় দুষ্কৃতকারিণীর শাস্তির ব্যবস্থাও হয়ে থাকে!

মিষ্টার D কোন একটি প্রেসের পার্টনার ও ম্যানেজার। ভদ্রলোক শিক্ষিত, অমায়িক এবং পরোপকারী। সেদিন বেলা বারোটা আন্দাজ তাঁর এক পরিচিত বিশিষ্ট বন্ধু একখানি ক্রশ চেক এনে বললেন, ভাই! এই চেকটা ভাঙিয়ে দিতে হবে

ব্যাঙ্কে এ্যাকাউন্ট না থাকলে ক্রশ চেক তো ভাঙান যায় না তাই আমার এক জানিত লোক আমায় ধরেছে এটা ভাঙিয়ে দেবার জন্তে।

সরল বিশ্বাসে মিষ্টার D তখনি ঐ ক্রশ চেকখানি নিজের এ্যাকাউন্টে জমা দিতে পাঠিয়ে দিলেন এবং ক্যাস হওয়ার খবর পেলেই তিনি টাকাটা দিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু ঐ ক্রশ চেক যিনি দিয়েছেন—এখনই তাঁর কিছু টাকার দরকার এবং দরকারটা জরুরী। বন্ধুর খাতিরে মিষ্টার D নিজের পকেট থেকে পঞ্চাশটি টাকা দিয়ে দিলেন।

চেকখানা ছিল একশো টাকার।

পরদিন ভোরে মিষ্টার D এর বাড়ীর সদর দরজার কড়া সশব্দে নড়ে উঠলো। দরজা খুলে দেখা গেল—দলবল সহ থানার পুলিশ অফিসার। এই মুহূর্তে মিষ্টার D-র বাড়ী তাঁরা সার্চ করবেন।

করা হলো সার্চ কিন্তু সন্দেহজনক কোন কিছুই পাওয়া গেল না। মিষ্টার D কে তাঁরা গ্রেফতার করে নিয়ে গেলেন।

গত কালের জমা দেওয়া সেই 'ক্রশ চেকটা হচ্ছে চোরাই চেক'। জামিনে খালাস হ'য়ে বাড়ী এলেন মিষ্টার D।

অনুসন্ধানে জানা গেল—ঐ চেকের আসল মালিক একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। মাঝে মধ্যে তিনি একটু আধটু নেশা ভাঙ্ করে থাকেন। ব্যবসায়ী সেদিন ঐ সইকরা চেকখানা পকেটে নিয়েই তিনি অমুক বাগানে দুর্গা বিবির ঘরে গান শুনতে গিয়েছিলেন। ও সব পল্লীতে মদ নইলে গান জমে না তাই গান জমাতে হলে মদ নইলে চলে না। সেদিন ভদ্রলোকের নেশার মাত্রাটা বেশীই হ'য়ে গেসলো। রাত্রে বাড়ী ফিরে অতটা খেয়াল হয়নি, সকালে দেখলেন—চেকখানি ব্যাগে নেই। অমুক বিবির বাড়ী খোঁজ করে জানলেন—সেখানে কোন চেক তিনি ফেলে আসেননি। চেকখানা অসাবধানতা বশতঃ খোয়া গেছে ভেবে তিনি থানায় চেকের নম্বর দিয়ে একটা ডাইরি করিয়ে রাখলেন।

দুর্গা বিবির মা থাকে ভদ্রপল্লীতে তার দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে। তার কন্যা ঐ চেকখানি পাঠিয়ে দিয়েছে মায়ের কাছে—ভাঙিয়ে দেবার জন্য। যার মারফৎ চেকখানা এসেছিল—সে স্বীকার করলে কিন্তু দুর্গা বিবির মা ঐ চেকের কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করলে। মিষ্টার D-র বন্ধু প্রমাণ করতে পারলেন না যে ঐ ভদ্রমহিলাই তাঁকে চেকখানা দিয়েছিলেন ভাঙিয়ে দেবার জন্য।

নানা তদারক তদ্বিরের পর প্যাোর-ফাণ্ড বকসে বেশ কিছু মোটা টাকা আক্কেল সেলামি দিয়ে জেলের হাত থেকে সে যাত্রা অব্যাহতি পেলেন মিষ্টার D।

কোলকাতার কোন একটি বনেদি গৃহস্থ বাড়ী। পরিবারের লোক সংখ্যা অনেকগুলি হলে কি হয়—প্রায় অধিকাংশই থাকেন কোলকাতার বাইরে নিজ নিজ কর্মস্থলে। স্থায়ী ভাবে যিনি থাকেন—তাঁর আছে স্ত্রী, সাতটি ছেলেমেয়ে, একটি বিধবা পিসী, একটি চাকর আর একটি ঝি।

সেদিন রবিবার। দুপুরে তাঁদের এক আত্মীয়ের বাড়ী জন্ম-তিথি উপলক্ষে নিমন্ত্রণ। স্ত্রী, পুত্র কন্যাদের নিয়ে ভদ্রলোক নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলেন। বাড়ীতে রইলো পিসীমা, চাকর আর ঝি।

নিমন্ত্রণ সেরে বৈকালে ওঁরা বাড়ী ফিরে এলেন। গৃহিণী সো-কেসের ড্রয়ার চাবি দিয়ে খুললেন গহনা রাখবার জন্য। বাকি হার গাছটা—যা তিনি রেখে গেসলেন চাবি বন্ধ ড্রয়ারের ভিতর থেকে সেটা কোথায় গেল! আশ্চর্য্য ব্যাপার! ড্রয়ার খোলা থাকলেও নয় বোঝা যেতো—চোরে চুরি করেছে।

থানায় খবর দেওয়া হলো।

চাকরের জিনিষপত্র সার্চ করে কিছুই পাওয়া গেল না। কিন্তু ঝিয়ের ছোট পুঁটুলিটি সার্চ করে পাওয়া গেল এক থোলো চাবি।

থানা অফিসারের প্রশ্নের জবাবে ঝি বললে, নাম তার

ভদ্রকালী। বাড়ী বৰ্দ্ধমান। আজ প্রায় ছ'মাস হলো সে এই বাড়ীতে কাজ নিয়েছে—দেশ থেকে এসে। দেশে তার দাদার কারবাব ছিল। কাববার উঠে যাওয়ার ফলেই তাকে বিদেশে এসে ঝি-বৃত্তি করতে হচ্ছে। ঐ চাবির থোলো তার দাদার দোকানেব। আসবার সময়ে কি ভাবে ঐ চাবির গোছা তার সঙ্গে এসে গেছে তা সে নিজেই জানে না। দরকার না পড়লে সে বড একটা বাড়ীর বাইবে যায় না। পান দোক্তা কিনতে এক আধদিন দুপুরে সে বাডীব বাইরে যায়। আজ সে বাড়ীব বাইবে যায়নি।

—আজ তোমাব পান দোক্তা ফুবিয়েছে ?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

—অন্য দিনের মত আজ দুপুবে আনতে যাওনি কেন ?

—পিসীমা আব হবিয়া (চাকব) ছাডা বাড়ীতে কেউ ছিল না বলে যেতে পাবিনি।

—এখন তুমি কি পান দোক্তা আনতে যাবে ?

—গেলে ভাল হয়। নাহলে সন্ধ্যে হ'য়ে গেলে ভাল পান পাওযা যায়না।

—একটু অপেক্ষা করতে বলে পুলিশ অফিসার অন্যান্য ঘরের বিভিন্ন চাবি বন্ধ ড্রযার, আলমাবি, ট্রাঙ্ক প্রভৃতি ঐ ঝিয়েব চাবির থোলো দিয়ে খোলবাব নির্দেশ দিলেন।

প্রত্যেকটি ড্রয়ার প্রভৃতি খুলে দেখা গেল—মূল্যবান যা কিছু ছিল—তার একটাও নেই। চাবিকে চাবি বন্ধ অথচ ভিতরেব জিনিষ উধাও।

সাদা জামাকাপড পবা দু'জন পুলিশকে কি যেন কানে ,কানে বলে দিলেন পুলিশ অফিসার—তারা চলে গেল।

—মিষ্টার বাসু, আপনি এখন কোথাও যাবেন না। হয়তো আপনাকে আজ দরকার হ'তে পাবে। ভদ্রকালী, তুমি এবার তোমার পান দোক্তা কিনতে যেতে পারো ! বলে পুলিশ অফিসার

চলে যেতে যেতে ভদ্রকালীকে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাকে সন্দেহ হয় বল তো?

—ঐ ব্যাটা হরিয়া—আবার কাকে!

হরিয়াকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ অফিসার সদলে থানায় ফিরে গেলেন—ভদ্রলোকের বাড়ীর ফোন নম্বর নিয়ে।

ভদ্রকালী প্রফুল্ল অন্তরে পান দোক্তা কিনতে চলে গেল। সন্ধ্যা পেরিয়া রাত্রি হলো—ভদ্রকালীর আর দেখা নেই। বাড়ীর লোকের মনে সন্দেহ ঘনীভূত হ'য়ে উঠলো। তবে কি হরিয়াকে পুলিশ ভুল করে ধরে নিয়ে গেল।

রাত্রি ন'টা নাগাদ ফোন এলো থানা থেকে।

মিষ্টার বাসু থানায় যেতেই একগাছা হার দেখিয়ে পুলিশ অফিসার বললেন, এই হারটা কি মিসেস বাসুর?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আজ দুপুরে নিমন্ত্রণ খেতে যাবার সময় এটাই তিনি ড্রয়ারে রেখে গেসলেন।

—আর এই—এই জিনিষগুলি?

'এই-এই জিনিষগুলির' মধ্যে ছিল গোটাকয়েক আঙটি, দু'গাছা সরু হার, একটা তাবিজ, এক জোড়া মানতাসা, তিনটে পেন, একটা লেডিজ রিষ্টওয়াচ প্রভৃতি। এর মধ্যে কয়েকটা জিনিষ ছিল মিষ্টার বাসুর।

—আজকের হারটা পাওয়া গেছে ভদ্রকালীর দেহ তল্লাস করে আর অন্যান্য জিনিষ বেরিয়েছে তার ঘর থেকে!

—ঘর! ভদ্রকালীর এখানে কোন বাসা আছে নাকি! বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে জিজ্ঞাসা করলেন মিষ্টার বাসু।

অথঃ ভদ্রকালী উপাখ্যান ঃ—

পুলিশ অফিসারের নির্দেশ অনুসারে দু' জন পুলিশ সাদা পোষাকে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল গলির মুখে বড় রাস্তার ওপর। ভদ্রকালী গলির মুখে আসতেই তারা অলক্ষ্যে থেকে তাকে অনুসরণ করলে। ভদ্রকালী

পান দোক্তা না কিনে হন-হনিয়ে চলতে সুরু করলে। ঢুকলো গিয়ে এক খোলার বস্তিতে। নিজের ঘরের তালা খুলে ঢুকতে যাবে—এমন সময় ঐ ছদ্মবেশী দু'জন পুলিশ তাকে থানায় ধরে নিয়ে এলো।

ভদ্রকালী তার যোনী-গহ্বর থেকে বার করলে মিসেস বাসুর হার। তারপর তার ঘর খানাতল্লাসী করে পাওয়া গেল উপরিউক্ত অন্যান্য চোরাই মাল।

নিজের পুঁটুলির ভিতর লুকোনো চাবির থোলোই করলে তার সর্বনাশ!

শ্রীমতী ভদ্রকালীর বাড়ী বর্দ্ধমান নয়—অমুক বাগান। তারা হচ্ছে তিন পুরুষের বেশ্যা। ভদ্রলোকের বাড়ী ঝিয়ের কাজ নিয়ে ঢুকে সুযোগ মত চুরি করাই তার পেশা। এইভাবে বহু গৃহস্থের সে সর্বনাশ করেছে চুরি-অপরাধে এর আগে দু'বার তার জেল হয়েছিল

নাম তার ভদ্রকালী কিন্তু ভদ্রভাবে জীবন যাপন করা কুষ্ঠিতে তার লেখেনি তার 'বাবু' একজন দুর্দ্ধর্ষ গুণ্ডা। বর্তমানে তিনি জেলে আছেন দূর থেকে দেখলে মনে হবে—ভদ্রকালী মেয়ে নয় —লম্বা-চওড়া একটা কাটখোট্টা পুরুষ—, চেহারাটা তার এমনি পুরুষালী।

বিচারে ভদ্রকালীর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

দেহের বিভিন্ন অঙ্গে উল্কি খোদাই করে অপরাধীরা আত্মতৃপ্তি পায়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উল্কি দেখে অনুমান করা যায়—লোকটা কি ধরনের অপরাধী। অপরাধ-প্রবণ পুরুষই নয়—নারীও শরীরে উল্কি ধারণ করতে ভালবাসে।

দেহের যে সমস্ত অঙ্গ অনাবৃত থাকে—সেই সমস্ত অঙ্গে উল্কি ধারণ করে যারা নিজেদের জাহির করতে চায় তারাই হচ্ছে প্রকৃত

অপরাধী। অভ্যাস অপরাধীরা উল্কি ধারণ করে এমন সব অঙ্গে—যা সাধারণতঃ ঢাকা থাকে—যেমন, দাবনা, উরু, পেট প্রভৃতি। অনেকের যৌনদেশও উল্কি-অঙ্কিত দেখা গেছে।

নিশুতি রাত। পল্লীগ্রামে শিয়ালের ডাকে প্রহর গ'ণে চোরেরা চুরি করতে আসে।

পল্লীগ্রামে একটি বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ বাড়ী। অন্যান্য ঘরের দরজা জানালা বেশ জবরদস্ত শুধু রান্নাঘরটি বাদ দিয়ে। পল্লী অঞ্চলের রান্নাঘরের দরজা জানালা সাধারণতঃ একটু পলকাই হ'য়ে থাকে। পল্‌কা জানলার শিক্ উনুনের ধোঁয়ায় অল্পদিনেই ঘুণ ধরে জীর্ণ হ'য়ে যায়।

রান্না ঘরটা ছিল বাড়ীব পিছন দিকে বাগানের ধারে। গরাদ বেঁকিয়ে চোবটা ঢুকলো রান্না ঘবে। হাড়ীতে ছিল জল ঢালা ভাত আর ভাজা মাছ। বেশ এক পেট খেয়ে নিয়ে কাজে লেগে গেল।

রান্নাঘরের সংলগ্ন ভাঁড়াব ঘবে ঢুকে চোরটা একটা থলের বস্তার ভিতর পুরে নিলে পিতল কাঁসার বাসন, ঘড়া দুটো। কিন্তু ভর্তি থলেটা জানালার অল্প ফাঁক দিয়ে বাইরে আনা যায় না—তাই আবার একটা একটা করে বাসন জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে শেষকালে নিজে বেরিয়ে এসে সেগুলো থলেতে ভরে নিলে।

শেষ প্রহরের ডাক ডেকে উঠলো শেয়ালের দল।

চমক ভাঙলো চোরটার। তাইতো—চারদিক যে ফরসা হ'য়ে এলো। এমন সময় থলে মাথায় নিয়ে যেতে দেখলে গ্রাম্য লোকেরা সন্দেহ করতে পারে। বাগানের পিছনে ছিল একটা এঁদো পচা পানা ভর্তি পুকুর। থলে ভর্তি বাসন নিয়ে এসে চোরটা ঐ পুকুরের একটা কোণে পাঁকের মধ্যে বুড়িয়ে দিলে। বাইরে থেকে দেখলে মোটেই বোঝা যাবে না যে এখানে কোন কিছু লুকানো আছে। স্থানটা চিহ্নিত করে চোরটা পাঁচ সাতটা বাগান, জলা

পেরিয়ে জমির আল্ ভাঙতে ভাঙতে দূর গ্রামে গিয়ে একটা রাস্তায় উঠলো।

গ্রামে চুরি হলে চৌকিদাররা একটু সজাগ সতর্ক হ'য়ে রোঁদে বেরোয়, রাত তখন প্রায় তিনটে। পাঁচ সাতটা গ্রাম্য কুকুরের সমবেত চীৎকারে চৌকিদার দূর থেকে অনুমান করলে—কিছু একটা ঘটেছে। চীৎকার লক্ষ্য করে তাড়াতাড়ি গিয়ে গাছের আড়াল থেকে দেখলে—একটা লোক কি যেন মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে, কুকুরগুলো ছুটছে তার পিছনে। চৌকিদার পেছন থেকে গিয়ে দু'হাত দিয়ে জাপটে ধরে ফেললে চোরটাকে। মাথার বোঝা ফেলে দিয়ে চোর এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মারলে ছুট। চৌকিদারের চীৎকারে লোকজন বেরিয়ে পড়লো বটে কিন্তু চোরটাকে ধরা গেল না। সে খানা ডোবা ঝাঁপিয়ে বন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কোন দিকে যে অন্ধকারে গা ঢাকা দিলে তা বোঝা গেল না। তবে থালে ভর্তি বাসন-কোসন, ঘড়া—সবই তাকে ছেড়ে যেতে হলো।

চৌকিদার আপশোষ করে বললে, আমারি বোকামির দোষে চোরটাকে ধরেও ধরতে পারলাম না। জানতাম যদি—ব্যাটা হড়হড়ে তেল মেখে এসেছে তাহলে জাপটে না ধরে দিতাম পায়ের গোছে সজোরে এক ডাণ্ডা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—লোকটা চুরি করতে গিয়ে আগেই ভাত খেতে বসলো কেন? আর খিদের তাগিদেই যদি চুরি করতে গিয়ে থাকে তাহলে খাওয়া-দাওয়ার পর আবার বাসন-কোসনে হাত দিলে কেন?

—এটা একটা ওদের তুক্-তাক্ বিশেষ। পান্তা ভাত খেয়ে কাজে নামলে নাকি সাফল্য অনিবার্য্য।

ভোরের আলো সবে মাত্র দেখা দিয়েছে।

সুরু হলো খেয়া পারাপার। প্রথম ট্রিপেই যারা নৌকায় উঠলো—তাদের মধ্যে তিন ভাগই কাজ করে নিকটস্থ চট কলে। বাকি ক'জন—মিস্ত্রী, দিন মজুর, জেলে। অল্প বিস্তর সকলেই মুখ চেনা, কেবল একটি লোক বাদে। লোকটির পরণে কালো লুঙ্গী। খালি গা। হাতে, বুকে, পিঠে—উল্কি। সঙ্গে একটি কাঠের সিন্দুক। মাকুন্দোর মত মুখে দু'চার গাছা ছাড়ানো দাড়ি। লোকটার চেহারায় কেমন যেন একটা সন্দেহের ছাপ সুপরিস্ফুট।

সিন্দুকটা মাথায় নিয়ে লোকটা সবার আগে তাড়াতাড়ি নেমে গেল—খেয়া নৌকা ঘাটে লাগাতে-না-লাগাতে।

—পয়সা—ও ভাই, পারের পয়সা!

শুনেও না শুনে লোকটা এগিয়ে চললো। মাঝি গিয়ে তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে বললে, কি রকম লোক হ্যা তুমি! পারের পয়সা না দিয়েই ভেগে পড়তিছো।

—সেতো সরকারী নৌক, পসা কেনো লাগবে?

—শোন গো বড়মিয়া—শোন, বলে কিনা—সরকারী নৌক!

বড়মিয়া বললে, ঠিকই তো বলেছে। সরকারী নৌক বলেই তো পয়সা লাগবে।

—পসা তো নেই মশা! একটা দশ টাকার লোট আছে।

—দেখো তো বড়মিয়া—কি হুজ্জুতি কাণ্ড! এই সাত সকালে লোটের খুচরো আমি কোথা পাই, বললে মাঝি।

—হয় লোটের ভাঙানি দাও—নয়তো আমি চল্লুম! বললে লোকটা।

খেয়া পারাপার করে দু'খানা নৌকা—একখানা যায় আর একখানা আসে। এদের এই বচসা হতে হতে ওপার থেকে আর একখানা নৌকা এসে গেল। অনেকের সঙ্গে পাড়ার মাতব্বর মিত্রমশাইকেও নামতে দেখা গেল নৌকা থেকে।

—সালাম মিত্তিরমশাই! এমন সাত সকালে হন্ত-দন্ত হ'য়ে চল্লেন কোথা? জিজ্ঞেস করলে বড়মিয়া।

ওদিকে মাঝির সঙ্গে সমানে বচসা হচ্ছে সিন্দুক মাথায় লোকটার —পারের কড়ি নিয়ে।

হঠাৎ ঐ কাঠের সিন্দুকটার দিকে লক্ষ্য পড়তেই মিত্রমশাই বড়মিয়ার কথার কোন উত্তর না দিয়ে এক রকম লাফিয়ে এসে সিন্দুক মাথায় লোকটার পিছনে সজোরে মারলে এক জুতোশুদ্ধো লাথি। সিন্দুক সমেত লোকটা মুখ থুবড়ে পড়লো মাটির ওপর।

—বাঁধো শালাকে পিছমোড়া করে! খবরদার—যেন না পালায়।

এবার বুঝতে পাচ্ছো বড়মিয়া—কেন যাচ্ছিলাম, কোথায় যাচ্ছিলাম হন্ত-দন্ত হয়ে? যাক্ থানায় যাবার আগেই বামাল সমেত চোর গ্রেফতার। ব্যাটার মাথায় কাঠের সিন্দুক দেখেই ধরেছি। খোল তো বড়মিয়া—সিন্দুকটা! বললেন মিত্রমশাই।

সিন্দুক খুলতেই দেখা গেল তার ভেতরে দামী দামী বেনারসী শাড়ী, শাল পাঁচ সাত খানা, গয়না, রূপোর একটা গড়গড়া, আর নগদ প্রায় হাজার-বারোশো টাকা।

গত রাত্রে কালো-লুঙ্গীধারী মিত্রমশাইয়ের বাড়ী সিঁদ দিয়ে এগুলি সংগ্রহ করেছে।

কোমরে গামছা বেঁধে তারই মাথায় সিন্দুকটি চাপিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়া হলো থানায়।

প্রথমে লুঙ্গীধারী কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না যে সে-ই চুরি করেছে। সে বললে, জোর করে আমার মাথায় এই সিন্দুক চাপিয়ে ধরে আনা হ'য়েছে!

ঘণ্টাখানেক পরে লোকটা বললে, ধরাই যখন পড়েছি তখন আর ঝুটমুট ঝামেলা বাড়িয়ে কি লাভ? হ্যাঁ হুজুর, চুরি আমি করেছি।

দিন কয়েক আগে সে কাচের গেলাস ফিরি করতে এসে মিত্র-মশাইর বাড়ীর সুযোগ সন্ধান সব জেনে গেসলো। গতরাত্রে সিঁদ কেটে সে ভেতরে ঢোকে। কর্তা, গিন্নীর ঘুমের ঘোরে প্রচণ্ড নাসিকা গর্জনে তার কাজের সুবিধাই হ'য়েছিল। আলমারীতে ছিল শাড়ী আর শাল। বড় ক্যাস বাকসোটা অল্প চেষ্টাতেই খুলে যায়। তার ভেতর ছিল গহনা আর নগদ টাকা।

হঠাৎ কর্তা আড়মোড়া ভাঙলেন। বন্ধ হ'য়ে গেল নাসিকাগর্জন। চোরটা ভয় পেয়ে গেল। কিছু না নিয়ে পালিয়ে আসবে কিনা ভাবছে—হঠাৎ আবার শোনা গেল তার নাসিকাগর্জন। যাক্— আবার ঘুমিয়ে পড়লো।

কিন্তু ভয় তাব কিছুতেই কাটে না। শেষকালে পায়খানা করতে তবে তার ভয় কাটলো। সে তখন একে একে সব জিনিষগুলি বাইরে নিয়ে এলো।

পাশেই বৈঠকখানায় পড়ে ছিল এই কাঠেব সিন্দুকটা। লোকের সন্দেহের হাত এড়াবার জন্য আব নিয়ে যাওয়ার সুবিধার জন্য কাঠের সিন্দুকের ভেতব চোরাই মাল সব পুবে রওনা হলো খেয়াঘাটে। পারের কড়ির কথা তার মনেই ছিল না। মাত্র দুটো পয়সার জন্য তাকে এ যাত্রা ধরা পড়তে হলো। যত গণ্ডগোল বাধালে পার ঘাটেব ঐ মাঝি!

কোন এক পল্লীগ্রামে বনেদী বংশ হিসাবে ঘোষেদের নাম আছে। এককালে এঁরা ছিলেন গাঁয়ের জমিদার। তালপুকুরের নাম আছে কিন্তু আজকাল আর তাতে ঘটি ডোবে না। বর্তমান ঘোষ-মশাইয়ের ছেলেমেয়ের সংখ্যা এগারটি। ছেলে পাঁচটি পাঁচ অবতার। একজন বাদে কেউ চাকরী বাকরীর ধার ধারে না। পাঁচটি মেয়ে পার করতেই ঘোষমশাইয়ের প্রায় নাভিশ্বাস ওঠার অবস্থা। বিয়ে দিতে বাকী একটির—ছোটটির, তা তিনি

এখন 'বুড়ি' পর্য্যায়ভুক্তা অর্থাৎ কিনা কুড়ি পেরিয়েছেন। দেখতে শুনতে মোটামুটি মন্দ নয় তবে টাইফয়েড হবার পর থেকে কানে একটু কম শুনছে। সন্ধ্যার সময় জন্মেছিল বলে মেয়েটির নাম সন্ধ্যাতারা।

কন্যাদায়ের ভাবনাটা তার বাবার চেয়ে ঠাকুরমারই বেশী। সবার ছোট বলেই হোক আর যে কোন কারণেই হোক—আদরের নাতনীর জন্য তাঁর চিন্তার আর অন্ত নেই। চেনা হোক আর অচেনা হোক—সবাইকেই অনুরোধ করেন তাঁর নাতনীর একটি সৎপাত্র দেখে দেবার জন্য।

সেবার গঙ্গা স্নান করতে গিয়ে গঙ্গার ঘাটে একটি আধাবয়সী মেয়েছেলের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয় এ কথা সে কথার পর তিনি তার কাছে পেড়ে বসলেন—নাতনীর বিয়ের কথা। বর্ষীয়সী মহিলা তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন যে তিনি একজন ঘটকী—বিয়ের ঘটকালী করাই তাঁর কাজ।

পাত্রী দেখাবার জন্য সন্ধ্যাতারার ঠাকুরমা ঘটকীকে সঙ্গে করে তাদের বাড়ীতে নিয়ে এলেন। সেদিন বাড়ী ফিরতে রাত হ'য়ে গেল। পরম যত্নে খাইয়ে-দাইয়ে ঘটকীকে তিনি নিজের ঘরেই শুতে দিলেন।

পরের দিন সন্ধ্যাতারাকে গয়নাগাটি পরিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে ঘটকীকে দেখালে তাঁর ঠাকুরমা। মেয়ে দেখে ঘটকীর খুবই পছন্দ হলো।

—তা—হ্যাঁ মা! নাতনীর গয়নাগুলি এমন সেকেলে প্যাটার্নের করালে কেন? আজকাল তো এ রকম ভারি-ভুরি বেপে ধরণের—

ঘটকীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ঠাকুরমা বললেন, ওসব গয়না তো আমার। তাই অমন সেকেলে-সেকেলে লাগছে। বিয়ের ঠিক হলেই আজকালকার ফ্যাসান মত ওগুলো ভেঙে নতুন করে গড়িয়ে দেবো। নগদ বাছা বিশেষ কিছু দিতে-থুতে আমরা পারবো না। তবে ছেলেটি একটু শিক্ষিত হওয়া চাই।

—একটি কি বলছেন—মা ঠাকরুণ, আমার হাতে অমন কত গণ্ডা পাত্তোর আছে। তা—আপনাদের গোত্তোর, মেয়ের কি গণ, কে কে আছে, মেয়ের মামার বাড়ীর ঠিকানা, নাম—সব কিছু একটা কাগজে লিখে দিন। এই লেখাটা নিয়ে আমাকে তো দেখাতে হবে পাত্তোরের বাপ মা কে। বললে ঘটকী।

খাওয়া-দাওয়া সেরে দু'টি টাকা ট্রেণ ভাড়া নিয়ে বৈকালের গাড়ীতে ঘটকী ফিরে গেল—শীগগীর খবর দেবে বলে।

এক সপ্তাহ কেটে গেল। কোন খবর নেই।

ঘটকীর কিন্তু কথার ঠিক আছে। দশাদনের দিন বৈকালে এসে হাজির। বললেন, দুটি পাত্তোর ঠিক করেছি—একটি বোস আর একটি মিত্তির। দু-ই কুলীন। 'বোস' হলো এক মায়ের এক ছেলে আর 'মিত্তির' হলো দু'ভাই এক বোন। বোনের বিয়ে হ'য়ে গেছে বাগবাজারের ঘোষেদের বাড়ী। দু'টি পাত্তোরই চাকরে—মোটা টাকা মাইনে, বড় বংশ।

—তাহলে তারা মেয়ে দেখবে কবে? যাতে এই জ্যৈষ্ঠতে—

লোকে কথায় বলে—লাখ কথা নইলে বিয়ে হয় না! তাড়া-হুড়ো করে কি কাজ হয় মা-ঠাকরুণ! তারপর—বিয়ে বলে কথা। চিন্তার কিছু নেই, কথা যখন আপনাকে আমি গঙ্গার ঘাটে বসে দিয়েছি—

—চার হাত এক না হলে আমি আর নিশ্চিন্ত হতে পাচ্ছি কই! শরীরের যা অবস্থা—কবে আছি কবে নেই! তাই তোমায় ব্যস্ত করছি বাছা! বললেন ঠাকুরমা।

—আজ রাতের ট্রেণেই আমায় ফিরে যেতে হবে। আগামীকাল আমার ঘটকালীতে একটা বিয়ে আছে। আজ আমি নিতে এসেছি মেয়ের কুষ্টিটা।

—আজ বাছা কষ্ট করে এসেছো, থেকে যাও আজকের রাতটা। যেয়ো কাল ভোরের ট্রেণে। বললেন ঠাকুরমা।

ঠাকুরমার ঘরেই শোবার ব্যবস্থা হলো ঘটকীর। খাওয়া-দাওয়ার পর রাত্রে শুতে গিয়ে ঘটকী বললে, সোনা কত ভরি দেবেন—সেটাও তারা জানতে চেয়েছে।

—সেকালের পুরাতন ডালা-ভাঙা কাঠের আলমারি থেকে ক্যাস বাকসোটি বার করে ঠাকুরমা বললেন, তা বাছা—প্রায় বিশ ভরি হবে। পুত্ পুত্ করে রেখেছি—এই ছাখো না কত ভরি হবে।

গহনাগুলি হাত দিয়ে নেড়ে চেড়ে ঘটকী বললে, হ্যাঁ—বিশ ভরি তো বটেই বরং বেশী তো কম নয়!

বাকসো চাবি বন্ধ করে যথাস্থানে রেখে দিলেন ঠাকুরমা। গভীর রাত্রে আলমাবির ডালা খোলার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ঠাকুরমার।

—কে!

দবজাব ধাবে সবে আসতে আসতে ঘটকী বললে, অন্ধকারে দরজা খুঁজে পাচ্ছি না মা। আমি একটু বাইবে যাবো।

ঠাকুরমা উঠে দবজা খুলে দিলেন

পবদিন ভোবে ঘটকী মেয়েব কুষ্ঠি আব ত্রটি টাকা গাড়ী ভাড়া নিয়ে চলে গেল।

তিন দিনেব দিন সন্ধ্যাব সময় ঘটকী এসে হাজির। বোসেদের ঐ একলা মায়ের এক ছেলেব সঙ্গেই সন্ধ্যাতারাব কুষ্ঠির মিল হ'য়েছে। ঘটকী তাদের ধবে-করে এই জ্যৈষ্ঠতেই বিয়েটা সেরে দেবে. কবে মেয়ে দেখান হবে—সেই দিনস্থির করতেই এসেছে ঘটকী। মেয়ে পছন্দ হলে ঐ দিনই তারা কথা পাকাপাকি করে যাবে পাত্র নিজেই আসবে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে পাত্রের তো বাপ নেই—কাজেই সে-ই হলো সর্বময় কর্তা।

সঙ্গে সঙ্গে পাঁজি দেখে দিন স্থির হ'য়ে গেল—আগামী সপ্তাহে বুধবার অপরাহ্ণ।

আনন্দের আতিশয্যে বুড়ীর সে রাত্রে প্রায় ঘুমই হলো না। ভোরবেলা পাইখানা যাওয়া বুড়ীর অভ্যাস। সেদিন আরো ভোরে

উঠে পড়লো সন্ধ্যার ঠাকুরমা। ঘটকী চোখ পিট পিট্ করে দেখে নাক ডাকাতে সুরু করলে।

—ও বাছা! তুমি যে ভোরের ট্রেণে যাবে।

ঘটকীর নাসিকা গর্জন বাড়লো বই কমলো না।

ফিরে এসে সন্ধ্যাতারার ঠাকুরমা দেখলে—সেই একই ভাবে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে ঘটকী।

—ওগো ও বাছা! তোমার যে ট্রেণের সময় হ'য়ে গেল!

ধড় মড় করে উঠে বসলো ঘটকী। বললে, ওমা—তাইতো! এত বেলা হ'য়ে গেছে। আমাকে একটু ভোর ভোর ডাকলে পারতেন মা-ঠাকরুণ।

—ডেকেছিলুম বাছা! তুমি তখন অঘোরে ঘুমুচ্ছো। তা—দুপুরে খেয়ে দেয়েই নয় যাবে খন!

—তা হয় না। আজ দুপুরেই একটি মেয়ের পাকা দেখা—আমাকে যেমন করে হোক যেতেই হবে। আচ্ছা—আমি তাহলে চলি মা-ঠাকরুণ, দেখি পড়ি-কি-মরি হয়ে ট্রেণটা ধরতে পারি কি না। বলে তাঁর পুঁটুলিটি নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল ঘটকী।

আজ বুধবার।

বৈকাল হতে না হতেই সন্ধ্যাতারাকে তাড়া দিয়ে তার ঠাকুরমা, মা প্রস্তুত হ'তে বললেন। প্রসাধন শেষ করে গহনা পরতে এলো সন্ধ্যাতারা তার ঠাকুরমার ঘরে।

ঠাকুরমা কাঠের আলমারি খুলে কাঁসার বাকসোটি মেঝের ওপর নামিয়ে রেখে বসলেন। চাবি খুলে গহনা বার করতে গিয়ে দেখলেন—বাকসো শূন্য। নিজের চোখকে ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না। বাকসোটা সন্ধ্যাতারার দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, কই—গহনাগুলো তো—

বলতে বলতে সন্ধ্যাতারার ঠাকুরমা অজ্ঞান হ'য়ে গেলেন। জ্ঞান

তাঁর আর ফিরে এলো না। ভোর রাত্রে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

বলা বাহুল্য—বুধবার অপরাহ্নে কেউ আসেনি সন্ধ্যাতারাকে দেখতে না ঘটকী আর না বোসেদের একলা মায়ের এক ছেলে !

সেই আদিম একক মানুষের বংশধররূপে প্রতিটি মানুষ জন্মগ্রহণ করে সুপ্ত বা জাগ্রত অপ-স্পৃহা নিয়ে। জন্মগত সংস্কার, শিক্ষা, সমাজ-ভয়, রাষ্ট্রবিধি ও ধর্ম ভয়ে সাধারণ মানুষের সুপ্ত অপ-স্পৃহা সুপ্তই থেকে যায়—জাগ্রত হবার সুযোগ-সুবিধার অভাবে।

কিন্তু এমন অনেক মানুষ আছে যারা জন্মগ্রহণ করে জাগ্রত অপ-স্পৃহা নিয়ে। এরা হচ্ছে জন্ম অপরাধী বা স্বভাব অপরাধী। অবশ্য অনেক বিশেষজ্ঞের মতে—জন্ম অপরাধী হয়ে কেউ জন্মায় না। কুৎসিৎ পরিবেশ, অসৎ সঙ্গ, শিক্ষা দীক্ষার অভাবই মানুষকে করে তোলে অপরাধী। প্রকৃত অপরাধীরা সমাজ, রাষ্ট্র বা ধর্মের ধার ধারে না। অপরাধকে এরা অপরাধ বলে মনে করে না এদের স্বভাব, চরিত্র, মনোভাব কতকটা সেই আদিম যুগের মানুষেরই মত। নিজের ভোগের জন্য যে কোন অপরাধ করতে এরা কুণ্ঠিত হয় না। অপকার্য্য করতে না পারলে এদের মন অশান্তিতে ভরে ওঠে। জীব-জন্তুর মত দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার এরা আগে থেকেই আভাষ পেয়ে থাকে নিজের মনে। ঝড় জল আসবার আগে মাঠ থেকে দড়ি ছিঁড়ে গরু, মহিষকে তাদের আস্তানায় ফিরে আসতে দেখা গেছে। কুকুরকে রাস্তায় নিয়ে বেরুলে জল-ঝড়ের আভাষ পেয়েই তারা বাড়ী ফেরবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে।

স্বভাব অপরাধীদের চেনা যায় তাদের বিভিন্ন অঙ্গের উল্কি দেখে। এরা উল্কি ধারণ করে দেহের এমন কতকগুলি অঙ্গে যা থাকে সাধারণত অনাবৃত। প্রকাশ্য অঙ্গে উল্কি ধারণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে

নিজেদের জাহির করার গর্ব বা আত্মতৃপ্তি। এদের জীবনের উদ্দেশ্য নেশা ভাঙ করা, বেশ্যা উপভোগ, জুয়াখেলা, অর্থের জন্য চুরি, জুয়াচুরি, রাহাজানি, ডাকাতি আর প্রয়োজন হলে খুন করা আর ধরা পড়লে জেলে যাওয়া। চুরি, ডাকাতি, খুন জখম করাকে এরা মোটেই দোষনীয় কাজ বলে মনে করে না। মানুষের বেঁচে থাকবার জন্য যেমন বিভিন্ন পেশা আছে—তেমনি অপকার্য্যই হচ্ছে এদের একমাত্র পেশা। মুচি যেমন জুতো সেলাই করা অন্যায় মনে করে না—অভ্যাস অপরাধীর কাছেও তেমনি চুরি, ডাকাতি, খুন খারাপি করা অন্যায় নয়। এদের থাকবার আস্তানা হচ্ছে হয় বস্তি বাড়ীর বেশ্যালয় আর নয় চণ্ডুখানা। শেষ নয়া পয়সাটি পর্য্যন্ত খরচ না করে এরা চণ্ডুখানা বা বেশ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসে না। শেষ কপর্দক শন্য হ'য়ে এরা ঘোরে শিকারের সন্ধানে।

নিয়মতান্ত্রিকতা এদের কুষ্টিতে লেখা নেই। দৈহিক কষ্টকে এরা কষ্ট বলেই মনে করে না। সময় মত এরা স্নানও করে না—খায়ও না। পকেট শূন্য হলে এদের অবস্থা—"ভোজনং যত্রতত্র শয়নং বৃক্ষতলে বা ফুটপাথে!" এদের ভেতর জাত বিচার নেই। ধর্মা-ধর্মের ধার এরা ধারে না। চোরের ধর্ম চুরি—ডাকাতের ধর্ম ডাকাতি আর খুনীর ধর্ম খুন। প্রকৃত অপরাধীর কাছে একমাত্র অপরাধ হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকতা আর বলাৎকার।

অপকার্য্য করার জন্য স্বভাব অপরাধীরা অলস মনকে চাঙ্গা করে তোলে জুয়া খেলে, বেশ্যা বাড়ী গিয়ে মদ খেয়ে। নেশা করার পর এরা বের হয় অপকার্য্যের সন্ধানে। দৈহিক অসাড়তার জন্য এদের কর্মতৎপরতা কিন্তু বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। একাচারী আদিম মানুষের মত এরা থাকে। প্রয়োজন মত অল্পেই সন্তুষ্ট। ঠিক বোকা না হলেও বুদ্ধি এদের মোটা। তবে এমন এমন উৎকট প্রকৃত অপরাধী দেখা গেছে—যারা নিজের ডান হাত বাম হাত চিনতে ভুল করে। জন্তু জানোয়ারের মত এরা কোন ঔৎসুক্যের ধার ধারে না।

দৈহিক অসাড়তার জন্য প্রয়োজন বোধে এরা নিজেরাই নিজেদের দেহ তীক্ষ্ণ অস্ত্রের সাহায্যে ক্ষত বিক্ষত করে থাকে। এতে এরা কষ্ট বোধ বা দৈহিক যন্ত্রণা বোধ করে না। মার-ধোর প্রভৃতি দৈহিক যন্ত্রণায় এদের কষ্ট বোধ হওয়া দূরে থাক এরা আনন্দই পেয়ে থাকে। গরমে এদের কষ্ট বোধ হয় না, হলেও খুব কম। হয় শীতে। প্রকৃত অপরাধী সামান্য শীতও সহ্য করতে পারে না।

এরা মনে করে—আমাদের যেমন অপরাধ করার অধিকার আছে, পুলিশেরও তেমনি আমাদের ধরে জেলে পোরার অধিকার আছে জেলে গেলে প্রকৃত অপরাধীরা দুঃখিত বা অনুতপ্ত তো হয়-ই না বরং হয় আনন্দিত। এই মেয়াদের দিনগুলোকে এরা কর্ম-বিরতি বা ছুটির দিন বলেই গণ্য করে। জেলে বসে তৈরী করে আগামী দিনের কর্ম-সূচী। আর কি ভাবে তাদের পরিকল্পনাকে রূপায়িত করা হবে--চলে তারই জল্পনা-কল্পনা। জেল এদের বিদ্যাপীঠ বা বিশ্ববিদ্যালয়।

জেলে এসে অপরাধীরা শোধরানো দূরে থাক—হ'য়ে ওঠে দুর্দ্ধর্ষ অপরাধী এর কারণ—সঙ্গ-দোষ! এমন অনেক অপরাধী দেখা গেছে—যারা জেলের বাইরে থাকতে মোটেই ভালবাসে না। জেলে যাবার জন্য অপরাধ করে। বাইরের আবহাওয়া তাদের সহ্য হয় না বাইরের লোকের সঙ্গে মিশে তারা আনন্দ পায় না জেলই তাদের ঘর-বাড়ী, জেলেই আছে তাদের আপনজন—তাদের মনের মানুষ।

Havelock Ellis এর 'The criminal' এ উল্লেখিত আছে :—চোরেদের মাথা—সাধারণত ছোট, খুনেদের মাথা চোরেদের তুলনায় বড়।

অপরাধীদের চেহারা সাধারণত শ্রীহীন, কুৎসিৎ। সুন্দর চেহারার অপরাধী কদাচিৎ চোখে পড়ে।

অপরাধ-বিজ্ঞানবিদ্ প্রফেসর লমব্রসো-র (Prof. Lombroso)

মতে ঃ—সাধারণ লোকের তুলনায় জন্ম অপরাধীদেব কান তাদের মুখ ও মাথাব অনুপাতে বড়। চুল হয় ঘন। কিন্তু দাড়ি গোঁফ খুবই পাতলা—কতকটা মঙ্গোলিয়ান টাইপেব চেহাবা সাধারণের তুলনায় এদের ওজন হয় একটু বেশী।

Havelock Ellis-এব মতে ঃ—যৌনজ অপরাধীদের দাড়ি অপেক্ষাকৃত বেশীই হয়ে থাকে। এদেব মাথায় চুলও থাকে প্রচুব অনেক সময় চোখ দেখে ধরা যায়—লোকটা অপরাধী কিনা!

"I do not need to see the whole of a criminal face", said Vidocq, "to recognise him as such; it is enough for me to catch his eye".

স্বভাব অপবাধীনীদেব মুখে এবং দেহে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ছোট ছোট পাতলা চুল, তবে টাক এদেব মাথায় প্রায়ই পড়ে না।

Romman Sayings—"Salute from afar the beardless man and the bearded woman". "Trust not the woman with a man's voice."

স্বভাব অপরাধী মেয়েব সংখ্যা এদেশে পুরুষের তুলনায় অনেক কম। এরা সাধাবণতঃ পুরুষ ভাবাপন্না হয়ে থাকে। নামেই এবা মেয়েছেলে কিন্তু অপকার্য্যেব দিক থেকে অনেক সময় এবা পুরুষদের হাব মানিয়ে দেয় পুরুষেব তুলনায় এইসব স্বভাব অপরাধীনীরা হয় অতীব নিষ্ঠুব।

স্বভাব অপবাধীরা মনে করে—জেল তৈবী হয়েছে তাদেবই জন্য। এটাই তাদের ঘব-বাড়ী। এখানে বসবাস করাব অধিকাব তাদেব চির শাশ্বত। জেল কর্মচারীরা তাদের সেবাযেৎ। নিজেব বাড়ীতে সুখ-স্বচ্ছন্দে বসবাস কববার জন্য বাড়ীব কর্তা, ঝি-চাকব দ্বাবোয়ান, সরকাব, গোমস্তা বেখে থাকে। প্রকাবান্তরে অপবাধীরাই হচ্ছে জেলের মালিক। এই সব কর্মচারী আছে তাদেবই সুখ স্বচ্ছন্দ বিধানেব জন্য।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রচার বিভাগের তথ্যচিত্র "জেলেও মানুষ গড়ে" চিত্রের পরিচালকের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি :—"সুটিঙের ক'দিন আগে দমদম জেলটি পরিদর্শনে পাঠালেন তৎকালীন ইন্সপেক্টর জেনারেল অব প্রিজন ডাঃ বিশ্বাস।

"দমদম জেলের তখনসুপারিনটেণ্ডেট ছিলেন শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্তী বর্তমানে খ্যাতনামা সাহিত্যিক 'জরাসন্ধ'। জেলের কানুন অনুসারে ছত্রধারী বিরাট একটি ছাতা নিয়ে হাঁটছে আমাদের পিছনে—আমরা অর্থাৎ চারুবাবু আর আমি ঐ বিরাট ছত্রতলে থেকে এগিয়ে চলছি জেল পরিদর্শনে। চলতে চলতে চারুবাবু আমাকে জেল-সংক্রান্ত অনেক কিছু বুঝিয়ে বলছেন আমার প্রশ্ন অনুসারে। মাঝে মাঝে অন্য কথাও হচ্ছে সাহিত্যিক চারুবাবু অতি মিষ্টভাষী। বেশ গুছিয়ে হৃদয়গ্রাহী করে লেখার মত তিনি কথা বলতেও অদ্বিতীয়। জেল কর্তৃপক্ষ যে এমন অমায়িক হতে পারেন তা ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপের আগে আমার জানা ছিল না।

স্বাধীন ভারতে জেল-অভ্যন্তরের আবহাওয়া এবং আইন কানুন বদলে গেছে বৃটিশ আমলের সে নরকতুল্য পশুতৈরীর জেল আর নেই, এখন তার পরিপূর্ণ সংস্কার করা হয়েছে। 'জেল এখন মানুষ গড়ার' স্পর্দ্ধা রাখতে পারে। এ ছাড়া কয়েদীদের নানা রকম সুখ সুবিধা, শিক্ষা, খেলাধূলা, আমোদ-আহ্লাদ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করতে করতে আমরা জেল অভ্যন্তরস্থিত এ্যাভিন্যুর ভেতর দিয়ে চলেছি—এমন সময় একটি নবাগত কয়েদী ছুটে এসে আমাদের পথ রোধ করে সেলাম দিয়ে দাঁড়াল বেশ উত্তেজিত ভাবে। বললে, হোজুর! আপ হামকো পছান্তে হ্যায়! ম্যায় তো পুরানা আদমি হুঁ! উ বুদ্ধু সিপাই হামকো এক চড় লাগায় দিয়া! হামি এবার লিয়ে হোজুর—সাত বার জেলে এলো। এ্যায়সা বেয়াদফ সিপাই হাম কোবি নেহি দেখা।

সাহেব তখন সেপাইকে ডেকে মারতে বারণ করে দিলেন। কয়েদী তাচ্ছিল্যভরে সেপাইয়ের দিকে চেয়ে নিজের স্থানে ফিরে গেল।”

এরাই হচ্ছে প্রকৃত অপরাধী। লজ্জা, সঙ্কোচ, ভয় এদের নেই। জেলে আসতে এদের সম্ভ্রম হানি হয় না, সম্ভ্রম নষ্ট হয় সেপাইয়ের চপেটাঘাতে। অন্য সময় হলে এরকম চড় চাপর হয়তো সে হজম করে নিতে পারতো কিন্তু ছিঁচকে চোরেদের সামনে এধরণের অপমান বরদাস্ত করা তার সহ্যাতীত। জেল সুপারিনটেণ্ডেন্টের কাছে এসে নিজেকে জাহির করার ভিতর পরিস্ফুট হ'য়ে উঠলো তার দাম্ভিকতা। এ একটি স্বভাব অপরাধী।

স্মাগলিঙ্ কথাটার প্রচলন ছিল কিন্তু কাজটার প্রচলনে প্রাচুর্য ছিল না। স্মাগলিঙ্ পুরোমাত্রায় প্রচণ্ড ভাবে চালু হলো এদেশে গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর। ব্ল্যাক মার্কেট সম্বন্ধে আমরা যতটা অজ্ঞ ছিলাম—তার চেয়েও বেশী অজ্ঞ ছিলাম স্মাগলিঙ্ সম্পর্কে।

অবশ্য নেশার জিনিষ নিয়ে স্মাগলিঙ্ অনেক দিন ধরেই লোক-চক্ষুর অন্তরালে চলে আসছে।

সকরিগলি ঘাট। ট্রেণ দাঁড়িয়ে আছে শিয়ালদহ আসার প্রতীক্ষায়। রাত প্রায় ন'টা। লালবাহাদুর খেয়া পারাপারের জাহাজ থেকে নেমে নিজের ফুলোফাঁপা হোল্ড-অলটি কাঁধে তুলে নিলে। প্রায় আধ-মাইল বালি ভরা নদীর তীর পায়ে দলে গাড়ীতে এসে উঠলো। সাত তাড়াতাড়ি ওপরের একটা বাঙ্কে পেতে ফেললে তার বেডিং। তার চেহারা আর পোষাক-আষাকের চেয়ে বেডিং আর হোল্ড-অলের আভিজাত্যটাই লোকের চোখে পড়ে।

লোকে ভাবলে—বাহাদুর তার বাবুর জন্য পরিপাটি করে

বিছানাটা পেতে দিলে। কিন্তু ট্রেণ ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সে বাদুড় ঝোলা হয়ে বাঙ্কে উঠে সটান শুয়ে পড়ে বিড়ি ফুঁকতে লাগলো। হোল্ড-অলের মাথাব দিকে বালিস—পায়ের দিকে বালিস— এছাড়া দেখা গেল একটা মাঝারি গোছের পাশ বালিস। লোকটা শুধু বিছানা বিলাসী নয়—বালিস বিলাসীও। যারা গাড়ীতে শোবার স্থান সংগ্রহ করতে পেরেছে—তারা শুয়ে ঘুমুচ্ছে। অনেকে ঠেসান দিয়ে বসে বসে ঝিমুচ্ছে। ঠেসান দেবার সুযোগ-সুবিধা যাদের হয়নি তারা বসে বসে ঢুলছে—ঢুলে পড়ছে এ ওর গায়ে। বাহাদুরের চোখে কিন্তু ঘুম নেই। সারারাত সে শুধু একটার পর একটা বিড়ি টেনেই চলেছে। তিন-পাহাড়ে চেকার উঠলো। যাত্রীদের জাগিয়ে টিকিট চেক করলে, কার সঙ্গে কি মালপত্র আছে তার খোঁজ খবর নিয়ে পরের কামরায় গিয়ে উঠলো। চেকার চলে যেতে আবার যথাপূর্বং তথা পরম। যারা ঢুলছিল তারা ঢুলতে লাগলো—যারা ঘুমুচ্ছিল তারা ঘুমুতে চেষ্টা করলে। বাহাদুর বাথরুম থেকে এসে নতুন করে বিড়ি ধরালে।

স্থানাভাবে দু'টি লোক মেঝের ওপর কখন যে শুয়ে পড়েছে কে জানে। আপাদমস্তক তাদের একটা ময়লা চাদরে ঢাকা। হঠাৎ মাল-পত্র বলেই মনে হয়।

শেষ রাতে দেখা গেল—একটা লোক কোন ফাঁকে উধাও ওদিকে বাঙ্কের ওপর বাহাদুরও ঘুমিয়ে পড়েছে। গভীর ঘুম—নাক ডাকছে।

ভোর তখনও হয়নি—আপাদমস্তক চাদর ঢাকা দেওয়া লোকটি উঠে বসলো। একটা বিড়ি ধরিয়ে দরজার ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

আচমকা ঘুম ভেঙ্গে গেল বাহাদুরের। পরের ষ্টেশনই শিয়ালদ। সে ব্যস্ত হ'য়ে বিছানা বাঁধতে সুরু করলে। নাঃ ষ্টেশন আসতে এখনো দেরি আছে। বিড়ি ধরিয়ে বাহাদুর বাথরুমে ঢুকলো। দরজার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি নিঃশব্দে বাইরে থেকে

ছিটকানিটা টেনে দিলে। অল্পক্ষণ পরেই ভিতর থেকে সুরু হলো দরজা খোলার ধস্তাধস্তি।

যাত্রীরা প্রতিবাদ জানালো। মারমুখী হ'য়ে উঠলো লোকটির ওপর।

—আমার কাজে বাধা দিতে চেষ্টা করবেন না। বিপদে পড়ে যাবেন।

লোকটির গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বরে ভড়কে গেল যাত্রীরা। কণ্ঠস্বরে বোঝা গেল—লোকটি নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুস্থানী নয়, খাঁটি বাঙালী। পোষাকটা হচ্ছে ভেক্ অর্থাৎ ছদ্মবেশ।

তলিয়ে ব্যাপারটা বোঝবার আগেই ট্রেণটা ষ্টেশনের ভিতর মন্থর গতিতে ঢুকে পড়লো। জন চারেক কনেষ্টবল এক রকম লাফ দিয়েই কামরার হ্যাণ্ডেল ধরে টপাটপ ভেতরে ঢুকে পড়লো। অন্য দরজা দিয়ে সাদা পোষাকে উঠলো আরো জন পাঁচেক।

বিপদে পড়ার ভয়ে যাত্রীরা যে যার তল্পি-তল্পা নিয়ে হুড়মুড় করে এ ওকে ধাককা দিতে দিতে প্লাটফরমে নেমে পড়লো।

রেল পুলিশের থানা।

থানার বড় অফিসারের ঘরে হাজির করা হলো বাহাদুরকে। বাহাদুরের তখন হাতে হাত কড়ি আর কোমরে দড়ি। হোল্ড-অলটি খুলে ফেলা হলো। তোষক, মাথার বালিস, পাশ বালিস—উঃ কি ভারি! তুলোর বালিস, তোষক কি এত ভারি হয়? নরম মোটেই নয়—ভেতরটা কেমন যেন খসখসে। তুলোর বদলে নারকেল ছোবড়া ভরা নাকি! ছিঁড়ে ফেলা হলো একটা বালিসের মুখ। ব্যস্! বামাল হাতে-হাতে ধরা পড়ে গেল। নারকেলের ফেঁসো নয়—শুকনো গাঁজা ভর্তি প্রতিটি বালিস আর পুরু তোষকখানি।

অনুসন্ধানে জানা গেল—হাসিমারা আর রাজা-ভাত-খাওয়ার

জঙ্গলে আপনা হতে জন্মায় প্রচুর বুনো গাঁজা। সেই গাঁজা নিঃখরচায় সংগ্রহ করা হয় বন ঢুঁড়ে। কাঁচা গাঁজা শুকিয়ে নিয়ে ভর্তি করা হয় বালিসের খোলে আর তোষকে।

কলকাতার কোন এক সুবিখ্যাত তেল কলের দ্বারোয়ান হচ্ছে ঐ বাহাদুরের আপন চাচাতো ভাই। বাহাদুর 'মাল' এনে জোগান দেয় আর তার চাচাতো ভাই কলকাতার বুকের ওপর বসে 'গুপ্ত সুড়ঙ্গ পথে' কিছু সস্তাদরে 'মাল' সাপ্লাই করে বেশ টু-পাইস কামিয়ে নেয়। প্রমাণ অভাবে এ যাত্রা চাচাতো ভাই রেহাই পেলে কিন্তু বাহাদুরের হলো শ্রীঘর বাস বেশ কিছু দিনের জন্যে।

বে-আইনী ভাবে নেশার খোরাক জোগান দিয়ে সংসার চালায় —এমন লোকও বিরল নয়।

বিবেকানন্দ রোড আর কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের জংশন। ট্রাফিক পুলিশ হাত দেখিয়েছে পথ-আইন অমান্য করে এক সাইকেল আরোহী সুটধারী ছুটে বেরিয়ে গেল পুলিশের সামনে দিয়ে। হাঁ-হাঁ করে উঠলো ট্রাফিক পুলিশ। সুটধারীর সাইকেল সজোরে মারলে ধাক্কা এক পাঞ্জাবীধারী সাইকেল আরোহীকে ইচ্ছে করে পাঞ্জাবীধারী সামলাতে না পেরে সাইকেল সমেত ডিগবাজী খেয়ে পড়ে গেল রাস্তার ওপর। পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে সাইকেল ফেলে মারলে চোঁ-চা দৌড় সুটধারীও সাইকেল ফেলে ছুটতে ছুটতে গিয়ে পিছন থেকে চেপে ধরলে তার জামার কলার। সুরু হলো ধস্তাধস্তি।

রাস্তার লোক তো অবাক। বে-আইনী ভাবে যে ধাক্কা মারলে সে-ই গিয়ে চড়াও হলো নির্দোষ লোকটির ওপর! ধাক্কা যে খেলে —সে-ই বা সাইকেল ফেলে চম্পট দেবার চেষ্টা করলে কেন?

আজব শহর এই কলকাতা!

ওদিকে ধস্তাধস্তির ধকল সহ্য করতে না পেরে পাঞ্জাবীধারীর

পাঞ্জাবীটা দু'ফাল হ'য়ে ছিঁড়ে গেল। দেখা গেল—সাপের মত একটা লম্বা রবারের টিউব (সাইকেল টিউবের মত) তার সারা গায়ে জড়ান।

ট্রাফিক পুলিশের সাহায্যে স্যুটধারী ভদ্রলোক থানায় ধরে নিয়ে গেলেন ঐ টিউব জড়ানো স্মাগলারটিকে

বে-আইনী ভাবে চোলাই মদ টিউবের ভেতর নিয়ে চালান করাই হচ্ছে একদল লোকের পেশা।

কিন্তু আইনকে ফাঁকি দেওয়া কি এতই সহজ!

কলকাতা অভিমুখে ছুটে আসছে এক্সপ্রেস ট্রেণ রাতের আঁধার ভেদ করে কোলে তার শ-শ ঘুমন্ত মানুষ স্থানাভাবে কেউ কেউ বসে বসে ঢুলছে আবার কেউ বা দাঁড়িয়ে ইচ্ছে করে যে জেগে নেই কেউ—এমন কথাও বলা যায় না। সব কিছুই নির্ভর করে উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়ের ওপর।

রাত প্রায় দুপুরের কাছাকাছি

চলন্ত ট্রেণের দরজা ঠেলে তৃতীয় শ্রেণীতে ঢুকলেন টিকিট চেকার। প্রতিটি যাত্রীর টিকিট চেক করে তাদের মাল-পত্তর পরীক্ষা করতে সুরু করলেন।

এলো সোনামণির পালা। সোনা বেঞ্চির একধারে গুটিসুটি মেরে বসেছিল। টিকিট চেকার আসতেই সে একটু সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠলো।

—টিকেট।

—দিচ্ছি বাবু। বলে বাঙ্কের ওপর রাখা একটা টিনের স্যুটকেশ ধরে টান দিলে। স্যুটকেশের ওপর চেপে বসেছে ভারি মালের বস্তা। মেয়েছেলের পক্ষে টান দিয়ে স্যুটকেশটা বার করা কষ্টকর। চেকার সাহেব দয়া পরবশ হয়েই হাত লাগালেন।

টিনের ছোট্ট স্যুটকেশটা সোনার হাতে দিতে দিতে চেকার সাহেব বললেন, এত ভারি—এতটুকু স্যুটকেশ! কি আছে এতে?

আঁচলে বাঁধা চাবি দিয়ে সুটকেশটা আড়াল করে খুলতে খুলতে সোনা শুকনো গলায় বললে, আ-আ-আমসত্ব!

সুটকেশের ভেতর থেকে খপ করে একখানা টিকিট বার করে চেকারের হাতে দিয়ে সোনা তাড়াতাড়ি চাবি বন্ধ করলে।

টিকিটের গায়ে লেগে আছে ময়দার গুঁড়ো। গন্ধটাও বেশ উৎকট আর সন্দেহজনক

—দেখি কেমন আমসত্ব! খোল তো সুটকেশ!

—আমসত্বর আবার কি দেখবেন! সোনা দেখাতে নারাজ।

সন্দেহ ঘনীভূত হ'য়ে ওঠে।

সোনাও সুটকেশ খুলে দেখাবে না আর টিকিট চেকারও ছাড়বেন না।

নাছোড়বান্দা চেকারের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য সোনা চলন্ত গাড়ীর জানলা গলিয়ে সুটকেশটা আচমকা বাইরে ফেলে দিলে।

সঙ্গে সঙ্গে চেন টানলেন চেকার সাহেব

গাড়ীর গতি মন্দ হতে মন্দতর হ'য়ে এলো ট্রেণের কামরায় তখন প্রায় সকলেই জেগে উঠেছে

ট্রেণ থামাবার আগেই সোনা লাফ দিয়ে ট্রেণ থেকে নেমে পালাতে যাবে—চেকার তার হাত সজোরে চেপে ধরলেন।

ট্রেণ থামার সঙ্গে সঙ্গে গার্ড সাহেব নেমে এলেন। সারা ট্রেণে পড়লো একটা চাঞ্চল্য।

সুটকেশ খুঁজে পেতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগলো।

সুটকেশের ভেতর থেকে বেরুলো আমসত্বর বদলে ময়দা ঢাকা দেওয়া এক তাল আফিম

বামাল সমেত হাতে হাতে ধরা পড়লো সোনামণি!

—তৃতীয় শ্রেণীতে একজন মেয়ে ছেলে আফিম সমেত ধরা পড়েছে শুনে আমি তো ভয়ে ঘামতে সুরু করলাম। বললেন মিসেস রায়।

—তারপর ?

—নাম না জানতে পারলেও অনুমানে বুঝলাম যে মেয়েটি আমাদের সোনামণি ছাড়া আর কেউ নয়। তাইতো! হাজার বারণ করা সত্বেও সোনা কি আমার নাম বলে দেবে! বলা যায় না ধমকের ঠেলায় ঘাবড়ে গিয়ে আমাকে এসে দেখিয়ে দিতেও তো পারে! না, পরের ষ্টেশনে আমি নেমেই পড়বো। কেউ যদি তারপর জিজ্ঞেস করে ষ্টেশনে যে শিয়ালদর টিকিট কেটে একা মেয়ে ছেলে এই গভীর রাতে—নাঃ সন্দেহ জাগতে পারে লোকের মনে। কি যে করি—ভেবে উঠতে পাচ্ছি না।

পরের ষ্টেশনে ট্রেণ এসে থামতেই একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। আফিম স্মাগলার মেয়েটিকে ট্রেণ থেকে নামিয়ে নেওয়া হচ্ছে। কামরার দু' পাঁচজন কৌতূহলী যাত্রীর সঙ্গে আমিও নেমে পড়লাম দুরু দুরু বুকে।

দেখলাম—অনুমান আমার মিথ্যা নয়, ধরা যে পড়েছে—সে অন্য কেউ নয়, আমাদের পরিচারিকা সোনামণি।

ট্রেণ ছাড়বার আগেই উঠে এলাম। ট্রেণ ছাড়লো। আমার খোঁজে কেউ এলো না। ফার্ষ্ট ক্লাসের যাত্রী আমি। বার্থ রিজারভেশন করে চলেছি গহনা, পোষাক-আষাক আর ভারিক্কে সুন্দর চেহারা—কোন দিক দিয়েই প্রথম শ্রেণীর যাত্রী হিসাবে বেমানান নই।

চাদরটা গলা পর্য্যন্ত টেনে দিয়ে শুয়ে পড়লাম কিন্তু ঘুম এলো না।

সকাল আটটা।

নিজের সিটে বসে ব্রেক-ফাষ্ট খাচ্ছি। চেকার উঠলো কামরায়। টিকিট চেক্ করে করে কি মাল তা অনুসন্ধান করলে। সিটের তলায় রাখা একটা মুখ সিলকরা নতুন কেরোসিন টিনের মালিক কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেল না। প্রত্যেকে অস্বীকার করলে যে

টিন তার নয়। ঐ টিনটির সিলকরা মুখের চার দিকে লেগে আছে গাওয়া ঘি। আমাকে জিজ্ঞেস করা সত্বেও বলতে পারলাম না যে টিনটি আমার।

পরের ষ্টেশনে টিনটা নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। ঘাম দিয়ে যাকে বলে জ্বর ছাড়লো। কতকটা নিশ্চিন্ত হলাম। টিনের ভেতর ঘি আছে সত্যি কিন্তু ঘিয়ের ভেতর আত্মগোপন করে আছে বিরাট এক তাল আফিম

এখন সোনামণি আমায় ধরিয়ে দিলেও প্রমাণ করা শক্ত যে ঐ নামিয়ে নিয়ে যাওয়া টিনটির মালিক আমি

শিয়ালদ ষ্টেশনে ট্রেণ এসে থামলো আমার স্যুটকেশ, বেডিং আর টিফিন কেরিয়ার কুলির মাথায় চাপিয়ে ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে ট্যাকসি ধরলাম

এতক্ষণ নিজের কথাই ভেবেছি ট্যাকসিতে উঠে এই প্রথম মনে পড়লো আমার মালিকের কথা ব্যাচারা একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসবে, তার বহু টাকায় ঘা পড়লো। মালিক চৌপট্‌ওলা আসছেন পরের ট্রেণে

পরের দিন সকালে চৌপট্‌ওলার বাসায় গেলাম দেখা করতে সব কথা শুনে বিন্দুমাত্র দুঃখিত হলেন না ভদ্রলোক। বেশ দীপ্ত কণ্ঠেই বললেন, ই সোব নোবাবী কাজ-কারবার। ইতে লাফা ভি যেমন জায়দা আছে—লোকসানভিও জায়দা আছে। যা-নে দিজিয়ে। সোনামণির কোথা বলছেন? ওর গা সাওয়া আছে একটা বাত্‌ মু সে বার কোরবে না—জেইল খেটে ফিরে আসবে হামার কাছে। আপনাব এটা ফার্ষ্ট চান্স হইল। সাহস হইয়েছে তো? পান-সাত্‌ রোজ রেষ্ট লিয়ে লিন। ফিন যেতে হবে।

—আমার পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে নিয়ে বাসায় ফিরে এলাম। পাঁচ সাত দিন পরে আমি না গেলে চৌপট্‌ওলা নিশ্চয় নিজে এসে হাজির হবে আমার বাসায়। এক পা জেলে আর এক পা ঘরে দিয়ে

রাতারাতি বড়লোক হওয়া আমার মাথায় থাক—দিন দুয়ের ভেতর বাসা বদল করে চলে গেলাম কলকাতার আর এক প্রান্তে।

কিছুদিন পরে খবরের কাগজে দেখলাম—সোনামণি দশমাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে।

আমি আবার আমার পূর্বের পেশা মিড্‌ওয়াইফারিতে আত্মনিয়োগ করলাম। আমার এই কাজে পয়সার প্রাচুর্য নেই বটে তবে শান্তি আছে প্রচুর। লোভের বশবর্তী হয়ে যে কাজ করেছি— মনে পড়লে আজও আত্মগ্লানি, অনুশোচনা আর অনুতাপে সারা অন্তর আমার রী রী করে ওঠে। এরই নাম বোধ হয়—পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

হাওড়া ষ্টেশন।

বম্বে মেল এসে থামলো। সারা প্লাটফর্ম লোকে লোকারণ্য। টিকিট কালেকটররা যে যাঁর গেটে দাঁড়িয়ে টিকেট সংগ্রহ করছেন—কুলির মাথায় মালপত্তোরের ওপর কড়া নজর রেখে। সন্দেহ হলে ওজন করিয়ে লাগেজের ভাড়াও আদায় করে নিচ্ছেন।

সামনের গেট দিয়ে সরাসরি না বেরিয়ে যেন ভিড় এড়াবার জন্য এক স্যুটধারী ভদ্রলোক পাশের গেটে টিকিট দিয়ে তাড়াতাড়ি পেরিয়ে গেলেন। পিছনে তাঁর তিনটি কুলির মাথায় তিনটি ছোট কাঁঠাল কাঠের সিন্দুক। তিনটি ছোট্ট কাঠের সিন্দুক—(দু' বগলে দুটো আর মাথায় একটা)—বইতে একটা কুলিই যথেষ্ট। অথচ একটা কুলিই বেশ হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে একটা বাকসো বইতে। কি এমন আছে সিন্দুকে যে এত ভারি !

প্রথম কুলিটা গেট পেরিয়ে গেছে। পিছনের কুলি দুটোকে দাঁড় করিয়ে চেকার ভদ্রলোক সামনে এগিয়ে যাওয়া কুলিটাকে ডাকলেন।

—বাবু ! এ বাবু ! কুলির চীৎকার শুনেও শুনলেন না কানে

—চোঁচা দৌড় মেরে ভিড়ের ভেতর মিশে গেলেন তাঁর সিন্দুক ফেলে।

সিন্দুক তিনটি খুলে ফেলা হলো G. R. P.-র অফিসে নিয়ে গিয়ে। প্রত্যেকটি সিন্দুক কাপড় জামায় ভর্তি। তাজ্জব ব্যাপার! খালি সিন্দুক তো এত ভারি হবার নয়।

বিশেষ অনুসন্ধানে দেখা গেল—প্রতিটি সিন্দুক দ্বিস্তবক। মাঝখানের তলার তক্তাখানি সরিয়ে ফেললে—চোখে পড়বে দ্বিতীয় স্তবক বা নীচের তলা।

প্রতিটি সিন্দুকের নীচের তলা সোনার বাটে ভর্তি।

বিশ্বস্ত, কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মচারিদের সজাগ শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে কত শত অভিনব উপায়ে স্মাগলাররা যে দেশ হ'তে দেশান্তরে মাল পাচার করছে তার আর ইয়ত্তা নেই। দুর্বৃত্তদের মস্তিষ্ক প্রসূত মাল পাচারের নিত্য নতুন অভিনব পন্থা কিন্তু বেশী দিন কার্যকরী হয় না। আইন ও শৃঙ্খলার বেড়াজালে ধরা পড়ে স্মাগলাররা, ফলে—পন্থা তাদের হয় ধূলিস্মাৎ।

পাঁসকুড়া লোকালটা ঠিক সন্ধ্যার সময়ই হাওড়ায় এসে পৌঁছায়। ট্রেণটার পিছন দিকের একটা কম্পার্টমেণ্টের যাত্রী প্রায় তিন ভাগই ফোড়ে অর্থাৎ পাইকার আনাজওলা, শাক-সব্জীওলা, ফুলওলা, পান, শাক, কুমড়ো, ঢেঁড়স, বাঙা আলু প্রভৃতি নানা তরিতরকারী আর ফুলের বস্তায় ওপরের বাঙ্ক আর সীটের নীচের জায়গা—অনেক সময় পা বাড়াবার স্থানটুকু পর্যন্ত না রেখে মেজেটাও বেপরোয়া ভাবে ওরা ভরিয়ে ফেলে—যেন কামরাটা ওদের রিজার্ভ করা। এটাই চলে আসছে মাসের পর মাস—বছরের পর বছর।

তখন যুদ্ধ চলছে। কলকাতা এবং হাওড়া হচ্ছে পুরোপুরি র‍্যাশানিং এরিয়া। চালের প্রবেশ ও প্রস্থান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে চাল ছাড়া যে কোন জিনিষ আনা-নেওয়া যেতে পারে।

যথা সময়ে ট্রেণ এসে থামলো হাওড়া ষ্টেশনে। পেছনের সেই রিজার্ভ-না করেও রিজার্ভ করা কামরা থেকে কাঁচা তরি-তরকারীর বস্তা নামানোর সঙ্গে সঙ্গে নেমে এলো বিশ থেকে বিয়াল্লিশ বছরের পাঁচ সাতটি সন্তান-সম্ভবা স্ত্রীলোক।

সব চেয়ে বয়েস যার বেশী তাকে জিজ্ঞেস করলেন জনৈকা ভদ্রমহিলা, তোমার পেট-কাপড়ের ভেতর কি আছে?

—কি আবার থাকবে। দেখে বুঝতে পাচ্ছো না কি আছে!

কিছু কম বয়সা সন্তান-সম্ভবা মন্তব্য করলে, মাগি যেন খ্যাকা।

সন্তান-সম্ভবাদের চলার গতি বেড়ে গেল।

—দাঁড়াও সবাই। গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললেন ভদ্রমহিলা।

দাঁড়ানোর বদলে তারা প্রায় ছুটতে সুরু করলে। হুইসিল দিয়েই ভদ্রমহিলা গিয়ে একজনকে ধরে ফেললেন। হুইসিলের সঙ্গে সঙ্গে এধার ওধার থেকে ছুটে এলো ইউনিফর্মধারী শান্তি রক্ষকের দল।

ভদ্রমহিলা যাকে ধরে ফেললেন—সে মেয়েটি ক্ষিপ্ত হ'য়ে চেপে ধরলে ভদ্রমহিলার চুলের খোঁপা। ধস্তাধস্তি সুরু হয়ে গেল। সন্তান-সম্ভবার কোলপেটের তলা থেকে খসে পড়ে গেল একটি ছোট কাপড়ের বস্তা।

প্রতিটি সন্তান-সম্ভবার ঐ একই অবস্থা। সবাই সন্তান-সম্ভবার ছদ্মবেশে পেট-কাপড়ের তলায় লুকিয়ে এনেছে এক এক পুঁটুলি চাল।

ভদ্রমহিলা যে একজন ছদ্মবেশী পুলিশ অফিসার তা ওদের জানা ছিল না। জানা থাকলে—আর যাই করুক—খোঁপায় তাঁর হাত দিতে সাহস করতো না। হুইসিল যে কেন তিনি বাজালেন—তাও তারা ধারণা করতে পারেনি।

আইনের চোখে ধুলো দিয়ে এইভাবে চাল চালান করা দণ্ডনীয়

অপরাধ। আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের রাষ্ট্র কোন দিন ক্ষমা করে না—করা উচিত নয়। আইন তৈরী হয় দেশের মঙ্গলের জন্য। আইন ভঙ্গ করার জন্য ছদ্মবেশী সন্তান-সন্তবাদের সাজা হ'য়ে গেল।

অপরাধী সমাজ।

এ সমাজের সমাজপতি হচ্ছে খুনী, ডাকাত। এরা হচ্ছে কুলীন। অন্যান্য অপরাধীদের কাছে এরা হচ্ছে নমস্য। নীচু পর্য্যায়ের অপরাধীরা (পিকপকেট, তালাতোড়, সিঁধেল, ছিঁচকে) এদের সম্মান করে, সমীহ করে। যে যত বড় খুনী, যে যত বড় ডাকাত—তার সম্মান তত বেশী। খুনী, ডাকাতরা ছোট-খাটো অপরাধীদের মানুষ বলেই গণ্য করে না।

গত যুগের ডাকাতদের সত্যিই শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখতো গরীবরা। কারণ ধনীর ধন অপহরণ করে তারা বিতরণ করতো দীন, দুঃখী, নিরন্নদের।

বর্তমানে জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত। বাঙলা দেশে বহু জমিদারের জমিদারী গড়ে উঠেছে ডাকাতি-লব্ধ অর্থে। হয় তারা নিজেরা ছিল ডাকাত আর নয় ছিল তারা ডাকাতদলের পৃষ্ঠপোষক। জমিদারী-চ্যুত জমিদারদের খুনে আজও মিশে আছে তাদের পূর্বপুরুষ ডাকাতদের তপ্ত খুন।

ডাকাতি যাদের পেশা খুন তারা পারতপক্ষে করে না। তবে বাধা পেলে বা কেউ তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির অন্তরায় হলে—খুন করতে বাধ্য হয় ডাকাতরা। বিনা কার্য্য-কারণে রক্তপাত ঘটালে তাদের পেশার বদনাম হয়।

গত যুগে দুলে, বাগ্দী, ডোম ছিল অত্যন্ত দুঃসাহসী, বীর। বড় বড় জমিদার এবং রাজারা এদের দিয়ে সৈন্যদল গঠন করতেন। কালক্রমে কর্মচ্যুত বাগ্দী, ডোমেরা গঠন করেছিল ডাকাতদল।

ডাকাতির প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল জীবিকা নির্বাহ। লাঠি, তলোয়ার, বর্শা, কোঁচা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হ'য়ে তারা ডাকাতি করতে যেতো—রাতের অন্ধকারে। ডাকাতি করতে গিয়ে দলের কেউ আহত হ'য়ে চলশক্তি রহিত হলে—এরা তাকে বয়ে নিয়ে আসতে চেষ্টা করতো নিরাপদ স্থানে, অপারক হলে তার মাথাটি কেটে নিয়ে সরে পড়তো। অনেক ক্ষেত্রে ধৃত ডাকাতকে তারই দলের লোক দূর থেকে তীর ছুঁড়ে মেরে ফেলেছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জায়া মা সারদেশ্বরী আসছিলেন তারকেশ্বরে। সন্ধ্যার মুখে তিনি একা এসে পড়লেন তেলো-ভেলোর মাঠের সামনে। অন্যান্য সঙ্গীরা কে যে কোন দিকে চলে গেছে তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই।

—কে—কে যায়?

—আমি তোমার মেয়ে বাবা।

ডাকাত সর্দার এগিয়ে এলো তাঁর সামনে। সারদা দেবী বললেন, আমি বোধ হয় পথ ভুলে তেলো-ভেলোর মাঠের দিকে এসে পড়েছি। এই মাঠটা আমায় একটু পার করে দেবে বাবা?

—কোথা যাবে তুমি মা?

—আমি যাবো বাবা তারকেশ্বর। সেখান থেকে যাবো কলকাতায় তোমার জামাইয়ের কাছে। তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমনির কালী বাড়ীতে থাকেন। বললেন সারদামণি।

পথশ্রান্তা সারদামণিকে জলযোগ করিয়ে ডাকাতটি তাঁকে তারকেশ্বরে নিরাপদে পৌঁছে দিয়েছিল।

চিঠি দিয়ে ডাকাতি করার পদ্ধতি এযুগে উঠে গেছে। আগে গৃহকর্তাকে চিঠি দিয়ে ডাকাতরা বুক ফুলিয়ে ডাকাতি করতে যেতো সুদূর পল্লীগ্রামে। সে যুগে বোমার প্রচলন ছিল না। ঢাল, তরোয়াল, সড়কী, বর্শা, কোঁচে, লাঠি প্রভৃতি নিয়ে ডাকাতরা

আসতো ডাকাতি করতে। লোকবল আর অস্ত্রবলে তারা ছিল বলীয়ান। চিঠি দেওয়ার অর্থ হচ্ছে চ্যালেঞ্জ, অর্থাৎ পার তো আমাদের রুখো। নগদ টাকা আর গহনা—যা তারা দাবী করতো তা তাদের জন্য মজুত রাখতে হতো, নতুবা নির্য্যাতন ও প্রাণ-হানীর সম্ভাবনা।

চিঠি পেয়ে ধনীরা আত্মরক্ষার জন্য পারিশ্রমিক দিয়ে নিয়ে আসতো লাঠিয়াল। লাঠিয়ালরা শুধু যে লাঠিই চালাতে জানতো তা নয়—তৎকালীন সব রকম অস্ত্র-শস্ত্রই তারা চালাতে জানতো। প্রথমটা দু'দলে লড়াই হতো। লড়তে লড়তে ডাকাতরা দু'ভাগে ভাগ হ'য়ে একদল ঢুকে পড়তো অন্দরে আর অন্য দল ঠেকিয়ে রাখতো ধনীর পক্ষের লোকদের। এসব ক্ষেত্রে ডাকাতদের পরাজয় ঘটেছে খুবই কম। তবে মার খেয়ে ফিরেও যে যেতে হয়নি এমন নয়।

বিনা নোটিশে ডাকাত পড়লো বর্দ্ধমান জেলার কোন এক পল্লীগ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ বাড়ীতে। গোয়াল আর ঢেঁকিশালাটা ছিল বারবাড়ীতে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায়। মশাল জ্বেলে তারা ঢেঁকিশাল থেকে ঢেঁকিটা তুলে এনে তারই সাহায্যে বল্টু মারা জবরদস্ত সদরদরজা ভেঙ্গে ফেললে। বাইরে লাঠি ঘোরাতে লাগলো জন কয়েক আর বাকি লোক ঢুকলো অন্দরে। কর্তা চাবী দিতে অস্বীকার করায় ডাকাতরা তাকে থামের সঙ্গে বেঁধে খেঁজুর কাঁটা ফোটাতে লাগলো তার নখের কোণে। গৃহিণী চাবি ছুঁড়ে দিয়ে সর্দারকে বললেন, বাবা! সিন্দুক খুলে যা খুশি তোমরা নিয়ে যাও। ওঁকে কিছু বলো না, আর মেয়েদের গায়ে হাত দিও না। যার গায়ে যা আছে—সব খুলে দিচ্ছে। তবে একটা কথা বাবা, আগামী মাসে আমার মেয়ের বিয়ে। পণের টাকা আর গয়না যদি সিন্দুকে রেখে যাও তো খুবই উপকার

হয়। নইলে আইবুড়ো মেয়েটাকে নিয়ে আমরা খুবই বিপদে পড়বো।

—আচ্ছা মা, তাই হবে।

বলা বাহুল্য—ডাকাত সর্দার তার কথা রেখেছিল।

ডাকাতরা কালীপূজা করে ডাকাতি করতে বেরুতো। এযুগে পূজো করে ডাকাতি করতে বেরুনোর কথা খুবই কম শোনা যায়। ডাকাতদের প্রতিষ্ঠিত বহু কালীমন্দির আজও ভগ্ন অবস্থায় বাঙলা দেশের বহু স্থানে দেখা যায়। শহরে ও গ্রামে বহু বিগ্রহ 'ডাকাত-কালী' নামে আজও শাক্তদের পূজা পেয়ে থাকেন। ডাকাতের ছেলেকে ডাকাত হ'তে দেখা গেলেও তারা ঠিক জন্ম-অপরাধী নয়। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া ও পরিবেশ জাগ্রত করে তাদের সুপ্ত অপ-স্পৃহা। এরা ঠিক স্বভাব অপরাধী নয়। স্বভাব অপরাধীরা ধর্মাধর্মের ধার ধারে না।

ডাকাতরা টাকা পয়সা, গহনা অপহরণ করে কিন্তু নারী অপহরণ করে না। নারী মাত্রেই শক্তির আধার। নারীর অপমান বা অমর্য্যাদা—ডাকাতি যাদের পেশা অর্থাৎ জাত ডাকাতরা কোনদিনই করে না এটা তাদের ধর্ম-বিরুদ্ধ। তাদের বিশ্বাস—প্রতি নারীর মধ্যে বিরাজ করছেন মা কালী। নারীধর্ষণ করতে খুব কম ডাকাতদেরই শোনা গেছে। নারীর ওপর অত্যাচার যারা করে—তারা হলো ডাকাত জাতের কলঙ্ক।

শহর থেকে অনেক দূরে বীরভূম জেলার কোন একটি অখ্যাত গ্রামে এক জোতদারের ঘরে রাত দুপুরে ডাকাত পড়লো। সে-দিন তার মেয়ের বিয়ে। বিয়ে হ'য়ে গেছে। বর-কনে গেছে বাসরে। বাড়ীর লোকজনের খাওয়া প্রায় শেষ হ'য়ে গেছে। ডাকাতরা বাড়ী ঘেরাও করে ফেললে। জন কয়েক অনুচর নিয়ে সর্দার ভিতরে ঢুকে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বললে, আমি চাই—বরকর্তাকে।

কাঁপতে কাঁপতে বরকর্তা এসে হাজির হলেন।

—আপনি ছেলের বিয়েতে বরপণ হিসাবে নগদ টাকা আর গয়না-গাটি যা পেয়েছেন—সেগুলি আমাদের দিতে হবে। বললে সর্দার।

বরকর্তা দ্বিরুক্তি না করে টাকা ধরে দিলে। তারপর ডাকাত সর্দারকে নিয়ে গেল বাসর ঘরে। শ্বশুরের নির্দেশে বধূমাতা তার গায়ের গহনা এক এক গাছি করে খুলে দিলে।

এবার ডাক পড়লো বাড়ীর কর্তার।

—গরীব প্রজা ঠেঙিয়ে খাজনা বাবদ যে টাকা আপনি মহল থেকে আদায় করেছেন তার পরিমাণ আমি জানি। সেই টাকার অর্দ্ধেক আমি চাই।

—সব টাকা তো মেয়ের বিয়েতে খরচ হ'য়ে গেছে বাবা।

—দেখি সিন্দুকের চাবি?

—আচ্ছা—আচ্ছা—একটু অপেক্ষা কর। আমি—আমি আসছি।

ক্রুর হাসি ঠোঁটের কোণে টেনে এনে সর্দার বলল, সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না। দেখুন চৌধুরীমশাই! প্রাণে যদি বাঁচতে চান—চালাকি করতে আসবেন না আমার সঙ্গে। যা তোরে কর্তার সঙ্গে! খবরদার! মেয়েদের গায়ে কেউ হাত দিবি না। পুরুষ যে কেউ ট্যাঁ-ফুঁ করবে—ব্যস্, খতম্!

দেরি দেখে সর্দার গিয়ে হাজির হলো কর্তার ঘরে। কর্তার হাত পা বাঁধা জানালার গরাদের সঙ্গে। বাপের সামনে তারই কুমারী মেয়ের ওপর পাশবিক অত্যাচার করছে তার এক অনুচর অন্য অনুচরের সাহায্যে।

চোখের পলকে দুষ্কৃতকারীদের দুটো মাথা ধড় থেকে নামিয়ে দিলে সর্দার। বাঁধন খুলে দিলে বাড়ীর কর্তার। সিন্দুক থেকে টাকা নিলে আর তুলে নিলে দুটো কাটা মুণ্ড। চীৎকার করতে করতে নীচে নেমে এলো, জাল গুটো—সব জাল গুটো!

'জাল-গুটো' শব্দের অর্থ হচ্ছে—কাজ শেষ হ'য়েছে, এবার চল সব সরে পড়ি।

ডাকাতে 'কু' বড় সাঙ্ঘাতিক 'কু'। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে তো দূরের কথা—বড়দেরও এই 'কু' শুনলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। জন্তু জানোয়ারের ডাকের এরা অবিকল অনুকরণ করতে পারে। শেয়াল, বিড়াল, ছাগল, ঘোড়া প্রভৃতি জন্তুর ডাক এরা ডেকে সঙ্গীদের জানিয়ে দেয় নিজ নিজ আগমণ বার্তা এবং বনে জঙ্গলে অবস্থিতির স্থান।

প্রহরে প্রহরে গ্রামাঞ্চলে শেয়াল ডেকে থাকে বন জঙ্গলের ভিতর থেকে বা খাল, বিল, নদীর ধার থেকে। প্রথম একটা শেয়াল ডাকলেই—অন্যান্য শেয়াল সমস্বরে ডেকে থাকে। লোকে কথায় বলে—'সব শেযালের এক রা'।

একজন ডাকাত শেযালের ডাক ডাকলেই কিন্তু সব ডাকাতের পক্ষে এক সঙ্গে ডেকে ওঠা সম্ভব হয় না। খাপছাড়া বা মাঝে-মধ্যে একটা আধটা ডাক শুনলেই ধরে নিতে হবে—ঐগুলো আসল শেয়ালের ডাক নয়। তখনই উচিত গ্রামবাসীদের সাবধান এবং সজাগ হওয়া।

অনেক সময় গ্রামের কোন একজন লোকের সঙ্গে যোগাযোগ থাকে ডাকাত দলের। গ্রাম্য লোকটি এদের গোয়েন্দার কাজ করে। যে বাড়ীতে ডাকাতি করবে—আগে থেকে সেই বাড়ীর সব কিছু খবরা-খবর ডাকাতরা নিয়ে থাকে ঘর-সন্ধানী বিভীষণ ঐ গ্রাম্য গোয়েন্দাটির কাছ থেকে।

হাওড়া জেলার কোন এক ভদ্রলোকের দোতলা বাড়ীটি চুণকাম করা হচ্ছে। কাজ এখনো শেষ হয়নি, তাই বাঁশের ভারাটা বাঁধাই আছে।

বাড়ীর কর্তা সম্প্রতি দেহরক্ষা করেছেন বিরানব্বুই বছর বয়সে। নাতি, নাতনী নিয়ে বিরাট গোষ্ঠী। শ্রাদ্ধটা বেশ ঘটা করেই হবে।

নিমন্ত্রণ পর্ব শেষ হ'য়ে গেছে। দু'একদিনের মধ্যে আত্মীয়-স্বজনে পূর্ণ হ'য়ে যাবে বাড়ী।

গভীর রাত্রে হঠাৎ খাপছাড়া শেয়ালের ডাক শোনা গেল। কোলাপসেবল গেটের চাবিগুলো ঠিক আছে কিনা একবার দেখে নেওয়া হলো। সবাই সন্ত্রস্ত। গ্রামে ডাকাত এসেছে নিঃসন্দেহ—কিন্তু পড়বে কোন বাড়ীতে! তবে এ তল্লাটে—একমাত্র সরকার বাড়ী ছাড়া আর ডাকাত পড়ার মত বাড়ীই বা কটা আছে!

বাড়ীর মেয়েরা সবাই একটা ঘরে ঢুকে খিল দিলে। হঠাৎ আশ-পাশে 'কু' ধ্বনি শুনে সবাই ভয়ে আঁতকে উঠলো। মেজবাবু—রিটায়ার্ড পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর তিনি দোতলার বারাণ্ডা থেকে বন্দুকের গোটা তিনেক ফাঁকা আওয়াজ করলেন।

ডাকাতরা চূণকাম করার জন্য বাঁধা বাঁশের ভারা বেয়ে চুপিসাড়ে বাড়ীর পিছন দিয়ে ছাদে উঠে এলো। বেড়ালের মত হামা দিয়ে চিলে-কোঠার ভেতর দিয়ে নীচে নেমে অতর্কিতে মেজবাবুকে আক্রমণ ক'রে তার হাত থেকে বন্দুকটি কেড়ে নিলে। বন্দুক ছোঁড়ার অপরাধে তার ওপর চললো বেদম প্রহার।

বাড়ীর বড় কর্তা সাহস করে এগিয়ে এসে বললেন জোড় হাত করে, ওর হ'য়ে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর ওকে মেরোনা। কি চাও তোমরা?

—যে টাকাটা আপনি আজ বুড়ো কর্তার শ্রাদ্ধের জন্যে ব্যাঙ্ক থেকে তুলে এনেছেন—সেই টাকাটা আমরা চাই। বাপের সুপুত্রের মত দিয়ে দিলে—কোন ঝামেলাই হবে না, নইলে শুধু আপনি কেন—বাড়ীর প্রত্যেককে কচু-কাটা করে রেখে যাবো, ছেলে বুড়ো কাউকে বাদ দেব না। বললে ডাকাত সর্দার।

—সর্দার! এই ঘরে সব মেয়েরা লুকিয়ে আছে।

—হুঁসিয়ার! ও ঘরের ধারে কাছে কেউ ঘেঁসবি না। ভীম ভৈরব নাদে বললে ডাকাত সর্দার।

—বলুন বড় বাবু। টাকা কোথায়?

—দাঁড়াও! আমি এনে দিচ্ছি।

—তা কি হয়। আমি যাবো আপনার সঙ্গে! চলুন—। বলে সর্দার ঘরে গিয়ে ঢুকলো কর্তার সঙ্গে।

ইতিমধ্যে দলের অন্য লোকজন মশাল জ্বেলে নীচে নেমে গেল। আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে মেন-গেটের তালা ভেঙে ফেললে। বাড়ীর সামনের চত্বরে সুরু হালা লাঠি খেলা আর মাঝে মাঝে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ।

—মা জননীরা! ঘরের দরজা খুলে দাও। নইলে দরজা আমাদের ভেঙে ফেলতে হবে।

ঘরের দরজা খুলে দিলেন বাড়ীর গৃহিণী।

—এইবার যার গায়ে যা গয়না আছে তার দু'খানা করে গয়না আমার এই পাতা কাপড়ে ফেলে দিয়ে নির্ভয়ে বেরিয়ে যান। আপনারা আমার মা। বললে সর্দার।

মেয়েদের তথাকরণ।

গহনা ও টাকা নিয়ে ডাকাত সর্দার নীচে নেমে এলো। বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করতে করতে বন-জঙ্গল ঝাপিয়ে নদীর ধারে গিয়ে ডাকাতরা দেখলে—তাদের নৌকা যথাস্থানে নেই। এধার ওধার খুঁজে তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে। সাঁতরে ওপারে গিয়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দিলে।

নদীর ধার থেকে প্রথম শোনা যায় বেখাপ্পা শেয়ালের ডাক। তারপরেই গ্রামের লোক জানতে পারলে যে সরকার বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে কিন্তু বন্দুকের আওয়াজ শুনে তারা এগোতে সাহস করলে না।

নদীর ধার থেকে যখন শেয়ালের আওয়াজ করেছে ডাকাতরা—তখন নিশ্চয় এসেছে ওরা নৌকা করে। গাঁয়ের লোক তাই আগে থেকে নৌকাটা জলে ডুবিয়ে দেয় বেশ খানিকটা দূরে নিয়ে গিয়ে।

ওরা নদীর ধারে আসবার আগে বিশ পঁচিশজন গ্রামবাসী লুকিয়ে রইলো নদীর কাছাকাছি ঝোপ ঝাড় জঙ্গলে। নৌকা না পেয়ে ওরা সবাই জলে নামার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীরাও ওদের পিছনে জলে নামলো আর সাঁতরে গিয়ে ডুবিয়ে ধরলে সবার পিছনের দুটি ডাকাতকে। তাদেব আর চীৎকার করে ডাকবার সময় দিলে না, একবার করে চোবায় আর তোলে—তোলে আর চোবায়। এই করে তাদের নদীর চরে নিয়ে এসে গামছা দিয়ে মুখ বেঁধে নিয়ে এসে ফেললে সরকার বাড়ীতে।

মেজবাবুর অবস্থা তখন খুবই সঙ্গীন। তাঁকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। গ্রামের দু'জন লোক গেল থানায় খবর দিতে।

ডাকাত দু'জনেব স্বীকাবউক্তিতে জানা গেল যে তাদেবই গ্রামের একজন তথাকথিত ভদ্রলোকের সঙ্গে এই ডাকাতদলেব যোগাযোগ আছে। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলার খবর সে-ই তাদের দলকে জানিয়ে দিয়েছে আগে থেকে। সেই ছদ্মবেশী গোয়েন্দাটির এ বাড়ীতে শুধু যাতায়াত নেই—ঘনিষ্ঠতাও আছে।

অনুমানে বোঝা গেল—সেই ঘনিষ্ঠতম লোকটি কে।

দু'জন ডাকাত ধবা পড়ার ফলে অন্য ডাকাতরাও ধবা পড়লো। কিন্তু গহনা আর টাকা পয়সা সব উদ্ধাব করা গেল না, কিছুটা পাওয়া গেল।

বিচারে—ডাকাতদলেব সাজা হ'য়ে গেল।

ডাকাতদের পেশা ডাকাতি করা, খুন করা নয়। তবে বাধা পেলে বা অভীষ্ট সিদ্ধির পথে কেউ অন্তরায় হলে ডাকাতরাও খুন করতে দ্বিধা করে না।

সে যুগে ডাকাতদের 'যান-বাহন' ছিল রণ-পা। এক একটি গাঁটবিশিষ্ট দুটি লম্বা বাঁশই হচ্ছে রণ-পা। এই রণ-পা অবলম্বন

করে মাঠ, পথ, ছোট ছোট খাল, ডোবা—এরা অনায়াসে পেরিয়ে যেত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে। এই রণ-পায়ে চড়ে রাতারাতি বিশ পঁচিশ ক্রোশ অতিক্রম করা এদের পক্ষে মোটেই কষ্টসাধ্য ছিল না। কিন্তু রণ-পা'র যুগ চলে গেছে। তার পরিবর্তে এসেছে ট্রেণ, মোটর।

বোম্বে রোডের ওপর কোন একটা গ্রামের ধারে রাত নটার সময় একটা জীপ গাড়ী হঠাৎ খারাপ হ'য়ে গেল। গাড়ীর ড্রাইভার আর একজন মেকানিক লেগে গেল গাড়ী মেরামত করতে। কিছুতেই কিছু হয় না। রাত দশটার সময় গাড়ীটাকে ঠেলতে ঠেলতে রাস্তার ধারে একটা দোতলা কোঠাবাড়ীর ধারে এনে দাঁড় করান হলো।

বাড়ীর লোককে ডেকে জানান হলো তাদের এই আকস্মিক বিপদের কথা। ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় একটা রাতের মত তারা শুতে চায়। আগন্তুক ক'জনই বাঙালী। তারা ট্যুরে বেরিয়েছে বন্ধু-বান্ধব মিলে। বাড়ীর মালিক রাজি হ'য়ে এক রাতের মত তাঁর বৈঠকখানায় আগন্তুকদের স্থান দিলেন।

জীপ সারানোর কাজ ওদিকে পুরোদমে চলেছে। গ্যাসের ভট্-ভটানির জ্বালায় বাড়ির লোকের কানে তালা ধরার অবস্থা।

খাওয়া-দাওয়া সেরে ভদ্রলোক শুতে যাচ্ছেন—হঠাৎ দেখলেন, প্রত্যেকটি ঘরের সামনে এক একজন পিস্তলধারী দাঁড়িয়ে।

—চেঁচাবেন না। প্রাণে যদি বাঁচতে চান তাহলে টাকা পয়সা আর গয়নাগাটি যা আছে বাড়ীতে দিয়ে দিন।

বুকের সামনে উঁচানো পিস্তল দেখলে অতি বড় সাহসীও ঘাবড়ে যায়। বিস্ময়-বিমূঢ় গৃহকর্তা মন্ত্রমুগ্ধের মত তুলে দিলেন তাদের হাতে হাজার দুই টাকা আর গহনা।

—মা-লক্ষ্মীরা। আপনাদের গায়ে যার যা আছে দিয়ে দিন।

বাড়ীর মেয়েরা দ্বিরুক্তি না করে যার গায়ে যা ছিল সব তাড়াতাড়ি খুলে দিলে।

—আমাদের পিছু নিবার চেষ্টা করবেন না। আমাদের সঙ্গে ষ্টেনগান আছে! নমস্কার! বলে দলপতি হুইসিল বাজিয়ে জীপে এসে উঠলেন।

সঙ্গীরা এসে লাফ দিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জীপ ফুল স্পীডে মিশে গেল রাতের অন্ধকারে।

জীপ খারাপ হওয়াটা সত্য নয়—ভান। গ্যাসের ঐ ভট্-ভটানি সমান ভাবে চালিয়ে যাওয়ার অর্থ লোকের মনের একাগ্রতা নষ্ট ও বাড়ীর মালিকের বিশ্বাস অর্জন।

প্রকাশ্য দিবালোক এবং সন্ধ্যা রাত্রে খাস কলকাতার বুকের ওপর পিস্তল, হাত বোমা আর ষ্টেনগানের সাহায্যে পোষ্টাফিসে, ব্যাঙ্কে, জুয়েলারী সপে, কাপড়ের আড়তে কত ডাকাতিই না হয়েছে এবং আজও হচ্ছে! আগ্নেয় অস্ত্রের চেয়ে বেশী কার্য্যকরী হয় অপকার্য্যকারীদের উপস্থিত বুদ্ধি এবং ক্ষিপ্রকারিতা।

খরিদ্দার বা একাউন্ট-হোলডার হিসাবে এরা প্রথমে অকুস্থলে ঢুকে পড়ে। সময় বুঝে পিস্তলের একটা ফাঁকা আওয়াজ করে, সঙ্গে সঙ্গে অকুস্থলের প্রবেশ পথে বোমা ফাটায় যাতে বাইরের লোক ভেতরে ঢুকতে সাহস না পায়। ওদিকে তখন পিস্তল উঁচিয়ে থাকে কজন আর সেই অবসরে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বামাল হস্তগত করে দলের অন্য লোক। বামাল হাতিয়েই অকুস্থল থেকে বেরিয়ে বোমা ফাটাতে ফাটাতে আর পিস্তলের ফাঁকা আওয়াজ করতে করতে ওরা সদলে গিয়ে অল্প দূরে রাখা জীপ বা ট্যাকসিতে উঠে সরে পড়ে। অনেক সময় বেকায়দায় পড়ে এরা গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ে পালিয়ে যেতেও শোনা গেছে।

শহরে বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ লোকের বাড়ী ডাকাতি হোতে বড় একটা শোনা যায়নি। এখানে ডাকাত্তির বদলে গৃহস্থলোকের বাড়ী চুরিটাই হয় বেশী।

ঠ্যাঙাড়ের বীভৎস অত্যাচারের কবল থেকে বাংলা দেশ আজও মুক্ত হ'তে পারেনি। বহু কুখ্যাত ঠ্যাঙাড়ের মাঠে গিয়ে পড়লে আজও মানুষকে প্রাণ হারাতে হয়। বহু গ্রামে-দেশের পথে-ঘাটে ঠ্যাঙাড়ের হাতে পড়ে আজও লোককে হ'তে হয় সর্বস্বান্ত। নিরালা মাঠ বা দীঘির ধারে অথবা জঙ্গলের মধ্যস্থিত পথের পাশে এরা দল বেঁধে লুকিয়ে থাকে। লাঠিই এদের হাতিয়ার। অন্তরাল থেকে বেরিয়ে পথচারীর পায়ে বা মাথায় ডাণ্ডা মেরে তার যথা-সর্বস্ব অপহরণ করাই এদের পেশা

সুদর পল্লীগ্রামে জমিদারের একমাত্র মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হ'য়েছিল সিদ্ধেশ্বরের। সিদ্ধেশ্বর ওরফে সিধু জমিদারের ছেলে না হ'লেও বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। তাদেরও বাড়ী পল্লীগ্রামে। কিছু জমিজামা আছে আর আছে ব্যবসা। সিধু মূর্খ নয়—একটা পাস করেছে। কলকাতায় গিয়ে কলেজে ভর্তিও হয়েছিল কিন্তু এক বছর যেতে না যেতেই পড়াশোনায় ইস্তফা দিয়ে তাকে বাড়ী ফিরে আসতে হলো। বৃদ্ধ বাবা হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে শয্যা নিলেন, সিধুই বাড়ীর বড় ছেলে—তাকেই নিতে হলো ব্যবসা-বাণিজ্য দেখা শোনার ভার।

লোকে কথায় বলে—লাখ কথা না হলে নাকি বিয়েই হয় না কিন্তু সিধুর বেলা এ নিয়মের ব্যতিক্রম হতে বিলম্ব হলো না। ঘটকের মুখে খবর পেয়ে মেয়ের মা আর মামা বাড়ী বয়ে এসে তার অসুস্থ বাবাকে মেয়ে দেখিয়ে গেল পুরো রাজত্ব আর এক রাজকন্যে —সঙ্গে সঙ্গে কথা পাকাপাকি—পাকা দেখা—বিয়ে।

বিয়ের পর মাত্র একবার সে শ্বশুরবাড়ী গেসলো আর এইবার

যাচ্ছে হঠাৎ—বিনা নোটিশে। বাবার অবস্থা খুব ভালো মনে হচ্ছে না, তিনি বধূমাতাকে [illegible]বার জন্য সিধুকে তার শ্বশুরবাড়ী পাঠালেন। একজন চাকর [illegible]ঙ্গে নিয়ে সিধু এসে নৌকা থেকে নামলো তার শ্বশুরবাড়ীর দেশে।

—কুথাকে যাওয়াটি হবেক?

—যাবো কালকে পুর।

—ই ধার দিয়ে যাওয়াটি না করে—হাই কালীদয়ের ধার দিয়ে যাওয়াটি কর, ঝটপট্ পৌঁছি যাবেক। বলে কালীদয়ের পথটা দেখিয়ে দিয়ে লোকটা একদিকে চলে গেল।

ছোট্ট ট্রাঙ্কটি মাথায় নিয়ে চাকরটি চলেছে পিছনে আর সিধু এগিয়ে।

কালীদয়ের কাছাকাছি আসতেই অন্ধকার হ'য়ে গেল। জন প্রাণীর দেখা নেই। কেমন যেন গা-টা ছম্ ছম্ করে উঠলো। কালীদয়ের মাঝামাঝি আসতেই যম দূতাকৃতি দুটো লোক আচম্বিতে জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে পিছন থেকে মারলে চাকরটার পায়ে এক ডাণ্ডা। ভীষণ আর্তনাদ করে পথের ওপর লুটিয়ে পড়লো চাকরটা। মাথার ছোট্ট ট্রাঙ্কটা দীঘির জলে গড়িয়ে পড়তে পড়তে রয়ে গেল। চাকরটার সাহায্যে এগিয়ে আসবে কিনা ভাবছে সিধু —হঠাৎ দেখলে—কতকগুলো কালো হাঁড়ি জলের ওপর ভাসতে ভাসতে দীঘির পাড়ের দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে। ওগুলো যে হাঁড়ি নয়—হাঁড়ি মাথায় মানুষ—এ কথা বুঝতে দেরী হলো না সিধুর। হাঁড়িগুলো তীরে ওঠবার আগেই সিধু দিক বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটতে সুরু করলে। পিছন ফিরে দেখলে—পাঁচ সাতটা লোক তাকে তাড়া করেছে। সিধু উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে গিয়ে একটা জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়লো। ঠ্যাঙারেগুলো অত লক্ষ্য করেনি, তারা তাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। জঙ্গলের ভেতর বসে দেখলে—দূরে একটা চলন্ত আলো এগিয়ে যাচ্ছে।

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে খানা, ডোবা, ঝোপ-ঝাড় ঝাঁপিয়ে এসে পথে উঠলো সিধু। এগিয়ে গিয়ে দেখলে—চলন্ত আলোটা হচ্ছে একটা গরুর গাড়ী। সিধুর অবস্থা দেখে গাড়োয়ান বললে, কি বাবু ঠ্যাঙাড়ের হাতে পড়েছিলে বুঝি? বরাত জোরে মাথা যে দু'ফাঁক হ'য়ে যায়নি—এই ভালো। উঠে পড়—তোমাকে আমি কালকেপুর পোঁছে দিচ্ছি। সাঁজের বেলা কি কেউ কালীদয়ের ধার দিয়ে পথ চলে গা, ওটা হচ্ছে ঠ্যাঙাড়ে দিঘী!

কালিকাপুরে পোঁছে সিধু বললে, আমার কাছে যা ছিল—সব তো ওরা—

—কিচ্ছুটি তোমায় দিতে হবেনি! বামুন মানুষ—একটু শুধু পায়ের ধূলো দাও। সিধুর পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে গাড়োয়ান চলে গেল।

হঠাৎ সিধুকে দেখে শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা তো অবাক।

—পথে কোন কষ্ট হয়নি তো বাবা? বললে তার শাশুড়ী।

—না। ব্যাপারটা চেপে গেল সিধু।

—আমাদের এখানে আসতে হলে আগে থেকে একটা খবর দিয়ে আসতে হয়। পাড়া গাঁ—বেঘোলা জায়গা, পথ ঘাট তো ভাল নয়। আগে থেকে জানতে পারলে নদীর ঘাটে তোমার জন্য গরুর গাড়ী পাঠাতাম। যাক্—হাতমুখ ধুয়ে জল-টল খাও, জিরোও।

—বাবার অবস্থা ভাল নয়। তাই খবর না দিয়েই আসতে হলো। আপনার মেয়েকে নিয়ে যাবার জন্যে মা আমায় তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। আমি একটু স্নান করবো।

চাকর আলো ধরে সিধুকে পুকুরঘাটে নিয়ে গেল। স্নান করে উঠতেই চাকর তার হাতে একখানা বড় টাওয়েল দিলে গা হাত মোছবার জন্য। টাওয়েল হাতে পড়তেই চমকে উঠলো সিধু! সর্বনাশ! এ যে আমারই টাওয়েল—ছিল ঐ ট্রাঙ্কে! এ এখানে এলো কোথা থেকে!

ঘরে যেতেই সিধুর স্ত্রী তার হাতে একখানি কোঁচানো কাপড় দিলে-পরবার জন্য। আরো আশ্চর্য হ'য়ে গেল সিধু। এ যে তারই কাপড়। এর প[illegible] পড়লো চিরুণী, সিগারেট কেস আর তারই ছোট আয়না!

জলযোগ সেরে স্ত্রীকে একান্তে ডেকে বললে, কি ব্যাপার বল তো? এই টাওয়েল, কাপড়, আয়না, চিরুণী, মায় কাপড়টি পর্য্যন্ত—সবই তো আমি সঙ্গে এনেছিলাম। অথচ আমি এসে পৌঁছবার আগেই আমার জিনিষ তোমাদের এখানে এলো কেমন করে?

ভয়ে, লজ্জায়, ক্ষোভে সিধুর স্ত্রীর সুন্দর মুখখানা এক লহমায় ফ্যাকাসে হয়ে গেল। নিজেকে সামলে নিয়ে সিধুর স্ত্রী বললে, এসব জিনিষ যে তোমার তা তুমি জানলে কেমন করে?

—বাঃ নিজের ব্যবহার করা জিনিষ হাতে পড়লে মানুষ চিনতে পারবে না! বলে কালীদহের ঘটনাটি আদ্য-প্রান্ত বললে স্ত্রীর কাছে।

মেয়ের কাছে ঘটনাটি শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল সিধুর শাশুড়ী। আর একটু হলে আজ তার মেয়েকে বিধবা হ'তে হতো। সিধুর শ্বশুরই হচ্ছে ঠ্যাঙাড়েদের সর্দার। মা, মেয়ে কত বুঝিয়েছে কিন্তু কিছুতেই। সিধুর শ্বশুরকে ঐ কুকার্য্য হতে নিবৃত্ত করতে পারেনি।

শ্বশুর যদি কোন রকমে একবার বুঝতে পারে যে জামাই তাকে 'চিনে' ফেলেছে তাহলে তার বাঁচাই হবে শক্ত। তাই জামাইয়ের আগমন বার্তা সেদিন গোপন করা হলো শ্বশুরের কাছে। ভোর বেলা মেয়ে-জামাইকে খিড়কীর দরজা দিয়ে বার করে দিলে সিধুর শাশুড়ী।

পরে সব কিছু শুনে সিধুর অনুতপ্ত শ্বশুর ছেড়ে দিলেন ঐ পাপ ব্যবসা—মানুষ মারার কারবার। স্ত্রী আর মেয়ের পুণ্যের জোরেই যে জামাই এ যাত্রা পুনর্জ্জীবন পেলে—এ কথা তিনি মুক্তকণ্ঠে

স্বীকার করে ক্ষমাপ্রার্থী হিসাবে গোপনে জামাইকে পত্র দিলেন মানুষের চৈতন্য যখন হয়—তখন এমনি একটা অচিন্ত্যনীয় পরিস্থিতির ভিতর দিয়েই হ'য়ে থাকে।

পিতা কর্তৃক পুত্র হত্যা!

ঠ্যাঙাড়েরা অনেক সময় ডাণ্ডার আঘাতে আহত পথিকদের গাছের ডালের সঙ্গে ফাঁসিতে লটকে দিয়ে মেরে থাকে। আহত হৃত-সর্বস্ব ব্যক্তি প্রাণে বেঁচে যদি ফিরে যায় তাহলে ঠ্যাঙাড়েদের সমূহ বিপদ! তাতে তাদের রুটিতে হাত পড়বে। হৃতসর্বস্ব ব্যক্তির কাছে ঠ্যাঙাড়েদের কথা শুনে সে পথ বা প্রান্তর দিয়ে কেউ হাঁটবে না।

এ সব ঠ্যাঙাড়েরা কিন্তু ভবঘুরে নয়। তাদের স্ত্রী আছে, পুত্রকন্যা আছে—আছে সংসার। ঠেঙিয়ে মানুষ মেরে তাদের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করাই তাদের পেশা। এ পেশা তাদের এক-আধ পুরুষের নয়—বংশ পরম্পরা! তবে এদের বংশে মাঝে মধ্যে দু' একজন যে ভাল না হয় এমন নয়। তারা চাষ-আবাদ করে, লোকের বাড়ী দিন মজুরী করে আবার কেউ কেউ বা বাড়ী ছেড়ে বিদেশে গিয়ে কলে কাজ করে—এমনি সৎভাবে করে থা' জীবিকা অর্জন।

বীরভূম জেলার সুকৃপটিয়া গণ্ডগ্রামে আপত্তির বাড়ী। পনের বছর বয়সে সে বাপ-মার সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে আসে কলকাতায়। কুলীগিরি করে, লোকের বাড়ী চাকরের কাজ করে আপত্তি বছর পাঁচেকের মধ্যে বেশ কিছু টাকা কামাই করে। সেই টাকা নিয়ে কলকাতায় আপত্তি একটি ছোট্ট পান সিগারেটের দোকান খুলে বসলো। বছর তিনেকের মধ্যে আপত্তি বেশ কিছু মোটা টাকা জমিয়ে ফেললে।

আট বছর হলো আপত্তি দেশ ছেড়ে এসেছে। হঠাৎ বাড়ী ফেরার জন্য মনটা কেমন তার আকুলি-বিকুলি করে উঠলো।

দোকানটা তার একজন বন্ধুর জিম্মায় দিয়ে আপত্তি একদিন ট্রেণে চেপে বসলো।

দীর্ঘ আট বছর [illegible]ী ফিরছে আপত্তি। মনে পড়ছে বাপ-মার কথা—মনে প[illegible] ছোট ছোট দুটি ভাই বোনের কথা। সে কি আজকের কথা! এই আট বছরে তারা অনেকখানি বড় হ'য়ে গেছে। প্রথমটা হয়তো তারা তাকে চিনতেই পারবে না। কে জানে—কেমন আছে সব! আঃ ট্রেণটা এতো আস্তে যাচ্ছে কেন!

ষ্টেশনে নেমে হাঁটতে সুরু করলে আপত্তি তার টিনের ছোট সুটকেশটি হাতে নিয়ে। অর্দ্ধেক পথ আসতেই আঁধার নেমে এলো। ভাবলে—কারোর বাড়ী রাতটুকু কাটিয়ে ভোরের দিকে বাড়ীর পথে রওনা হবে। ভাবতে ভাবতে বেশ খানিক দূর এগিয়ে গেল। দূর—আর কেন লোকের বাড়ী থেকে রাত কাটাই। মাত্র আর দুটো গাঁ তারপরই তালপুকুর। তালপুকুরে গিয়ে পৌছানও যা আর তাদের বাড়ী গিয়ে ওঠাও তাই, তালপুকুর তো তাদেরই গাঁয়ের এলাকায় পড়ে।

হাঁটতে হাঁটতে তালপুকুরের ধারে এসে পড়লো আপত্তি।

—কে যায়?

—আমি!

—আমি তো সব শালা!

—বাবা! আমি গো!

—কাবে পড়লে অমন সব শালাই বাবা বলে! বলার সঙ্গে সঙ্গে আপত্তির মাথায় পড়লো ডাণ্ডা।

—আমি আ—আ—! মুর্চ্ছিত আপত্তির দেহটা লুটিয়ে পড়লো।

সুটকেশটা তুলে নিয়ে সঙ্গীদের উদ্দেশে বললে ষণ্ডামার্কা লোকটি, আজকের মত খেল খতম। বাবা-শালাকে ঐ গাছের ডালে লটকে দিয়ে ঝট্‌পট্ চলে আয়।

—বৌ! ওবৌ! ঝট্‌পট্ উঠে পড়। ছাখ কি এনেছি।

—কেনে তিন পোর রেতে তাড়ি খেয়ে ঝামেলা কত্তিছো।
ঝঙ্কার দিয়ে বললে ষণ্ডামার্কার বৌ।

—মা কালীর দিব্যি! মিথ্যে বলি[illegible] বলেই ষণ্ডামার্কা ধড়াস করে হাতের সুটকেশটা মাটিতে ফেলে দি[illegible]

বৌয়ের মন মেজাজ ভাল নেই। আপত্তি চলে যাওয়ার দু'বছরের মধ্যে তার ছেলে মেয়ে দুটিই মারা গেছে। তা হলো বই কি—সেও প্রায় বছর ছয়েক হলো। হঠাৎ আজ সে স্বপ্ন দেখেছে—আপত্তিকে।

কুপি জ্বালিয়ে খোলা হলো সুটকেশটা। ভাগিদাররা ততক্ষণে আপত্তিকে ফাঁসি দিয়ে ষণ্ডামার্কার বাড়ী এসে গেছে।

সুটকেশ থেকে বেরুলো একটা নতুন ধুতি, একটা সার্ট, নতুন শাড়ী একখানা, ছোট দুটো হাফ-প্যাণ্ট, দুটো জামা আর নগদ তিনশো টাকা। পুরাতন একখানি নকসা করা চাদর।

—চাদরটা যেন কেমন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে! বললে আপত্তির মা।

—রাখ্ তোর ন্যাকামি! দ্যাখ্—তলায় আর কোন মাল-ঝাল আছে কিনা।

সুটকেশটা উপুড় করে দিতেই কুঁচো-কাঁচা জিনিষের সঙ্গে পলা বসানো একটা রূপোর আঙটি আর তিনখানা ফটো মেঝেয় পড়লো।

—এতো আমার আপত্তির আঙটি! দেখি—দেখি কার ছবি। ছবিখানা দেখেই ডুকরে কেঁদে উঠলো ষণ্ডামার্কার বৌ, ওগো—এ যে আমার আপত্তি গো।

ষণ্ডামার্কা ও দলের অন্যান্য লোক নিজেদের চোখকে অবিশ্বাস করতে পারলে না, ছুটলো তালপুকুরের ধারে।

তাড়াতাড়ি গাছের ডাল থেকে নামিয়ে আনলে আপত্তিকে কিন্তু তখন সব শেষ হয়ে গেছে।

উন্মাদিনীর মত ছুটে এলো আপত্তির মা। আপত্তিকে দেখে চীৎকার করে বললে, জানতুম—এ আমি জানতুম। এত পাপ কি ভগবান সয়! বাপ হ[illegible] নিজের ছেলেকে মারলে সর্দার! ছুটো নিয়েছিল ভগবান, বাকি যেটা ছিল—সেটাকে নিলে তুমি!

আপত্তির মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিলে তার মা। মুখের দিকে অপলক নেত্রে চেয়ে থেকে বললে, তালপুকুরের ধারে গাছ তলায় শুয়ে কেন বাবা। ঘরের ছেলে ঘরে চলো! ওগো! খোকা—তোমার রোজগারী ছেলে, আপত্তি রোজগার করে বাড়ী ফিরলো আর তাকে তুমি গাছতলায় শুইয়ে রাখলে! তোমার কাপড়, আমার কাপড়, হাঃ হাঃ হাঃ—ছোট ভাই বোনদেরও ভোলেনি! আর টাকা—! অত টাকা তুমি একসঙ্গে কোনদিন দেখেছো! এক কাঁড়ি টাকা। আর—আর মানুষ ঠেঙিয়ে পাপের বোঝা বাড়িয়ে কি হবে! দেবো—এবার আমি ছেলের বিয়ে দিয়ে বৌ ঘরে আনবো। হাঃ হাঃ হাঃ—বৌ এসে কলকেতে ফুঁ দিয়ে শ্বশুরকে তামাক সেজে দেবে! ওমা! তোমরা সবাই মুখটি টিপে বসে আছো কেন—উলু দাও উলু দাও! আমার আপত্তির যে আজ বিয়ে—

আপত্তির মায়ের সেই যে মাথা খারাপ হ'য়ে গেল—আর কোন দিন সারলো না! যতদিন বেঁচেছিল ততদিন গভীর রাত্রে তালপুকুরের ধারে বসে চীৎকার করে কাঁদতো. ফিরে আয় আপত্তি—ফিরে আয়। আমি তোর বিয়ে দিয়ে বৌ ঘরে আনবো! ইত্যাদি—

আধুনিক যুগে ট্রেণ ডাকাতির প্রাবল্য কমে এলেও একেবারে লুপ্ত হয়নি! আজও বহু লোককে ট্রেণে প্রাণ হারাতে হয় দুর্বৃত্তদের কবলে। টাকা, পয়সা, গহনা নিয়ে ট্রেণ ভ্রমণ আজও নিরাপদ নয়। জেনানা কামরায় কোন গার্ডের ব্যবস্থা না থাকায় রাহাজানি বা ডাকাতির সুযোগ প্রায়ই গ্রহণ করে থাকে দুষ্কৃতকারীরা।

বোম্বাই মেল। জেনানা কামরায় মেয়েদের ভিড় খুবই নগণ্য কামরাটিও অপেক্ষাকৃত ছোট। ট্রেণ ছাড়বার ঘণ্টা পড়ার পূর্ব মুহূর্তে পুরুষরা এসে যাকে যা বলবার বলে গেল। আবার খোঁজ নিতে আসবে পরের ষ্টপেজে। প্রতি ষ্টেশনে তো আর মেল থামবে না।

ট্রেণ ছাড়লো। যারা ষ্টেশনে বিদায় দিতে এসেছিল তারা বিদায় নিয়ে চলে গেল। ট্রেণের স্পীড ক্রমশ বাড়তে সুরু হলো।

প্রায় প্রতি বেঞ্চে দেখা গেল একজন কি দু'জন ঘোমটা দেওয়া মেয়েছেলে। তারা কেউ বসে আছে জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে আবার কেউ বা বসেছে লাজনম্রা বধূর মত মুখ নীচু করে। অন্যান্য মেয়েদেব তুলনায় তাদের ঘোমটার বহরটা একটু বেশী। তা অমন হয়, সবাই তো আর আধুনিকা বা অতি আধুনিকা নন। এতে কার কি বলবার আছে আর মনে করবারই বা কি আছে?

ট্রেণ এবার স্পীড নিয়েছে—ফুল স্পীড। মেয়েরা গল্পে মসগুল। দু'একটি ঘোমটাধারী সবার ওপর একবার করে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে ঘোমটার ভিতর দিয়ে।

হঠাৎ কামরার মধ্যে হুইসিল বেজে উঠলো। মেয়েরা সচকিত হ'য়ে দেখলে ঘোমটাধারিনীরা ঘোমটা খুলে পিস্তল উচিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে এক একটি বেঞ্চের সামনে—হুইসিল বাজার সঙ্গে সঙ্গে।

—কেউ চেঁচাবেন না বা চেন টানতে চেষ্টা করবেন না, যাব কাছে যা আছে তাড়াতাড়ি দিয়ে দিন। কারো গায়ে আমরা হাত দেবো না, গয়নাগাটি খুলে দিন। বললে নারী সাজে সজ্জিতা দলপতি।

নীরবে কেউ কাঁদতে সুরু করলে, কেউ বা তাড়াতাড়ি খুলে দিলে তাদের গায়ের গহনা।

—কাঁদলে কেউ রেহাই পাবেন না। ভদ্রভাবে না দেন আমরা বাধ্য হবো গায়ে হাত দিতে। ঘড়ি ধরে দু'মিনিট সময় দিচ্ছি।

আর জোর জবরদস্তি করলে গয়নাগাঁটি টাকা পয়সা তো যাবেই—উপরন্তু প্রাণ হার'তে হবেই পিস্তলের গুলিতে।

এরপব আর কথা নেই। পিস্তলের নামে যাব কাছে যা ছিল—সব দিয়ে দিলে। বাসকো, সুটকেশ পটাপট খুলে ফেলে দামী যা কিছু পেলে তা তারা একটা সুটকেশে ভর্তি করে ফেললে।

দবজার ধারে দাঁড়িয়ে একজন ঘোমটাধারিনী (অবশ্য তখন ঘোমটা আর নেই) বাইরের দিকে চেয়ে ছিল। সে হুইসিল বাজালে, সঙ্গে সঙ্গে একজন চেন টানলে। দবজা খুলে ট্রেণ থামবার আগেই তারা লাফিয়ে পড়লো গোটা দু'য়েক সুটকেশ ভর্তি জিনিষ নিয়ে।

মেয়েদের চীৎকাব আর কান্নায় বুঝতে দেরী হলো না যে কোন কামবার চেন টা'না হ'য়েছে।

গার্ড এলেন, এলেন মেয়েদের অভিভাবকরা। করবার কি-ইবা আছে—একমাত্র আক্ষেপ আব হা-হুতাশ ছাড়া। ট্রেণ চালু করে পরের ষ্টেশনে আনা হলো। বেলপুলিশকে টেলিফোন যোগে ঘটনাটা জানিয়ে আপাততঃ ষ্টেশন কর্তৃপক্ষ তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করলেন।

মেয়েদেব কামরায় অন্ততঃ একজন সশস্ত্র গার্ড থাকলে এ রকম বেপরোয়া রাহাজানি বা ডাকাতি খুব কম হবে বলেই মনে হয়। জনসংখ্যা বেঙাচির মত যে অনুপাতে বাড়ছে তাতে সব সময় মেয়েদের নিয়ে পুরুষদের একত্রে যাত্রা খুবই কষ্টকব। কাজেই ফিমেল কমপার্টমেণ্ট বাড়ান ছাড়া কমান উচিত নয়। ট্রেণের যাত্রীদের প্রাণ, ধন-সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব রেল কর্তৃপক্ষের, কাজেই এসব দায়িত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁদের ঔদাসীন্য—অমার্জনীয়।

ডাকাতি সাধারণতঃ হ'য়ে থাকে প্রথম শ্রেণীতে, দ্বিতীয় শ্রেণীতে—কম। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরা হয় অবস্থাপন্ন লোক আর নয় প্রয়োজনের তাগিদে তাঁদের হতে হয় প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। সঙ্গে

অনেক টাকা বা মূল্যবান জিনিষ নিয়ে দ্বিতীব বা তৃতীয় শ্রেণীর চেয়ে অনেকে প্রথম শ্রেণীতে যাওয়াই নিরাপদ বলে মনে করে। দুষ্কৃত-কারীরা ধরেই নেয় যে নস্যব ডিবা আর চাবির রিঙ সম্বল করে প্রথম শ্রেণীতে কেউ চড়ে না, যারা চড়ে তারা জনে জনে মালদার আসামী। দুষ্কৃতকারীদের অনুমান মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বারহামপুর (গঞ্জাম) থেকে জনৈক ব্যবসায়ী কলকাতায় আসছেন ম্যাডরাজ মেলের তৃতীয় শ্রেণীতে। সঙ্গে আছে হাজার পাঁচেক টাকা! বারহামপুর থেকে ট্রেণ ছাড়বার সেকেণ্ড কয়েক পরে জন তিনেক লোক লাফ দিয়ে উঠে পড়লো। দেরি করে ষ্টেশনে আসার জন্য তারা দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠতে না পেরে তৃতীয় শ্রেণীতে উঠে পড়েছে। পরের ষ্টপেজেই নেমে যাবে।

রাত তখন গভীর। প্রায় সকলেই তন্দ্রাচ্ছন্ন। ব্যবসায়ীর হাত থেকে (ঐ লাফিয়ে ওঠা ব্যক্তিদের) একজন তাঁর চামড়ার ব্যাগটি ছিনিয়ে নিলে। তিনি চেঁচামেচি করতেই আর সকলে জেগে উঠলো। আপার বাঙকে যে ভদ্রলোক ছিলেন—তিনি চেন টানলেন।

ব্যবসায়ী ভদ্রলোক পিস্তল দেখে পিছিয়ে গেলেন। ট্রেণের স্পীড কমে আসতেই ওরা দু'জন চামড়ার ব্যাগটি নিয়ে লাফিয়ে পড়লো নীচে। তৃতীয় লোকটিকে ধরবার জন্য যে ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন—তাঁকে পিস্তলের গুলিতে আহত করে তৃতীয় লোকটিও লাফ মারলে।

অন্ধকারে কোথায় যে তারা মিশে গেল তার কোন হদিসই পাওয়া গেল না। পরের দিন ভোরে রেলব্রীজের নীচে আহত অবস্থায় একজন ডাকাত ধরা পড়েছিল কিন্তু ঐ ব্যবসায়ীর ব্যাগ তার কাছে পাওয়া যায়নি। পরে অবশ্য আর দু'জন দুষ্কৃতকারীও ধরা পড়ে এবং বিচারে তাদের কঠোর সাজা হয়।

জি. টি. রোড বহু জায়গায় রেলওয়ে লাইন ক্রস করে সর্পিল গতিতে এগিয়ে গেছে। লোকালয় বিবর্জিত ষ্টেশন থেকে বেশ খানিকটা দূরে জঙ্গলাকীর্ণ একটা স্থানের কাছাকাছি রেলওয়ে ক্রসিঙের অদূরে গভীর রাত্রে একটা মালগাড়ী হঠাৎ থেমে গেল। জন দশেক লোক টর্চ জ্বেলে বগিগুলি দেখতে দেখতে এসে থেমে গেল একটা বগির সামনে। ঐ বগির ওপর খড়ি দিয়ে মোটা করে লেখা ছিল—'?'

জি. টি. রোডের ওপর একটি লরী সারানোর কাজ চলেছে সেই গভীর রাতে—ঐ রেলওয়ে ক্রসিঙের অদূরে। ওয়াগন খালি ক'রে টনের পর টন তামার বাট এনে ভর্তি করা হলো ঐ লরী—ক্ষিপ্রতার সঙ্গে। মাল ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লরীর রোগও সেরে গেল। সুস্থ সবল লরী মালগাড়ীটা ছাড়বার আগেই রেলওয়ে লাইন ক্রস করে ফুল স্পীডে বেরিয়ে গেল।

ড্রাইভারের সঙ্গে দুষ্কৃতকারীদের যোগসাজস ছাড়া এধরণের অপকার্য্য খুবই কম ঘটেছে।

এধরণের তামার বাটের ওপর কোম্পানীর নাম সংক্ষেপে লেখা থাকে। তারা এই নাম খোদাইকরা চোরাই মাল বাজারে চালাবে। আগে গুপ্তস্থানে নিয়ে গিয়ে কেটে নেয় টুকরো টুকরো করে সাইজ অনুপাতে। খোদাই করা অংশটুকু গালিয়ে ফেলার কলকৌশলও এদের জানা আছে। যে গ্যাঙ্ মাল সংগ্রহ করে তারা কিন্তু বামাল সংগ্রাহকদের বামাল সাপ্লাই করেই খালাস। চাহিদা অনুসারে সাইজ করে কাটা বা বামাল গালান হচ্ছে অন্য চোরা কারবারীদের কাজ।

মেল-ভ্যান ডাকাতিও বিনা যোগসাজসে খুবই কম হয়। দুষ্কৃতকারীরা মেল-ভ্যানের পাশের কামরায় থেকে নির্দিষ্ট স্থানে এসে ট্রেণের চেন টানে। ট্রেণ থামবার আগেই লাফিয়ে পড়ে কামরা থেকে, ওদিকে তখন মেল-ভ্যানের যোগসাজসকারীর টাকা ভর্তি ব্যাগ নীচে ফেলে দেয়। ট্রেণ পরিপূর্ণ ভাবে থামবার আগেই

দুষ্কৃতকারীরা টাকার ব্যাগ নিয়ে অকুস্থল থেকে চম্পট দেয়। গার্ড এসে দেখেন—মেল-ভ্যানের অভ্যন্তর ভাগ লণ্ড-ভণ্ড। মেল-ভ্যানের কর্মীরা প্রচার করে যে পিস্তল দেখিয়ে ডাকাতরা লুঠ-তরাজ করে সরে পড়লো, প্রাণের ভয়ে বাধা দিতে তারা সাহস করেনি। চাবিবন্ধ দরজা বা জানলার গরাদও আগে থেকে ভেঙে রাখা হয়—যেন চলন্ত গাড়ীর জানলার গরাদ অতর্কিতে ভেঙে দুষ্কৃত-কারীরা ভ্যানের ভেতর ঢুকে পড়েছে। কাজে অন্যমনস্ক থাকায় তারা যথাসময়ে ট্রেণের চেন টেনে ট্রেণ থামাতে পারেনি। দুষ্কৃতকারীরা ভেতরে ঢুকে পড়লে— চেন টানার তো আর প্রশ্নই ওঠে না। চেন টানতে গিয়ে কে তখন পিস্তলের গুলিতে প্রাণ দিতে যাবে।

সারা দিনের সংগৃহীত ক্যাস পাঠাবার আগে বহু বড় বড় ষ্টেশনে ডাকাতি হ'য়েছে, অথবা হ'য়েছে মাইনে দেবার আগের দিন রাত্রে। নিশুতি রাতে ষ্টেশনে খুব বেশী কর্মচারী থাকেন না। যাঁদের ডিউটি পড়ে—তাঁরাই শুধু থাকেন ট্রেণের সময় ছাড়া যাত্রীর সমাবেশও হয় না। গভীর রাত্রে যে সময় ট্রেণ আসার কোন সম্ভাবনা থাকে না—ঠিক সেই সময় ষ্টেশনে ডাকাতি হ'য়ে থাকে। দু'এক ক্ষেত্রে রেল-কর্মচারীর সঙ্গে যোগসাজসেও এই অপকার্য্য অনুষ্ঠিত হ'য়েছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডাকাতির পর দুষ্কৃতকারীরা মটরে চড়ে পলায়ন করে থাকে।

ডাকাতির সময় একবার একজন রেলওয়ে পয়েন্টস্-ম্যান দুষ্কৃত-কারীদের মটরের চাকার বাতাস বের করে দিয়েছিল। ফলে—ঐ ষ্টেশনের বাইরে দলের দু'জন ডাকাত সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে এবং পরে পুরো গ্যাঙটাকেই পুলিস গ্রেপ্তার করে।

স্থলের ন্যায় জলেও ডাকাতি হ'য়ে থাকে। আগে জলপথে যারা ডাকাতি করতো তাদের বলা হতো জলদস্যু। নদীবহুল দেশ পূর্ববঙ্গে এই জলদস্যুদের অত্যাচার ছিল খুবই বেশী। দেশ বিদেশে যাতায়াতের জন্য রেল-প্রবর্তনের আগে পশ্চিমবঙ্গে ছিল গরুর গাড়ী আর পূর্ববঙ্গে নৌকা।

মহাজনী, গহনা বা যাত্রীবাহী নৌকাগুলি আক্রমণ করতো জলদস্যুরা ছিপ্ এর সাহায্যে। এই দ্রুতগামী বিশ-বাইশ দাঁড়ের হালকা সরু নৌকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলা অন্য নৌকার পক্ষে সম্ভব নয়। বড় নৌকার ধারে ছিপ্ ভিড়িয়ে দিয়ে ডাকাতরা লাফিয়ে পড়তো নৌকাব ভিতব। চলতো লুঠতরাজ, বাধা পেলে খুন করতেও এরা কার্পণ্য করতো না।

ছিপের যুগ চলে গেছে। বর্তমান যুগে যাত্রীবাহী নৌকা করে ডাকাতরা জলপথে ডাকাতি করে থাকে। ডাকাতরা নৌকা করে নদীতে নদীতে ঘুরে বেড়ায় এবং মহাজনী বা যাত্রীবাহী নৌকা দেখলে আগুন নেবার বা তামাক খাবার অছিলায় নিজেদের নৌকা ঐ যাত্রীবাহী নৌকার গায়ে ভিড়িয়ে দিয়ে ভেজালী, বর্ষা, সড়কী প্রভৃতি নিয়ে ঐ নৌকা আক্রমণ করে। বাধা না পেলে 'যা কিছু নেবার নিয়ে' ওরা সরে পড়ে। আজকাল জল-পুলিসের সতর্ক এবং সজাগ দৃষ্টি এড়িয়ে এধরণের ডাকাতি যে না হয় এমন নয়—তবে কম।

তখন আমার বয়স বছব সাতেক হবে। বিয়ে বাড়ী থেকে নৌকা করে ফিরছি বাবা, মা, ঠাকুরমা আর আমরা তিন ভাই বোন। মা আর বোনের গায়ে 'একগা' করে গয়না। রূপনারায়ণের মুখে আসতেই সন্ধ্যা হ'য়ে গেল।

—বাঁকের মুখে যেতে আর কতক্ষণ লাগবে মাঝি? জিজ্ঞেস করলেন বাবা।

—তা বাবু—পেরায় ঘণ্টাখানেক। বললে মাঝি।

—জল-ঝড়ের দিন কিনা—তাই ভাবছি!

—জল, ঝড়, তুফানকে কিষ্টো মাঝি ডরায় না বাবু। ফি বচ্ছর সাগরে যাত্রী নে যাই বাবু। তবে কিনা—

—কি হ'য়েছে?

—না—কিছু না। তবে বিস্যুৎবারের বার বেলায় না বেরুলেই ভাল করতে। দিন কাল তো খারাপ। বুড়ো হয়েছি, নইলে—

—নইলে কি?

—এই নিতাই ডোমের কথা বলছি। যৌবন থাকলে অমন দশটা নিতাই ডোমকে এই রূপনারাণের জলে আমি একা চুবিয়ে মেরে দিতুম। বললে মাঝি।

—নিতাই ডোম কে? জিজ্ঞেস করলেন বাবা।

—নিতাই ডোমের নাম শোননি বাবু! আজ কাল তার নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। ছেলে পুলে তার হুঙ্কার শুনলে মুচ্ছো যায়।

—আমিই সে-ই নিতাই ডোম! মাঝির পিছনে দাঁড়িয়ে বললে একটা যমদূতাকৃতি লোক।

লোকটা কখন যে নিঃশব্দে হাল বেয়ে ওপরে উঠে এলো—তা কেউ লক্ষ্যই করেনি। সবাই ভয়ে জড়সড়। কারুর মুখে আর কথাটি নেই।

মাঝি আচম্‌কা মারলে নিতাই ডোমকে এক ধাক্কা। সামলে নিয়ে নিতাই জাপটে ধরলে মাঝিকে। সুরু হলো নৌকার চালের ওপর দুই মহীরাবণের যুদ্ধ। ওদিকে দাঁড়িরা দাঁড় ছেড়ে নিতাই ডোমের সাকরেদদের সঙ্গে মারামারি শুরু করলে। বুড়ো মাঝি কতক্ষণ আর লড়বে জোয়ান নিতাই ডোমের সঙ্গে।

—তুমি আমার বাপের বন্ধু! তাই এ যাত্রা প্রাণে বেঁচে গেলে! মাঝিকে শূন্যে তুলে নদীর জলে ফেলে দিয়ে বললে নিতাই।

—কই! বাবু কোথায় গেল! বলে নিতাই ডোম নৌকার

ছোট্ট ঘরে ঢোকবার জন্য মাথা নীচু করে এক পা এগুলো অমনি তার মুণ্ডটি খসে পড়লো ধড় থেকে।

সর্দারের অবস্থা দেখে তার সাকরেদরা রণে ভঙ্গ দিয়ে টপাটপ্ নদীতে ঝাঁপ দিলে। দু'জন শুধু ধরা পড়লো মাল্লাদের হাতে।

বিয়ে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেতে যাবার সময় বাবা কাতানটা সঙ্গে নিয়েছিলেন—পাঁঠা কাটবাব জন্য। প্রতি বছর কালী পূজোর সময় এই কাতানটা দিয়েই আমাদের বাড়ী পাঁঠা বলি হয়। নিতাই ডোমকে দেখেই বাবা নৌকার ছোট্ট ঘরেব মধ্যে ঢুকে পড়ে বললে আমার ঠাকুরমাকে, মা! এখন উপায়?

—তোমরা সবাই ঐ কোণের দিকে চলে যাও! বলে গাছ-কোমর বেঁধে কাপড়টা পরে নিয়ে ঠাকুরমা দরজাব ঠিক পাশে কাতান উঁচিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলেন।

তখন ঠাকুরমাব মূর্তি দেখে আমরাই ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগলুম।

নিতাই ডোমকে কেটেই ঠাকুবমা অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গেলেন। অত ছোট বেলার কথা ঠিক মনে নেই তবে তাঁর সাহসের জন্য তৎকালীন সরকাব তাঁকে পুরস্কৃত করেছিলেন।

পল্লী অঞ্চলে সরু খালের ভিতর দিয়ে রাত্রিবেলা নৌকা করে যাতায়াত মোটেই যুক্তি-যুক্ত নয়—বিশেষ করে সেই খালেব দু'পাশে যদি জঙ্গল বা প্রান্তর থাকে। মহাজনী নৌকা ও বর-কনের নৌকায় ডাকাতরা সাঁতরে এসে উঠে ভয়াবহ অস্ত্র-শস্ত্র দেখিয়ে গহনা আর টাকা ডাকাতি করে নিয়ে গেছে—এমন ঘটনা বিরল নয়।

বে-ঘাটায় নৌকায় ওঠা আর এক বিপজ্জনক ব্যাপার। নৌকাই যাদের উপজীবিকা তারা কখনও বে-ঘাটায় নৌকা বেঁধে যাত্রী সংগ্রহ করে না। বে-ঘাটায় নৌকা বেঁধে যারা ভাড়া খাটার মতলবে

আছে—আসল মতলব তাদের ভাল নয় তারা চায়—হয় সরকারকে ফাঁকী দিতে আর নয় যাত্রী ফাঁসাতে

জমিদার বন্ধুর বৌভাতে নিমন্ত্রণ খেতে যাচ্ছি আমরা ছু' বন্ধুতে মিলে। খেয়া ঘাটে এসে দেখি পারাপারের নৌকা ছাড়া একটাও যাত্রীবাহি নৌকা নেই। হাঁটা পথে যাওয়াও যুক্তিযুক্ত মনে হলো না—পৌঁছাতে রাত দুপুর হ'য়ে যাবে। তবে নদীর ধার দিয়ে গেলে কিছুটা সময় সংক্ষেপ করা যেতে পারে।

দু' বন্ধুতে মিলে দু'ভরির একটা হার কেনা হ'য়েছে বন্ধুর বউকে উপহার দেবার জন্য। হারটাও সঙ্গে আছে। নদীর ধারে লোকালয় নেই। না গেলে বন্ধু খুবই দুঃখ পাবে। জল্পনা-কল্পনা করতে করতে নদীব ধার দিয়ে বেশ খানিকটা দূর এসে গেছি। আকাশে চাদ উঠলো। ভরসা হলো মনে।

—বাবুরা কুথাকে যাবে গো? একটা চলন্ত নৌকা থেকে জিজ্ঞেস করলে মাঝি।

গন্তব্য স্থানের কথা বলতে শুনে মাঝি বললে, আমরা তো ওর পাশেব গাঁয়েই যাবো।

আমরা আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম। ভাড়ার ঠিক ঠাক না করেই আনন্দের আতিশয্যে আমরা নৌকায় উঠে বসলাম। চাঁদের আলো—ফুর ফুরে ঠাণ্ডা বাতাস—নদীর কলতান—জোছনা ছড়ানো বনানা; আমরা যেন স্বর্গ রাজ্যে বিচরণ করছি। নানা গল্পের পর সন্দাপ গান ধবলে। ভাটিয়ালী গান তার মুখে বড় সুন্দর শোনায়।

গানে আমরা তখন মসগুল হঠাৎ বীভৎস কণ্ঠের আওয়াজ এলো কানে, বাবুরা! ভাড়া দাও।

অসময়ে রসভঙ্গ করায় আমরা বিরক্তই হলাম।

—আগে মহেশপুরে আমাদের নামিয়ে দাও—তবে তো ভাড়া।

মাঝি আর একজনের হাতে হাল দিয়ে এগিয়ে আসতে আসতে কর্কশ কণ্ঠে বললে, মহেশপুরে নয়—মাঝদরিয়ায়।

—তার মানে ?

দেখি—রামদা, ভোজালী, বর্শা নিয়ে মাঝি মাল্লারা আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে গেছে। কাদের পাল্লায় পড়েছি—বুঝতে পারলাম।

—বার কর ভাড়া !

—কত দিতে হবে ? জিজ্ঞাসা করলাম কম্পিত কণ্ঠে।

—ঘড়ি, আঙ্টি, বোতাম, নগদ টাকা—যার কাছে যা আছে সব দিয়ে দাও বাপের সুপুত্তুরের মত।

মন বিদ্রোহী হ'য়ে উঠলো ক্ষণেকের জন্য, কিন্তু বিদ্রোহের পরিণাম কি হতে পারে তা ভেবে আমরা শিউরে উঠলাম। যার কাছে যা ছিল—মায় সেই উপহারের দু'ভরির হারটাকে পর্য্যন্ত—দিয়ে দিলাম।

সব কিছু নিয়ে ডাকাত সর্দার আমাদের বললে, এবার সব মানে মানে নেমে পড়।

—নামবো ! কোথায় নামবো ?

—বলেছি তো—এই মাঝ দরিয়ায়।

সাহস করে সন্দীপ বললে, একি সম্ভব ! আমাদের যেখান থেকে এনেছিলে—অন্ততঃ সেইখানে পৌঁছে দাও !

—আর লোকজন ডেকে তোমরা আমাদের হাতে হাতে ধরিয়ে দাও ! ও সব ফক্কুড়ি চলবে না চাঁদু ! ঝাঁপিয়ে পড় দরিয়ায়।

—জলে ডুবে মরার চেয়ে তোমাদের হাতে মরাই ভালো।

—ডুবে মরবে কেন, সাঁতরে চলে যাও !

—আমরা সাঁতার জানি না।

দয়া পরবশ হ'য়ে সর্দার বললে, দে রে—বাবুদের ঐ কিনারায় নামিয়ে দে।

নিঃস্ব হ'য়ে সেই গভীর রাতে জঙ্গলাকীর্ণ নদীর চরে আমরা নেমে এলাম নৌকা থেকে। গ্রামে ফিরতে ফিরতে রাত প্রায় শেষ হ'য়ে এলো।

ডাকাতি যাদের পেশা—বাধা না পেলে খুন জখম তারা করে না। বাধা দেবার দুর্মতি সেদিন জাগলে—প্রাণ নিয়ে আমাদেব কাকেও আর ফিরে আসতে হতো না।

আদিম একাচারী মানুষের হত্যাই ছিল পেশা। প্রয়োজনের তাগিদে হত্যা তাদের করতেই হতো। বেঁচে থাকবার জন্য শুধু পশু নয়—মানুষকেও তারা হত্যা করতো। শুধু প্রতিদ্বন্দ্বীতার জন্যই নয়—নরমাংসে ক্ষুৎনিবারণের জন্যও।

সভ্য জগতে মানুষের অবচেতন মনে হত্যা করার সেই অপ-স্পৃহা আজও সুপ্ত হ'য়ে আছে। সাময়িক উন্মাদনায় জাগ্রত হয় তাদের এই অপ-স্পৃহা, মানুষ দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে হত্যা করে। এবা স্বভাব অপরাধী নয়—তাই পরে এদের মনে জাগে অনুতাপ, অনুশোচনা। কিন্তু জন্ম-অপরাধীরা হত্যা-করাটাকেই তাদের পেশা বলে ধরে নেয়। প্রয়োজনের তাগিদে হত্যা করতে এরা একটুও দ্বিধা করেনা বা এটাকে দোষের কাজ বলেও মনে করে না—ঠিক সেই আদিম একাচারী মানুষের মত।

কানপুরে রহস্যজনক হত্যা।

কানপুর শহরে প্রকাশ্য রাস্তাব উপর একদিন ভোরে একটি লোককে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেল। লোকটার সারা দেহে আঘাতের কোন চিহ্ন নেই শুধু রগের কাছে একটি গভীর ক্ষত। কেউ তাকে রগে ছুঁচলো হাতুড়ি মেরে হত্যা করেছে।

পরের দিন পার্কের ধারে ফুটপাথের ওপর আর একটি লোককে

ঠিক ঐ একই অবস্থায় পাওয়া গেল। তাকেও রগে আঘাত করে হত্যা করা হ'য়েছে।

পরের দিন পাওয়া গেল দুটো লাস, একটা মরে পড়ে আছে বাজারের ধারে আর একটা কোন এক বাড়ীর বাইরের ছোট্ট রকের ওপর।

দিনের পর দিন 'রগে মেরে হত্যা' কাণ্ডের আর বিরাম নেই। আতঙ্কিত হয়ে উঠলো কানপুর শহর। হত্যাকারীকে ধরবার জন্য পুলিশের তৎপরতার অন্ত নেই। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না।

কি উদ্দেশ্যে যে এই হত্যাকাণ্ড দিনের পর দিন ঘটে চলেছে তাও বোঝা যাচ্ছে না, টাকা পয়সা অপহরণের জন্য এ হত্যাকাণ্ড নয়।

হত ব্যক্তিদের একটি পয়সাও হত্যাকারী নেয়নি তা তাদের দেহ ও জামা-কাপড় তল্লাসী করে বোঝা যায়। নগদ টাকা, হাতে সোনার পদক, গলার হার; আঙটি, ঘড়ি, সোনার বোতাম—সবই ঠিক আছে। তবে কিসের জন্য দিনের পর দিন এই নৃশংস নর-হত্যা? কি এর কারণ? অবশ্য হত্যা যে এর পেশা নয় তা অনুমানেই বোঝা যায়।

আক্রোশ জনিত খুন এ নয়। একটা লোকের এতগুলি বিভিন্ন স্তরের লোকের ওপর আক্রোশ থাকতে পারে না। হত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ কুলি, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল, কেউ ঠিকে গাড়ীর গাড়োয়ান আবার কেউ বা সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী।

কারণ একটা নিশ্চয় কিছু আছে। বিনা কারণে খুন একমাত্র পাগলেই করে থাকে। কিন্তু লোক চক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করে পাগল তো হত্যা করে না। পাগল যা কিছু করে—সবই প্রকাশ্যে।

ভিখারীর ছদ্মবেশে গোয়েন্দা পুলিশ শুয়েছিল বাজারের ধারে। গভীর রাত। সাইকেল চালিয়ে এ পাশ ও পাশ চাইতে চাইতে একটা লোক এসে বাজারের ধারে নামলো। সাইকেলটা গাছে ঠেস

দিয়ে রেখে পকেট থেকে বার করলে একটা ছুঁচলো হাতুড়ি। হাতুড়িটা পিছনে লুকিয়ে এগিয়ে গেল একটা ঘুমন্ত লোকের দিকে। ঘুমন্ত লোকটার রগ লক্ষ্য করে হাতুড়ি তোলার সঙ্গে সঙ্গে গোয়েন্দা পুলিশ পিছন থেকে সজোরে তার হাত চেপে ধরলে। সুরু হলো ধস্তাধস্তি। অন্য একজন গোয়েন্দা হুইসিল দিয়ে ছুটে এলো তার সহকর্মীকে সাহায্য করবার জন্য।

ধরা পড়লো হত্যাকারী।

হত্যাকারী একজন স্বর্ণ শিল্পী। শহরে তার দুটো বড় বড় সোনা-রূপোর দোকান। ধনী লোক। লেখাপড়াও কিছু জানে। সংসারে স্ত্রী আছে, পুত্র কন্যা আছে আর বেঁচে আছে তার বুড়ো মা।

কিছুদিন হলো—তার মাথায় এই অকারণ হত্যা-স্পৃহা জেগেছে। দিনের বেলায় সে স্বাভাবিক মানুষ। কাজকম করে, লোকজন নিজের কারবারে খাটায়; টাকা পয়সার হিসাব-নিকাশ করে আগেকার মত। কোন বদ খেয়ালই তার মাথায় আসে না। কিন্তু সন্ধ্যা হলেই তার মনে জাগে অদম্য অপ-স্পৃহা। কোন একজনকে খুন না করা পর্য্যন্ত তার আর স্বস্তি নেই।

এতদিন সৎভাবে জীবন যাপন করে হঠাৎ তার মনে এই অপ-স্পৃহা জাগলো কেমন করে? অনুসন্ধানে জানা গেল ঃ— তার একটি পোষা ময়না ছিল। সেই ময়নাটাকে মেরে ফেলে একটা বিড়াল। সেদিন রাত্রে বিড়ালটাকে ধরে তার রগে ছুঁচলো হাতুড়ির ঘা বসিয়ে দিয়েছিল ঐ স্বর্ণকার। সেইদিন থেকে হাতুড়ি মেরে হত্যা-স্পৃহা জেগেছে তার মনে। এই জঘন্য নিষ্ঠুরতম অপকার্যের জন্য দিনে দিনে তার মনে জাগে অনুশোচনা। অনুতপ্ত হ'য়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে যে এমন কাজ আর সে করবে না। কিন্তু অন্ধকার নামলেই ভুলে যায় সে তার প্রতিজ্ঞার কথা। হাতুড়ি পিটে মানুষ না মারা পর্য্যন্ত সে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে পারে না।

স্বর্ণকারের মায়ের কাছ থেকে জানা গেল ঃ—খুঁচিয়ে বা হাতুড়ির ঘা দিয়ে ছেলেবেলায় তাঁর পুত্র ছোট-খাটো জীব-জন্তু মারতে ভালবাসতো। আঘাত হানতো সে মাথায়—অন্য কোথাও নয়। ধর একটা ব্যাঙ ধরে নিয়ে এলো, ছুঁচলো একটা হাতুড়ি বা ঐ জাতীয় ভারি কোন একটা জিনিষ দিয়ে ব্যাঙটির বগে আঘাত করলে। ব্যাঙটা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতো আর তাঁর গুণধর পুত্র হাততালি দিয়ে নাচতো। ইঁদুর, পাখী, বেড়াল ফাঁদ পেতে ধরতো আর এমনি নৃশংস ভাবে তাদের মেরে আনন্দ উপভোগ করতো। এর জন্য তিরস্কার, মার-ধোর—কিছুতেই কিছু হয়নি। একদিন একটা ছাগলকে এই ভাবে মারার জন্য দু'দিন তাকে না খেতে দিয়ে ঘরে তালা বন্ধ করে রাখা হ'য়েছিল।

বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ দুষ্প্রবৃত্তি তার মন থেকে মুছে যায়। ও রকম নৃশংস ভাবে জীব হত্যা করে আনন্দ উপভোগ করতে কেউ তাকে দেখেনি

ছেলে বেলায় অমন অনেক কিছু দুষ্টুমি ছেলেরা করে থাকে, বড় হলে সে সব কথা ভুলে যায় বা কখন-সখন মনে পড়লে লজ্জিত হয়। তা এই স্বর্ণকারের বেলা সেটা উল্টো হলো কেন?

এই স্বর্ণশিল্পীকে একপক্ষে জন্ম-অপরাধী বলা যেতে পারে। জন্মেছিল সে জাগ্রত অপ-স্পৃহা নিয়ে। তাই ছেলেবেলা থেকে খেলাই হচ্ছে তার জীব-জন্তু হত্যা। খেলায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যে আনন্দ পায়—সে আনন্দ তারা আর কিছুতে পায় না। ঐ স্বর্ণশিল্পীর কাছে জীব-হত্যাই ছিল—খেলা, ঐ খেলা খেলে যে আনন্দ সে পেতো—তা আর কোন খেলায় পেতো না। শিক্ষা, সংস্কার, পরিবেশ, সংপ্রেরণা দাবিয়ে রেখেছিল তার দুষ্প্রবৃত্তিকে। সাময়িক ভাবে সুপ্ত হ'য়েছিল তার অপ-স্পৃহা। অবচেতন মন থেকে চিরতরে মুছে যায়নি—হত্যা করার প্রবৃত্তি বা বাসনা।

পরিণত বয়সে ক্রোধের বশে জেগে উঠলো সুপ্ত অপ-স্পৃহা—,

নির্মম ভাবে হত্যা করলে পক্ষী-হত্যাকারী বিড়ালটাকে। ঐ বিড়াল হত্যাই হলো তার কাল। খুন চাপলো তার মাথায়। দিনের বেলা ভুলে থাকতো নানা কাজে কিন্তু রাত্রি নামলেই কোন এক অশরীরি দুষমণ তাকে দিয়ে হত্যা-সংঘটিত করিয়ে তবে ছাড়তো।

জন্তু জানোয়ারকে যন্ত্রণা দিতে বা হত্যা করে আনন্দ পেতে দেখা যায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের। কিন্তু তারা ভবিষ্যৎ জীবনে সবাই কি খুনী হয়?

তারা তো জনে জনে জন্ম-অপরাধী নয়। জাগ্রত অপরাধ-স্পৃহা নিয়ে তারা জন্মগ্রহণ করে না ছেলেবেলায় নিষ্ঠুরতার পরিচয় যা দেয়—তা হচ্ছে সে-ই আদিম একচারী নৃশংস মানুষের রক্তের ছোঁয়াচ ছাড়া আর কিছুই নয়। অপ-স্পৃহা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে জগতের প্রতিটি মানুষ। সেই অপ-স্পৃহা সাধারণতঃ পারিবেশের তারতম্য অনুসারে জাগ্রত হয় অথবা সুপ্তই থেকে যায়।

অভাবের মর্মান্তিক তাড়না, ক্ষুধার তীব্র জ্বালা মানুষকে সাময়িক ভাবে এমনি উন্মাদ করে তোলে যে—মানুষ খুন করতেও তখন দ্বিধা করেনা। সুপ্ত অপ-স্পৃহা হঠাৎ জাগ্রত হ'য়ে তাকে দিশেহারা করে দেয়। যে নিষ্ঠুরতম কাজ কোনদিন সে কল্পনাও করেনি—তাই করে বসে দিক্ বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হ'য়ে।

পিতা কর্তৃক ক্ষুধার্ত পুত্র হত্যা।

কলকাতা। গ্রে ষ্ট্রীট আর চিত্তরঞ্জন এ্যাভিন্যুর সংযোগ স্থলে ফুটপাথের ওপর প্রকাশ্য দিবালোকে পিতা কর্তৃক পুত্র হত্যা।

ট্রাম বাস অচল। রাস্তা, ফুটপাথ লোকে লোকারণ্য।

সাত-আট বছরের একটি শীর্ণকায় ছেলে মৃত অবস্থায় ফুটপাথের ওপর উপুড় হ'য়ে পড়ে আছে। তার মুখ থেকে রক্ত বেরিয়ে জমাট বেধে গেছে ফুটপাথের ওপর। মাথায় হাত দিয়ে ফুটপাথের ওপর উবু হ'য়ে বসে ছেলেটির দিকে চেয়ে যে লোকটি চোখের জল

ফেলছে—সেই তার হত্যাকারী পিতা। ঠ্যাঙ্ ধরে তুলে ফুটপাথের ওপর আছাড় মেরে লোকটা মেরে ফেলেছে তার একমাত্র পুত্রকে।

পিতা হ'য়ে নিরপরাধ বুভুক্ষু পুত্র-হত্যা—অমার্জনীয়, জঘন্যতম অপরাধ নয় কি ?

গ্রাম-দেশে খেতে না পেয়ে রুগ্ন স্ত্রী আর দুটি পুত্রের হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে এই শহরে এসে ফুটপাথে আশ্রয় নেয় হত্যাকারী, ভিক্ষাই হয় একমাত্র উপজীবিকা। এক রকম উপোস দিয়েই স্ত্রী মারা গেল—কিছুদিন পরে ভিক্ষে চাইতে গিয়ে গাড়ী চাপা পড়ে মারা গেল একটি ছেলে। বাকি যেটি ছিল—সেটিকে মারলে সে নিজের হাতে।

প্রায় দু'দিন কলের জল ছাড়া বাপ-বেটার পেটে কিছুই পড়েনি। তিন দিনের দিন সকালে গোটা তিনেক নয়া পয়সা জুটলো ভিক্ষে করে। তিন নয়া পয়সার মুড়ি কিনে দু'বাপ বেটায় খেয়ে কলে গিয়ে এক পেট করে জল খেয়ে এলো। না খেয়ে খেয়ে ছেলেটার প্রায় অর্দ্ধমৃত অবস্থা। ফুটপাথে গাছের ছায়ায় ছেলেটাকে শুইয়ে রেখে হত্যাকারী বেরুলো ভিক্ষে করতে বা একটা চাকর-বাকরের কাজের সন্ধানে। বাড়ী বাড়ী ঘুরে চাইলো হয় কিছু ভিক্ষা আর নয় একটা চাকরের কাজ। না মিললো ভিক্ষা আর না মিললো চাকরি, ভিক্ষা বা চাকরির বিনিময়ে মিললো প্রহার। চোর অপবাদ দিয়ে এক গৃহকর্তা তাকে মেরে তাগিয়ে দিলে।

নিজের জীবনের ওপর ধিক্কার এসে গেল লোকটার। মনে মনে বললে, নেই—নেই—ভগবান নেই। যদিও থাকে—তবে সে ভগবান গরীবের ভগবান নয়, বড়লোকের ভগবান !

দুঃখে, অপমানে জর্জরিত পিতা রিক্ত হস্তে ফিরে এলো ম্লান মুখে। পিতাকে দেখে আশান্বিত কণ্ঠে ক্ষুৎকাতর পুত্র বললে, বাবা ! বড্ড খিদে পেয়েছে !

ব্যস্—আর যায় কোথা ! জন্মদাতা এগিয়ে গিয়ে পুত্রের দুটি

পা ধরে আছাড়ের পর আছাড় মারতে মারতে বললে, খাবি—খাবি—আর খেতে চাইবি। যা—জন্মশোধের খাওয়া খাইয়ে দিলুম!

পুত্রহন্তা ছুঁড়ে ফেলে দিলে হাড়-গোড় ভাঙা ছেলেটাকে রাস্তার ওপর।

পথচারী দর্শকরা (দীন দরিদ্র বুভুক্ষুকে একটা নয়া পয়সা যারা কোন দিন হাত তুলে দেননি) মন্তব্য করলেন, হারামজাদাকে শূলে দিলেও ঠিক ওর উপযুক্ত শাস্তি হয় না।

সাময়িক উত্তেজনা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা বিশ্লেষণ করে বিচারক পুত্রহন্তাকে চরম শাস্তি না দিয়ে—দিলেন কয়েক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। আসামী কিন্তু তা চায়নি, সে চেয়েছিল চরম নিষ্কৃতি।

হত্যাকারীর ওপর কোন সহানুভূতি থাকতে পারে না—থাকা উচিত নয়। তাতে সমাজ ও রাষ্ট্র হবে বিপন্ন, রাষ্ট্র-শৃঙ্খলা হবে বিপর্য্যস্ত। অতএব রাষ্ট্রের প্রতিটি লোকের কাম্য হবে—দুষ্কৃতকারীর দণ্ড।

দেখা গেছে—যে দেশ যত সমৃদ্ধ—সেই দেশে অপরাধ ও অপরাধীর সংখ্যা তত কম। যে দেশ দুঃখ, দারিদ্রে জর্জরিত, যে দেশের সংখ্যাতীত বেকার সমস্যা সমাধান করতে সরকার অসমর্থ—সেই দেশে অপরাধ ও অপরাধীর সংখ্যা সব চেয়ে বেশী। অতএব অবস্থা বিশ্লেষণ করে শাস্তির বহর কমালে অপরাধ ও অপরাধীর সংখ্যা কমবে না কোনদিন। যতদিন না সরকার বেকার সমস্যা ও অন্নসমস্যার সমাধান করতে পারবে।

দেশের অন্নসমস্যা ও বেকার সমস্যার সমাধান করতে যে সরকার অসমর্থ—তার উচিত বাধ্যতামূলক জন্মনিয়ন্ত্রণ করা। উৎপন্ন খাদ্যের তুলনায় দেশের জনসংখ্যা যদি বেশী হয় তাহলে খাদ্যাভাব, অন্নসমস্যা অবশ্যম্ভাবী। জন্ম যদি নিয়ন্ত্রিত করা না হয় তাহলে জনসংখ্যা যে অনুপাতে বাড়বে—চাকরীর সংখ্যা কি সে অনুপাতে বাড়বে? চাকরীর সংখ্যার একটা সীমা আছে—কিন্তু জন্ম-নিয়ন্ত্রণ

করতে না পারলে সংখ্যাতীত ক্রমবর্দ্ধমান বেকার সমস্যার সমাধান স্বপ্নাতীত।

শুধু অভাবের তাড়নাতেই মানুষ খুন করে না—স্বভাবের তাড়নাতেও মানুষ খুন করে থাকে। স্বভাবের তাড়না অর্থে—আত্মতৃপ্তির জন্য মানুষ বিনা স্বার্থে (অবশ্য আত্ম-তৃপ্তিকে যদি স্বার্থ হিসাবে ধরা যায় তাহলে অন্য কথা) অবলীলাক্রমে নরহত্যা করে। একটার পর একটা মানুষ মারতে অভ্যস্ত হবার পর—এই ধরণের অভ্যাস অপরাধীরাই পরিণত হয় স্বভাব অপরাধীতে।

আদালত কক্ষ লোকে লোকারণ্য।

হত্যাকারী একজন জ্ঞানী, গুণী, শিক্ষাবিদ। এক আধটি নয়—আজ পর্য্যন্ত কত গণ্ডা যে তিনি হত্যা করেছেন তার কোন ইয়ত্তা নেই। হত্যা যাদের করেছেন তারা সকলেই শিশু, বয়স তাদের দু'মাস থেকে দু'বছর। অস্ত্র-শস্ত্রের সাহায্যে হত্যা নয়—শ্বাসরোধ করে হত্যা।

প্রথম তাঁর হাতে খড়ি হয় একটি বছর ছয়েকের ছেলের ওপর দিয়ে। ছেলেটির সঙ্গে অস্বাভাবিক সংসর্গ করার ফলে—ছেলেটি জখম হয়। তাঁর এই অপকার্য্যের কথা সাধারণে প্রকাশ হবার ভয়ে তিনি গলা টিপে বালকটিকে হত্যা করেন। দু'হাত দিয়ে বালকটির গলায় একটু একটু করে চাপ দেন আর দেখেন—কি ভাবে ছেলেটির চোখের তারা দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে—জীব বেরিয়ে পড়লো কতখানি। ছেলেটির চোখ মুখের বীভৎসতা হত্যাকারীর চোখে মুখে ফুটিয়ে তোলে বীভৎস, নারকীয় আনন্দ।

সাঁড়াশীর মত দু'হাত দিয়ে চেপে ধরা গলায় একটু আলগা দিয়ে দেখেন—ছেলেটির মুখের চেহারা, আবার পর মুহূর্তে সজোরে চাপ দিয়ে দেখলেন—কি ভাবে পরিবর্তিত হলো—আরো কতখানি ভয়ঙ্কর হ'য়ে উঠলো তার মুখ চোখের অবস্থা। এই ভাবে দণ্ডে দণ্ডে, তিলে-তিলে মেরে ফেললেন ছেলেটাকে শ্বাস রোধ করে।

শিক্ষক হিসাবে সর্বত্র তাঁর গতিবিধি, সবাই তাঁকে সম্মান করে। শিশু দেখলেই তাঁর লোভ হয়। তাকে গলা টিপে মারবার অদম্য বাসনা জাগে তাঁর মনে। সুযোগ পেলেই তিনি শিশুহত্যা করে তাঁর বাসনা পরিতৃপ্ত করেন। শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় ছোট, বড় শিশুদের চোখ ছুটো যখন ঠিকরে বেরিয়ে আসে—কপালের শিরা-উপশিরা-গুলো রক্তের চাপে স্ফীত হ'য়ে ওঠে—কচি নরম জীভ ঝুলে পড়ে কতখানি অথবা কিভাবে মুখেব ভেতর গুটিয়ে যায়—তা তিনি বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দেখে অনির্বচনীয় পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করে থাকেন।

শিশু হত্যার নেশা তাকে পেয়ে বসলো। বছবেব পর বছর তিনি শিশু-হত্যা অভিযান নির্বিবাদে, নিঃসঙ্কোচে চালিয়ে আস-ছিলেন, ধরা পড়লেন নিজেব ছেলেকে মেবে।

শবদাহ ঘাটের ডাক্তাব মৃত শিশুর চেহাবা দেখে সন্দীহান হ য়ে তাকে পোষ্টমর্টম কবতে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানেই ধরা পড়লো যে শিশুটিব স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি. তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা কবা হ'য়েছে। শিক্ষকেব কথার ওপব বিশ্বাস করে যে ডাক্তার ডেথ-সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন—বিনা দোষে তিনিও জড়িয়ে পড়লেন। কিন্তু খুনী কে? শিক্ষক হয় নিজে হত্যা করেছেন আর নয় তিনি জানেন হত্যাকাবী কে। ডাক্তাবের জবানবন্দীতে তা-ই অনুমিত হচ্ছে। শেষ পর্য্যন্ত কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়লো। প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে তাঁর দশ বছরের কন্যা সব কথা ফাঁস করে দিলে। সে জানলার ফাঁক দিয়ে দেখেছে এই হত্যাকাণ্ড এবং চুপি চুপি মাকেও বলেছে। জেরার মুখে—কোন কথাই আর অপ্রকাশ্য রইলো না। হত্যা করার সময় শিশুটির নাক মুখ দিয়ে সামান্য রক্ত বেরিয়েছিল, সেই রক্ত মাখা বালিসের ঢাকাটা পাওয়া গেল তাদেরই ঘরের শো-কেসের পিছন থেকে। হত্যাকাণ্ড যখন সঙ্ঘটিত হয়—শিশুটির মা তখন গিয়েছিলেন কালী ঘাটে পৌষ-কালী দর্শনে।

এ হেন কল্পনাতীত হত্যাকারীর বিচার-দৃশ্য দেখার জন্য আদালত কক্ষে জনসমাবেশ হওয়া কিছু বিচিত্র নয়।

হত্যা সঙ্ঘটিত হয় আক্রোশে এবং বিনা আক্রোশে। বিনা আক্রোশে খুন-খারাপী হ'য়ে থাকে অর্থের জন্য। অর্থ আত্মসাৎ করবার জন্য হত্যাকারী বিষ প্রয়োগ করে অথবা বল প্রয়োগে হত্যা করে। এই বলপ্রয়োগ ব্যাপারে দরকার হলে অস্ত্র-শস্ত্রের সাহায্যও নিয়ে থাকে।

বিনা অস্ত্রে শুধু বলপ্রয়োগে মাত্র একজন ব্যক্তি ছল-চাতুরি-কৌশলের সাহায্যে নরহত্যা করেছে—এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

কোঠা বস্তীবাড়ীর বাসীন্দা অভ্যাস-বেশ্যারা সন্ধ্যার সময় 'ছুটো' করে থাকে। এ সময় পছন্দসই লোককে অর্থের বিনিময়ে তারা ঘরে নিয়ে যায়। দর দাম হয় সময়ের অনুপাতে। মোটা টাকা পেলে সারা রাতের অতিথিকেও তারা বিমুখ করে না।

এ হেন বস্তীবাড়ীর বাসীন্দা 'বীণা'কে তার ঘরে মৃত অবস্থায় দেখা গেল একদিন ভোরবেলা। থানায় খবর দেওয়া হলো।

পুলিশ-অফিসাররা এলেন তদন্তে। মৃতার ফটো নেওয়া হলো। মদের গ্লাস আর বোতলের গায়ে আঙুলের ছাপ পরীক্ষার জন্য গ্লাস আর বোতল অতি সাবধানে পাঠিয়ে দেওয়া হলো Finger Print Department এ।

পোষ্টমর্টম পরীক্ষার জন্য মেয়েটিকেও পাঠানো হলো যথাস্থানে।

অনুসন্ধানে দেখা গেল—গহনা আর টাকা পয়সা সবই অপহৃত হ'য়েছে। একখানি রুমাল পাওয়া গেল। তার ওপর নীল সূতো দিয়ে লেখা—'সাবিত্রী'।

আঙুলের ছাপ পরীক্ষাগারের রির্পোটে জানা গেল—ঐ ছাপ কোন একটি দাগী দুষ্কৃতকারীর। পোষ্টমর্টম পরীক্ষায় জানা গেল

—দৈহিক সঙ্গমের ঠিক পর মুহূর্তে অথবা সঙ্গম রত অবস্থায় গলাটিপে 'বীণা'কে হত্যা করা হ'য়েছে।

রুমালে ছিল লণ্ডীর 'মার্কা'। সেই সূত্র ধরে গঙ্গা পারের কোন একটি বস্তি-বাসিনী পতিতা 'সাবিত্রী'র ঘরে গ্রেফতার করা হলো হত্যাকারীকে।

হত্যাকারী তার ডাইরীতে লিখে রেখেছিল :—সেদিন পলটুগুণ্ডা আমাদের নিয়ে স্ফূর্তি করতে গেসলো বীণাব ঘরে। যেমনি বেটির রূপের বহর—তেমনি বেটির গয়নার বহর। উনি আবার সতী-খানকি, মদ খান না। গয়না দেখে বন্ধুদের সব চোখ ঠিকরে গেল। বললে,—একদিন সবাই মিলে এসে বেটিকে শেষ করতে হবে।

একটা মেয়েছেলেকে শেষ করতে—এক সঙ্গে এতগুলো লোক যাওয়া মানেই কাপুরুষতা। তাই দিন তিনেক পরে কাকেও কিছু-না বলে আমি একাই গিয়ে হাজির হলাম বীণা বিবির ঘরে। আমাকে দেখেই বীণা চিনতে পারলে। চাকরকে দিয়ে মদ আনালে, সোডা আনালে। সিগারেট আমার কাছেই ছিল। বীণা মদ খায় না কিন্তু সিগারেট খায়। আমার ধরানো সিগারেটটা হাত থেকে নিয়ে টানতে সুরু করলে। এ কথা, সে কথার পর হারমোনিয়ম নিয়ে গান গাইতে বসলো। তার অলক্ষ্যে মদের গ্লাসে সিগারেটের ছাই মিশিয়ে দিলাম।

—কখনো তো কারুর অনুরোধ রাখনি, আজ নয় ক্ষেমা ঘেন্না করে এই গরীবের অনুরোধটা রাখলে! ঘনিষ্ঠ হ'য়ে বললাম বীণাকে।

এক লহমার জন্য কি যেন ভাবলে—ঢক ঢক করে খেয়ে ফেললে সেই ছাই মেশান মদ।

আমার উদ্দেশ্য সন্ধ্যে সন্ধ্যে কাজ শেষ করে বাড়ীর সবাই জেগে থাকতে থাকতে তাদের চোখের সামনে দিয়ে সরে পড়া। ভোর রাত্রে এ সব বাড়ী থেকে বেরুলেই বাড়ীর লোক সন্দেহ করে কিন্তু

সন্ধ্যে রাত্রে কেউ কারুর খোঁজ রাখে না। সবাই তখন নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। তা ছাড়া খুন করে সবার চোখের সামনে দিয়ে বুক ফুলিয়ে বেরিয়ে যাবো—এটাই পৌরুষ।

ঘড়িতে দেখলাম—ন'টা বাজে। না—আর দেরী করা ঠিক নয়। শুভস্য শীঘ্রম। এরি মধ্যে পেগের পর পেগ টেনে বীণার অবস্থা প্রায় কাহিল।

—রাত হচ্ছে না!

আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বীণা মুচকি হেসে বললে, বৌ'কে বুঝি বড্ড ভয় করে? ঢালো আর খানিকটা!

—তা একটু ক'রি বই কি! বলতে বলতে গ্লাসে কড়া করে দিলাম এক পেগ।

—কেন, রায় বাঘিনী বুঝি! বলে গলায় ঢেলে দিলে বীণা সব মদটা।

কথা না বাড়িয়ে আমি শুধু একটু হাসলাম। বীণা টলতে টলতে গিয়ে পর্দা সরিয়ে ঘরের দরজা দুটো ভেজিয়ে দিলে। উটকো বাবু ঘরে থাকলে এরা খিল দেয় না—ভয়ে। বিপদে পড়লে খিল খুলে তাড়াতাড়ি বেরুতে অসুবিধা হবে এবং খিল দেওয়া থাকলে চেঁচামেচি শুনেও বাইরের লোক ঘরে ঢুকতে পারবে না—তাই খুব পরিচিত লোক না হলে ঘরের দরজা এরা ভেজিয়েই দেয়।

সন্দেহ করার ভয়ে আমিও তাকে খিল দিতে বললাম না। বীণা সাদা বাতি নিবিয়ে বেড-সুইচটা অন্ করে দিলে।

বীণার যৌনস্পৃহা যথাসম্ভব জাগ্রত করে আমি তার সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হলাম। বীণা উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো—যা সাধারণতঃ উট্‌কো লোকের সংশ্রবে হয় না। মত্ত বীণার সেই উন্মত্ততার সুযোগ নিয়ে কায়দা করে দু'হাত দিয়ে নির্মমভাবে টিপে ধরলাম তার গলা। বেশ খানিকটা ধস্তাধস্তির পর বীণা নিস্তেজ হ'য়ে নেতিয়ে পড়লো। নিঃসন্দেহ হবার জন্য আবার গায়ের জোরে তার গলাটা টিপে ধরে

ঝাঁকানি দিলাম। নাঃ আর সন্দেহ
খিল দিলাম। তাড়াতাড়ি তার গা সংসারটা চলবে কি করে
নিলাম। সো-কেসের চাবিটা খুলে নিলাম
সো-কেস খুলে বার করলাম বাকি গয়না আর টাকা কথায় যে আর
ভরলাম বীণারই একটা পাশ বালিসের খোলে। বামাল সং
বেল্টের মত করে কোমরের সঙ্গে বেঁধে জামা গায়ে দিয়ে দরজার
খিলটা খুলে বেরিয়ে এলাম। আসবার সময় দরজাটা ভেজিয়ে
দিলাম। সিঁড়ির মুখে দেখি—চাকরটা বসে আছে বোধ হয় তার
মনিবের আদেশের প্রতীক্ষায়। একখানা দশটাকার নোট তার হাতে
দিয়ে বললাম, নোটটা ভাঙিয়ে নিয়ে আয়। বখশিস দেবার মত
খুচরো টাকা নেই বাবা

চাকরটা আনন্দে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল নোট ভাঙাতে আর
আমিও তার পিছু পিছু এসে সট্ করে সদর দরজা পেরিয়ে রাস্তায়
নামলাম। বরাতক্রমে সামনা-সামনি ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম।

পরের দিন খবরের কাগজ দেখে এসে পলটু বললে, দিয়ে —
বীণা শালিকে সাবড়ে দিয়েছে! তবে হ্যাঁ—যে ব্যাটা সাবড়েছে—
সে নির্ঘাত বাপের বেটা! সাবাস। বীণার মত অমন জাঁদরেল
একটা দশাসই মেয়েছেলেকে ঘায়েল করা কি একলা একজনের পক্ষে
সম্ভব!

পলটুগুণ্ডা স্বীকার করেছে যে বীণার' হত্যাকারী—একজন
সত্যিকার 'পুরুষ'!

প্রকারান্তরে—আমি পলটুর দলকে দেখিয়ে দিলাম যে আমার
স্থান তাদের সবার ওপরে।

বীণার হত্যাকারীর ডাইরীতে লেখা প্রতিটি ছত্রে 'দাম্ভিকতা,'
'বীরত্ব' পূর্ণ মাত্রায় পরিস্ফুট। দাম্ভিকতা দেখিয়েই এরা অনেক
সময় নিজেদের বিপদ নিজেরা ডেকে আনে। দাম্ভিকতা প্রকৃত
অপরাধীদের এক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য!

আক্রোশ-প্রসূত হত্যা প্রায়ই পূর্ব পরিকল্পিত হ'য়ে থাকে। সাময়িক উত্তেজনা-প্রসূত হত্যার চেয়ে এই পূর্ব-পরিকল্পিত হত্যা অতি বড় সাঙ্ঘাতিক। আক্রোশ-প্রসূত হত্যা এক বা একাধিক লোকের দ্বারা হ'য়ে থাকে। যৌনজ, সম্পত্তিক বা সম্ভ্রম সংক্রান্ত ব্যাপারেই আক্রোশ-প্রসূত হত্যা সঙ্ঘটিত হয়। টাকা-কড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারেও আক্রোশ-প্রসূত হত্যা ঘটে থাকে তবে কম। কেউ কাকেও অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে ফাঁকি দিলে, প্রবঞ্চিত করলে— আক্রোশ বশে প্রবঞ্চককে হত্যা করে প্রতিশোধ গ্রহণের কথাও শোনা গেছে।

পল্লী গ্রাম।

জাতে তারা চাষী-কৈবত্ত। সংসারে মা (৩৬ বছর) বড় ছেলে ২২ বছর) মেজ ছেলে (১৮ বছর) মেয়ে (১০ বছর)। বড় ছেলের সম্প্রতি বিয়ে হ'য়েছে। বৌ গেছে বাপের বাড়ী। মেজ ছেলেটি বেকার, বড় ছেলে চাকরি করে কাপড়ের কলে। সে প্রতি সপ্তাহে শনিবার বাড়ী আসে— সোমবার ভোরে চলে যায়।

তাদের এক জ্ঞাতি মামা (৩৬ বছর) আছে। বছর খানেক হ'লো—সংসারের গৃহিণী মাতঙ্গিনীর সঙ্গে ঐ জ্ঞাতি মামার অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। পাশের গাঁয়ে ঐ জ্ঞাতি মামা নগেনের বাড়ী। শনি আর রবিবার দিনের বেলা আর অন্যদিন গভীর রাত্রে তিনি মাতঙ্গিনীর বাড়ী আসেন আর ভোর বেলা চলে যান। দিনের বেলা অবশ্য প্রকাশ্যেই এসে থাকেন যখন তখন।

ক্রমেই পাড়ায় জানাজানি হ'য়ে গেল ব্যাপারটা। বড় ছেলে জগুর কানেও কথাটা গেল।

—নগেনমামাকে আমাদের বাড়ী আসতে মানা করো মা! পাঁচজনে পাঁচ কথা বলছে। জগু বললে তার মাকে।

—মানা তো করবো কিন্তু এত বড় সংসারটা চলবে কি করে শুনি, তোর একার রোজগারে সংসার চলে ?

—তা তো চলে না বুঝি, কিন্তু পাড়াব লোকের কথায় যে আর কান পাতা যায় না।

—খেতে না পেলে পাড়ার লোক তো এক বেলা পাত পাড়তে ডাকবে না। ও সব কথায কান দিস কেন !

—দিনের বেলা নগেনমামা আসে আসুক কিন্তু রাত্রে যেন না আসে ! দৃঢকণ্ঠে বললে জগু।

নৈতিক অসাড়তার জন্য মাতঙ্গিনা নিলজ্জকণ্ঠে পুত্রকে বললে, বাতি না আসতে পেলে কেউ বিনা স্বার্থে পয়সা দেয় !

—ও বকম পাপেব পয়সা আমবা চাই না। আমি দেবো না নগেনমামাকে আমাদের বাড়ী আসতে। কাল থেকে গুপে আমাব সঙ্গে কাজে বেরুবে। দু'ভায়েব রোজগাবে আমাদেব সংসার হেসে খেলে চলে যাবে। বললে জগা গুপেকে আসতে দেখে।

তেবিয়া মেজাজে গুপে বললে, ওসব কাজ-ফাজ এখন আমায় দিয়ে হবে না। নগেনমামার কেলাবে যাত্রাগানেব রিয়েসাল হচ্ছে। আসছে মাসে মিত্তিব বাড়ীতে পেলে।

—সংসাব আগে—না যাত্রাগান আগে ?

—ও সংসাব-টংসাব আমি বুঝি না। খেতে না পাই—নগেন-মামাব বাড়ী আটকে বাঁধা !

ক্রুদ্ধকণ্ঠে জগা বললে, আমি তোকে এই শেষবাব বলে দিচ্ছি—তুইও যাবি না নগেনমামাব বাড়ী আব নগেনমামাও আসবে না আমাদেব বাড়ী !

—এঃ বাড়ী তোমার একাব কিনা ! তাচ্ছিল্য ভবে বললে গুপে।

মাতঙ্গিনী ফোড়ন দিয়ে বললে, তাই—না—তাই। ওর একার কেনা কেলে বাড়ী।

—বাড়ী আমার কিনা তা পরে বোঝা যাবে। নগেনমামা এ বাড়ীতে ঢুকলে যদি তার ঠ্যাঙ্‌ না ভাঙি তবে আমি এক বাপের বেটা নই।

পরের সপ্তায় শনিবার না এসে শুক্রবার হঠাৎ বাড়ী এসে হাজির হলো জগা—রাত করে।

নগেনমামাকে দেখে জগা ক্ষেপে গেল।

—ফের তুমি আমাদের বাড়ী এসেছো! বেরিয়ে যাও—ভাল চাও তো বেরিয়ে যাও, নইলে তোমায় আমি খুন করে ফেলবো!

মাতঙ্গিনী, গুপের কোন কথাই খাটলো না, নগেনমামার ঘাড় ধরে জগা বার করে দিলে বাড়ী থেকে। মাতঙ্গিনী আর গুপে নিষ্ফল আক্রোশে গজরাতে লাগলো।

মাঝের একটা সপ্তাহ বাদ দিয়ে পরের সপ্তায় বাড়ী এলো জগা। যেন কিছুই হয়নি—এমনি সবার মুখের ভাব। মাতঙ্গিনী আর গুপের হাসি-খুশি ভাব দেখে মনে মনে সন্তুষ্ট হলো জগা। যাক্—এতদিনে এরা তাহলে এদের ভুলটা বুঝতে পেরেছে। ভ্রাতৃভক্ত লক্ষ্মণের মত গুপে উপযাচক হ'য়ে তার সঙ্গে কলে কাজ করতে যাবার কথা বললে।

মাতঙ্গিনী বললে জগার পক্ষ নিয়ে, জগা ঠিকই বলেছে। যাত্রাগান করলে তো আর পেট ভরবে না। দু'ভায়ে চাকরি করলে কি দরকার পরের কাছে হাত-পাত্‌বার! গুপের যে সুমতি হ'য়েছে —তাই আমার ভাগ্যি!

জগার আনন্দের আর সীমা থাকে না।

দিন চারেক পরে কার সাধ্য হাঁটে জগাদের বাড়ীর ধার কাছ দিয়ে —এমনি পচা দুর্গন্ধ।

গুপে বললে, আমাদের কইলে বাছুরটাকে ভুল করে ঐ বাঁশ বাগানে পুতেই তো এই বিভ্রাট!

—তোমাদের আবার কইলে বাছুর কোথা থেকে এলো ?

—গাইটা যে পরশু একটা মরা বাছুর বিয়োলো গো।

—গাইটা তো তোদের বিইয়েছে—এই তো সে দিন রে! ঐ তো তার বাচ্চা!

গুপে আমতা-আমতা করে সরে পড়লো।

পাড়ার লোকের কেমন যেন সন্দেহ হল। মনে হলো—কি যেন একটা গুপ্ত রহস্য আছে এর মধ্যে। গোপনে পাড়ার লোক থানায় খবর দিলে।

জগাদের বাড়ীর পিছনের বাঁশ বাগানে (যেখান থেকে দুর্গন্ধটা আসছিল) বাছুর পোতার জায়গাটা খুঁড়ে পাওয়া গেল জবাই করা জগার পচা লাস।

জেরার মুখে ভড়কে গিয়ে জগার ছোট বোন কেঁদে ফেললে। বললে, আমি সব কথা আপনাদের বলতে পারি কিন্তু—কিন্তু বড্ড ভয় করছে।

—ভয়! কিসের ভয়? কাকে ভয়?

—মাকে, ছোটদাকে আর নগেনমামাকে!

—কেন—ওদের কিসের ভয়?

—দাদার মত আমাকেও যদি ওরা গলায় ছুরি চালিয়ে কেটে ফেলে!

—তাহলে ওরাই তোমার দাদাকে কেটেছে? চুপ করে আছো কেন—বল! কোন ভয় নেই তোমার!

—হ্যাঁ—ওরাই মেরেছে। বলতে বলতে খুকী ভয়ে ভয়ে আড়-চোখে চাইলে তার মা আর ছোটদার দিকে।

—এবার বল তো খুকী—কি ভাবে ওরা তোমার বড়দাকে মারলে?

খুকী যা বললে তার সংক্ষিপ্ত সার :—পরের দিন ভোরে কাজে বেরুতে হবে বলে দাদা সন্ধ্যে-সন্ধ্যে খেয়ে দাওয়ায় শুয়ে পড়লো।

দাদার পাতে খেয়ে আমি এসে ঘরে শুলাম। মাঝরাতে কিসের শব্দে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখি—ছোটদা দু'হাত দিয়ে চেপে ধরেছে বড়দার দুটো পা আর মাথার দিকে বড়দার দুটো হাত চেপে ধরেছে নগেনমামা আর মা একটা ছুরি দিয়ে বড়দার গলার নলিটা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কাটছে। বড়দার সে কি গোঁঙানী! গলাটা কেটে যখন ছেড়ে দিলে—বড়দা তখন কাটা ছাগলের মত ধড়্ফড়্ করতে লাগলো। ভয়ে আমার মাথার ভেতরটা ঝিম্ ঝিম্ করে উঠলো। তারপর আমার আর কিছু মনে নেই।

এই হত্যাকাণ্ডটি যে আক্রোশ-প্রসূত পূর্ব পরিকল্পিত—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বিনা আক্রোশে কেবলমাত্র অর্থ আত্মসাৎ করবার জন্য মানুষ হত্যা করতে দ্বিধা বোধ করে কিন্তু আক্রোশের বশে অতি বড় নিকট আত্মীয়কেও মানুষ খুন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। দিনের পর দিন পরিকল্পনা করে, জল্পনা-কল্পনা করে, প্ল্যান ঠিক করে—কি ভাবে হত্যা করবে।

বহরমপুর সেন্ট্রাল জেল।

এই জেল সংলগ্ন একটা আলাদা বাড়ী হচ্ছে মেয়েদের জেল। তৎকালীন জেল-সুপারিনটেনডেন্ট মিষ্টার দত্তের সঙ্গে মেয়েদের জেলটি দেখতে গেলাম কোন বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে। জেলের ফটকে গিয়ে দাঁড়ালাম। মিঃ দত্তের নির্দেশে ফটক খুলে দিলে এক মহিলা। জেলের অভ্যন্তরভাগ দেখতে দেখতে আমি অনুসন্ধিৎসু হ'য়ে যে সব প্রশ্ন করলাম তার কতকগুলির জবাব দিলেন মিঃ দত্ত আর কতকগুলির জবাব দিলেন ঐ মহিলা।

অনেকগুলি মেয়েদের জেলেই আমাকে ঘুরতে হ'য়েছিল কিন্তু জেল অভ্যন্তরে এমন ভদ্রমহিলা আমি খুবই কম দেখেছি। যেমনি ভদ্র ব্যবহার তেমনি মার্জিত, মিষ্টি কথা। এক কথায়—লাজনম্র

অপূর্ব মহিলা। রঙটি তাঁর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, এ ছাড়া এমন নিখুঁত চেহারা খুব কমই চোখে পড়েছে। মনে হলো শৈলশিখরে বসে ধ্যান স্তিমিত লোচনে শিল্পী সৃষ্টি করেছে এই অপার্থিব রক্ত-মাংসের মূর্তি। অর্থের জন্য ভদ্রমহিলাকে দিন কাটাতে হয় চোর, পতিতা, খুনীদের সঙ্গে।

হায়রে চাকরী। বেরিয়ে এসে কথায় কথায় মিষ্টার দত্তকে জিজ্ঞাসা করলাম—ভদ্রমহিলা মেয়েদের জেলে কোন পোষ্টে কাজ করেন ?

—উনিও তো কয়েদী। তবে পোষ্ট বলতে—বর্তমানে উনি হচ্ছেন 'মেট'।

কয়েদী! এমন অপূর্ব একটি নারী—'কয়েদী'! আইন বিগর্হিত অপকার্য্য করে তাকে জেলে আসতে হ'য়েছে— স্তম্ভিত হয়ে গেলাম! কৌতূহল আর চেপে রাখতে না পেরে সানুনয়ে জানতে চাইলাম তার কারাবাসের ইতিকথা।

মিষ্টার দত্ত সংক্ষেপে বললেন :—ভদ্রমহিলা একজন খুনী— পতি-ঘাতিনী! ভদ্রমহিলার স্বামী বিদেশে চাকরী করতেন, মাসে একবার কি দু'বার বাড়ী আসতেন। স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে দেবর আর বৌদির মধ্যে এক অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বুড়ো মা জানতে পেরে প্রতিবাদ করেন কিন্তু পুত্রবধূ বা তাঁর ছোট ছেলে সে কথায় কান দেয় না। তাদের তখন 'প্রেম-দরিয়ায় তুফান বেহ্দায়—সামলে রেখো তরী' অবস্থা। এদের এই অবৈধ সম্পর্কের কথাটা ক্রমে তার স্বামীর কানে গেল।

শনিবার রাত্রে মহিলার স্বামী বাড়ী এলেন। মাকে জানালেন যে সোমবার সকালে তিনি বড় বৌকে নিয়ে যাবেন তাঁর কর্মস্থলে। সেখানে তিনি বাসা ভাড়া করেই এসেছেন। মা সানন্দে সম্মতি দিলেন। বুড়ো শাশুড়ীকে দেখবার অছিলায় বড় বৌ আপত্তি তুললে।

শাশুড়ী বললেন, চিরকাল কি ছোট বৌমা বাপের বাড়ী পড়ে থাকবে। তুমি চলে গেলে—বিপিন গিয়ে নিয়ে আসবে ছোট বৌমাকে!

এর ওপর আর কথা নেই।

রবিবারের মাঝ রাতে ভেজান দরজায় মৃদু 'টোকা'র আওয়াজ। গভীর নিস্তব্ধ নিঝুম রাত। স্বামী অঘোরে ঘুমুচ্ছে। মহিলা অতি সন্তর্পণে গিয়ে ভেজান দরজা খুলে দিলে। একখানা রামদা হাতে নিয়ে ঢুকলো তার দেবর। হ্যারিকেনের স্তিমিত আলো একটু বাড়িয়ে দিয়ে দেবরের হাত থেকে রামদা নিজের হাতে নিলে। স্বামীর হাত দুটো দেবর চেপে ধরার সঙ্গে সঙ্গে মহিলা ঝেড়ে বসিয়ে দিলে একটি কোপ—ধড় থেকে হতভাগ্য স্বামীর মুণ্ড আলাদা হ'য়ে গেল।

মুণ্ডটা ফেলে দিলে বাড়ীর পিছন দিকের একটা পুকুরে। ধড়টাকে দু'জনে ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল পুকুর পাড়ে, বাঁধলে একটা মোটা কাঠের গড়ের সঙ্গে। তারপর ঐ ভারি কাঠের গড় গড়িয়ে পুকুরে ফেলে দিলে।

ভোর বেলা শাশুড়ী ঘুম থেকে উঠলে মহিলাটি বললে, আপনার ছেলে একটু আগে চলে গেল। আগামী সপ্তায় এসে আমায় নিয়ে যাবে।

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। যে পুকুরে লাস ফেলা হয়েছিল—সে পুকুরটা ছিল অন্য লোকের। তাদের বাড়ী বিয়ে। বিয়ে উপলক্ষে মাছের দরকার। আরো পাঁচটা পুকুর থাকতে জেলে নামানো হলো সে-ই পুকুরে। টানা জালে উঠে এলো—মুণ্ড।

তখন লোকে লক্ষ্য করে দেখলে রক্তের ফোঁটা পড়ে আছে পুকুর পাড়ের ঘাসের ওপর, ছোট ছোট আগাছার ওপর। সেই রক্তের চিহ্ন গিয়ে শেষ হ'য়েছে—ঐ মুণ্ডের মালিকের বাড়ীর খিড়কী দুয়ার পর্য্যন্ত।

তারপর? বাড়ীর ভিতর থেকে বেরুলো রক্তমাখা রামদা।

রক্তমাখা বিছানা। আসল খুনীদেব বাব কবতে বিশেষ কাঠ-খড পোড়াতে হয়নি।

বিচারে—বৌ আর দেববেব যাবজ্জীবন কাবাদণ্ড!

বক্তমাখা কাতান হাতে নিয়ে এক ইঞ্জিন ড্রাইভাব ছুটতে ছুটতে থানায এসে বললে, আপনাবা আমায় ধরুন! ধবে শীগগীব ফাটকে পুরুন। আমি খুন কবেছি—জোড়া খুন। এই যে কাতান দেখছেন—এবই একটি কোপে এক সঙ্গে দুটি মাথা ধড থেকে নামিয়ে দিয়েছি। পিবীত কবা তাদেব এ জন্মেব মত ছুটে গেছে। কাতানে এই যে বক্ত দেখছেন— এ তাদেবই বক্ত। ছেলেবেলায় এটা দিয়ে পাঁঠাবলি দিয়েছি—আব আজ দিলাম মানুষ বলি। এই নিন্ কাতান! বিশ্বাস কববেন না—এ দুনিয়ায় কাউকে বিশ্বাস কববেন না।

—খুন তো কবেছো বুঝলাম। কিন্তু কাকে খুন কবেছো?

—আমাব স্ত্রীকে আব আমাব বন্ধুকে।

—কেন খুন করলে?

—ধরুন—সারা বাত হাডভাঙা খাটুনি খেটে আপনি ক্লান্ত শরীরে ভোববেলা বাডী ফিরলেন। ফিরে দেখলেন—আপনারই কোন এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আপনার স্ত্রীকে তারই সম্মতিক্রমে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে! আপনার তখন মেজাজটা কি হয়? চুপ করে থাকলে চলবে না স্যার—উত্তর দিন!

—মাত্র এই অপরাধে—তুমি তাদের—

—কিন্তু অপরাধটা যদি চুম্বন না হ'য়ে সঙ্গম হয়—তাহলে? তাহলে পারেন আপনি নিজেকে ঠিক রাখতে? খুন চাপে না আপনার মাথায়? খুন তখন যদি আপনার মাথায় না চাপে তাহলে হয় আপনি পাগল আব নয় অতি-মানুষ—যোগী-ঋষি-তপস্বী। দ্বিতীয় রিপুর উর্দ্ধে আপনার স্থান

—আবোল-তাবোল না বলে তুমি তোমার নিজের কথা বল।

—ঘুরিয়ে আমি তো আমার নিজের কথাই বলছি স্যার। আমি কিন্তু পাগলও নই আর অতি-মানুষও নই। আমি হচ্ছি রক্ত-মাংসের দেহধারী অতি সাধারণ মানুষ। আমারই ঘরের খাটের ওপর আমার স্ত্রী আর আমার বন্ধুকে সন্দেহাতীত উলঙ্গ অবস্থায় দেখে ক্রোধে ফেটে পড়লাম। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পাশের ঘর থেকে কাতানটা নিয়ে এসে তাদের সেই সঙ্গমরত অবস্থায় গলায় দিলাম এক চোপ্। ব্যস্—খতম!

—তোমার এই অপরাধের শাস্তি কি তা জানো?

—ফাঁসি। বাঁচতে আমি আর চাইনা স্যার। নিজের জীবনের ওপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে। দুনিয়ায় কার জন্যে—কিসের আশায় বেঁচে থাকবো বলুন?

—বেঁচে থাকবার মত কোন অবলম্বনই কি তোমার নেই?

—থাকলে কি স্যার—আমি স্বেচ্ছায় এসে ফাঁসী কাঠে গলা বাড়িয়ে দিতাম। নেই—নেই—কেউ নেই আমার। দুনিয়ায় সবচেয়ে যাকে আমি বেশী বিশ্বাস করতাম—,কণ্ঠ তার বাষ্পরুদ্ধ হলো। চোখের দু'কোণ ভরে উঠলো জলে।

এই লোকটি অভ্যাস অপরাধীও নয়—স্বভাব অপরাধীও নয়, এ হচ্ছে প্রাথমিক অপরাধী। অবস্থার দুর্বিপাকে সাময়িক উত্তেজনায় যে গুরুতর অপরাধ লোকটি করে বসলো তা রাষ্ট্রবিধি অনুসারে অমার্জনীয়। কিন্তু 'খুনী' বলতে আমরা সাধারণতঃ যা বুঝি অর্থাৎ স্বভাব অপরাধী—এ সে রকম খুনী নয়। স্বভাব-অপরাধীরা খুন করার মধ্যে কোন অপরাধ দেখে না কাজেই তারা অনুশোচনাও করে না আর অনুতপ্তও হয় না। তারা হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্রদেহে দুষ্ট ব্রণ—বিষাক্ত ক্ষত। দুষ্ট ব্রণ বা বিষাক্ত ক্ষত চিকিৎসায় সারে না—সেই ক্ষত অঙ্গ শরীর থেকে বাদ দিতে হয় অস্ত্রপোচার করে। বিষাক্ত ক্ষত ঘায়ের মত স্বভাব অপরাধীদের (খুনী—

হত্যা যাদের পেশা) উচ্ছেদ না করলে সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলতা দেখা দেবে—সমাজ ও রাষ্ট্র হবে বিপন্ন। কিন্তু উত্তেজনার বশে যে লোকটি খুন করে বসলো তাকে শোধরাবার জন্য যদি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যায় তাহলে সত্যই সে কি শোধরাবার অবসর এবং সুযোগ পাবে কারাগারে? অভ্যাস এবং স্বভাব অপরাধীদের সংশ্রবে দীর্ঘদিন কাটিয়ে সে যখন বাইরের জগতে বেরিয়ে আসবে তখন তার মানসিক অবস্থা কি দাঁড়াবে? অপরাধী-দের সংশ্রবে থেকে মন কি তার অপরাধ-প্রবণ হ'য়ে উঠবে না?

এই ধরণের প্রাথমিক অপরাধীদের জন্য জেলে স্বতন্ত্র বাস-স্থানের ব্যবস্থা হওয়া উচিত, নচেৎ স্বাধীন ভারতের জেলখানা মানুষ না গড়ে অমানুষই গড়ে তুলবে। জেলখানা শোধনাগার না হ'য়ে পরিণত হবে অপকার্য্য শিক্ষার শিক্ষা-নিকেতনে।

দুষ্কৃতকারীদের মনের ভিতর ধর্মভাব জাগ্রত করে ভবিষ্যৎ জীবনে কুকার্য্য হতে বিরত হবার জন্য বিভিন্ন জেলে বিভিন্ন ধর্মের ধর্ম উপদেষ্টারা নিয়মিত ধর্মালোচনা করে থাকেন। কিন্তু স্বভাব অপরাধীরা কোন ধর্মাধর্মের ধার ধারে না। তাদের একমাত্র ধর্ম হচ্ছে—অপকার্য্য।

"প্রিয় প্রমথেশ!

আক্রোশ যতটা থাক না থাক—অর্থের প্রলোভনেই আমি আমার জ্ঞাতি কাকা উমাচরণকে হত্যা করেছিলাম। আক্রোশটা অবশ্য গৌণ। বাবা মারা যাবার পর আমার মাকে ঠকিয়ে প্রায় সমস্ত বিষয় সম্পত্তির জাল দলিল করে উমাচরণ কাকা আত্মসাৎ করেছিলেন। সে সব অবশ্য শোনা কথা। তবে ছেলেবেলায় এমন অনেক দিন গেছে—যেদিন দুটি চালের অভাবে আমাদের উনুনে হাঁড়ী চড়েনি। মা চোখের জল ফেলতে ফেলতে অভিসম্পাত করেছেন ঐ উমাচরণ কাকাকে। যাক সে সব কথা। পয়সার

অভাবে লেখাপড়া শিখতে পারিনি। চটকলে হাজিরা বাবুর কাজ করি। আগে দু'পয়সা উপরি যে না ছিল এমন নয়, কিন্তু এখন বড্ড কড়াকড়ি। হপ্তা যা পাই তাতে ছেলেপুলে নিয়ে সপ্তাহের পাঁচটা দিন চলে তো যথেষ্ট।

সেদিন সকালে উমাচরণ কাকা আমাকে ডেকে বললেন, তেলি-পাড়ার ক'বিঘে জমি সুবিধে দরে পাওয়া যাচ্ছে। ওটা কিনবো বলে ঠিক করেছি। কলকাতায় গিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে হাজার পাঁচেক টাকা তুলে আনবো। তাই ভাবছি—অতগুলো টাকা—বুড়োমানুষ পথে-ঘাটে যদি কোন বিপদ আপদ ঘটে—

—চিন্তার কি আছে কাকা। আমি যাবো আপনার সঙ্গে!

ব্যাঙ্কে গিয়ে টাকা তোলা হ'ল। আরো দু' পাঁচটা কাজ ছিল কাকার—সেগুলো সারতে সারতে সন্ধ্যে হ'য়ে গেল। সন্ধ্যের ট্রেণটা আমি ইচ্ছে করে ফেল করিয়ে দিলাম। পরের ট্রেণে এসে আমরা যখন আমাদের গাঁয়ের ষ্টেশনে এলাম—রাত তখন প্রায় এগারটা। আবছা অন্ধকারে আঁক-বাঁকা পল্লীপথ বেয়ে দু'জনে কথা বলতে বলতে বাড়ীর দিকে এগিয়ে চলেছি।

একটা জঙ্গল ভরা মজা পুকুরের কাছে এসে প্রস্রাব করার নাম করে আমি পেছিয়ে পড়লাম। টাকার ব্যাগ কাকার হাতে। কাকা ঠুক্ ঠুক্ করে হাঁটছেন—আমি পিছন থেকে রামদা দিয়ে তাঁর মাথায় বসিয়ে দিলাম ঝেড়ে একটি কোপ। কলকাতা যাবার আগেই রামদাটা এই পুকুর ধারে একটা মোটা বটগাছের ধারে লুকিয়ে রেখে গেসলাম। কাকা মাটির ওপর লুটিয়ে পড়তেই তার গলায় বসিয়ে দিলাম আর এক কোপ। ছিটকে পড়া টাকার ব্যাগটা থেকে টাকা বার করে কাপড়ে বাঁধলাম। রামদাটা ছুঁড়ে দিলাম পুকুরের মাঝখানে, ব্যাগটাও। কাকার লাস যেখানে পড়েছিল—সেখানেই পড়ে রইলো। আমি ফিরে গেলাম আমাদের ষ্টেশনের আগের ষ্টেশনে। সেখান থেকে ভোরবেলা ট্রেণে উঠে

আবার ফিরে গেলাম কলকাতায়। সেদিনটা কলকাতায় থেকে পরের দিন বাড়ী ফিরলাম।

কাকার মৃত্যু সংবাদ শুনে আমি আকাশ থেকে পড়লাম। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে আমি কাকাকে হাওড়া ষ্টেশনে টিকেট কেটে ট্রেণে উঠিয়ে দিয়েছি আব কাকারই কাজে আমায় আটকে পড়তে হয়েছিল —এটাই সাধারণে প্রকাশ করলাম।

পুলিশ কিন্তু আমাকে নিয়ে টানা-পোড়েন করতে কসুর করলে না। সত্যিই আমি কলকাতায় ছিলাম কিনা—এবং কোথায় ছিলাম —তা তারা অনুসন্ধান নিলে।

অমুক ষ্ট্রীটে এক উৎকলবাসীর হোটেলে আমি একটা রাত কাটিয়েছিলাম কিন্তু ঘটনার দিন রাতে তো ছিলাম না। পাঁচশো টাকার বিনিময়ে সে পুলিশের কাছে বললে যে দুদিনই আমি তার হোটেলে খেয়েছি এবং থেকেছি।

প্রমাণ অভাবে আমি বেকসুব খালাস পেয়ে গেলাম। কিন্তু খালাস পেলাম না মনের কাছ থেকে। অনুশোচনা আর অনুতাপের আগুনে আমি অহবাত্র জ্বলে মরছি।

কাকাকে হত্যা করার কোন উদ্দেশ্যই আগে আমার ছিল না কিন্তু 'টাকা' আত্মস্মাৎ করতে হলে এ অবস্থায় কাকাকে খুন করা ছাড়া উপায় কি। তাই কলকাতা যাবার আগে রামদাটা লুকিয়ে রেখে গেসলাম।

আজ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে যে আগুন আমার অন্তরে জ্বলেছে—আজও তা নেভেনি। অর্থের প্রাচুর্য আমায় শান্তি দিতে পারেনি। বিলাসপুরের সমস্ত সম্পত্তি আমি উমাচরণ কাকার পৌত্র নিখিলেশের নামে দানপত্র করে দিয়ে গেলাম। জানি—এতে আমার পাপের বিন্দুমাত্রও প্রায়শ্চিত্ত হবে না তবু—তবু—!

ইতি—

তোমার চির অভিশপ্ত পিতা।"

ভদ্রলোকের লেখা খামে আঁটা এই চিঠিখানি তাঁরই নির্দেশ অনুসারে প্রমথেশের হাতে দিলেন এ্যাটর্নি—ভদ্রলোকের মৃত্যুর পর।

অসময়ে ডক্টব মিত্রের ঘরে মিস লীনাকে দেখা গেল। সুন্দব মুখখানির ওপর কারুণ্যের ছায়া। চোখেব কোলে কালি পড়েছে, একান্ত অবসন্ন, পরিশ্রান্ত বলে মনে হলো·মিস লীনাকে।

—কি খবর, মেট্রোন?

লীনা একখানা চেয়ারে বসে পড়ে বললে, আমাব সম্বন্ধে কি স্থির করলেন?

ডাক্তার নীরবে চেয়ে দেখলেন লীনাব দিকে।

—আর তো ঢেকে রাখা যায় না ডক্টর মিত্র। লোকে· আমাব শরীরের অবস্থা দেখে সন্দেহ কবতে সুরু করেছে। তাড়াতাড়ি যা হোক একটা কিছু তো করতেই হবে।

—তবু তোমার শরীবের বাঁধুনি ভাল বলেই কোনগতিকে সাত-আট মাস—নাঃ আরো আগে একটা কিছু করাই উচিত ছিল। আচ্ছা—ভেবে দেখি। তুমি ডিউটি শেষ করে সন্ধ্যের পর আমার চেম্বারে এসো। বললেন ডক্টর মিত্র চিন্তাবিজড়িত কণ্ঠে।

দিন তিনেক পরে।

লীনার কোয়াটারের দিক থেকে একটা বিশ্রী পচা দুর্গন্ধের আভাষ পেলেন পাশাপাশি কোয়াটারের বাসীন্দারা। তিন দিন আগে ছুটি নিয়ে লীনা চলে গেছে বর্দ্ধমানে তার বাবা-মার কাছে।

লীনার কোয়াটারে আছে শুধু তার ঝি। বন্ধ দরজার ভিতব থেকে ঝি বললে যে তার উত্থানশক্তি রহিত। জ্বরে সে মাথা তুলতে পাচ্ছে না। কাজেই সে রাত্রে আর বিশেষ কিছু করা গেল না।

পরের দিন ভোরে একটা মরা, পচা বাচ্চার মৃতদেহ রাস্তার পাশে ড্রেণের ধারে দেখা গেল—লীনার কোয়ার্টারের অদূরে।

গন্ধে গন্ধে পুলিশ এসে হানা দিলে লীনার কোয়ার্টারে। লীনার কোয়ার্টার তখনও গন্ধমুক্ত হতে পারেনি। প্রথমেই গ্রেফতার করা হলো ঝি-টিকে।

পুলিশের জেরায় বিপর্য্যস্ত হ'যে ঝি শেষ পর্য্যন্ত স্বীকার করলে ঐ ভ্রূণ হত্যার কাহিনীঃ—দিদিমণি ছিল সন্তান-সম্ভবা। সেদিন রাত্তি কি একটা ওষুধ খেলে। ভোর রাত্তি দিদিমণির একটি ছেলে হলো। জ্যান্ত ছেলের গলায় কি একটা ওষুধ দিতেই ছেলেটা কিছুক্ষণ ছটফট করে মরে নীল হ'যে গেল। দিদিমণির কথামত আমি বাচ্চাটাকে পাইখানার সিসটানের ভেতর রেখে এলুম। প্যাঁচশো টাকা আমায় দিয়ে দিদিমণি সকালবেলা ট্যাকসি করে বাপের বাড়ী চলে গেল। বলে গেল—সুযোগ সুবিধা মত সেই-দিনই বাচ্চাটাকে বাইরে কোথাও ফেলে দিতে।

দিদিমণিও চলে গেল আর আমিও বিছানা নিলুম। দু'দিন দু'রাত যে কোথা দিয়ে গেছে তা আমি টেরও পাইনি। গতকাল সন্ধ্যের সময় পাশের বাড়ীর লোকের ডাকাডাকিতে জাগলাম কিন্তু মাথা তুলতে পারলাম না। ভয়ে সারারাত ঘুম হলো না—বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো। ভোর না হতে-হতে বাচ্চাটা নিয়ে গিয়ে ঐ ওখানে ফেলে দিয়ে এলুম।

বর্দ্ধমান থেকে লীনাকে এনে ডাক্তারি পরীক্ষায় জানা গেল যে ঝিয়ের কথা বর্ণে বর্ণে সত্য

বিচিত্র এই দুনিয়া।

কতকগুলি মানুষ এমনি হালকা, দুর্বোধ্য ভিরু মন নিয়ে পৃথিবীতে আসে—যে তাদের পাগলও বলা চলে না আবার তাদের কার্য্যকলাপ দেখে সাধারণ সুস্থমস্তিষ্ক মানুষও বলা যায় না।

তাদের মন যে কি চায় তা তারা নিজেরাই জানে না। যে কোন মুহূর্তে যে কোন অপকার্য্য এদের দ্বারা সাধিত হতে পারে। এই ধরণের লোক খুবই বিপজ্জনক। দুষ্কৃতকারী বা পাগলকে লোকে চিনতে পারে—কাজেই সাবধান হবার সুযোগ পায় কিন্তু এ ধরণের লোক এমনই বর্ণচোরা যে সাবধান হবার সুযোগটুকু পর্য্যন্ত দেয় না।

'Journal of Mental Science, october 18৮9.'-এ উল্লিখিত একটি প্রামাণ্য কাহিনী :—

"W. T. একটি মুচির ছেলে, যেমনি কদর্য তার চেহারা তেমনি তার বুদ্ধি-বৃত্তি ! এক কথায় একটি অপদার্থ, অকর্মণ্য। ছেলেবেলায় সে না পারতো ভাল করে চলতে আর না পারতো ভাল করে কথা বলতে। নিজে নিজের কাপড় জামাও পরতে পারতো না—বার বছর বয়সে। বোকার চূড়ান্ত পড়তে ভালবাসতো অথচ কি যে পড়লো তা তার মনে থাকতো না মাথায় তার কিছুই ঢুকতো না।, তার অভিজ্ঞ স্কুল-শিক্ষক বলতেন যে এমন একটি বিদকুটে বিচিত্র ছেলে তিনি জীবনে দেখেননি। ছেলেটি কিন্তু কোনদিন কোন অন্যায় কাজ করেনি খারাপ ছেলে তাকে বলা চলে না.

স্কুল ছাড়ার পর তার বাবা তাকে জুতা তৈরীর কাজে লাগিয়ে দিলেন। কাজটা তার মন্দ লাগতো না কিন্তু জুতা তৈরীর প্রাথমিক কাজও সে চেষ্টা করে শিখতে পারলো না। তার সমবয়সী ছেলেরা তাকে নিয়ে ঠাট্টা করতো—করতো কৌতুক। সে নালিশ করতো তার ছোট বোনের (বয়স যার দশ বছর) কাছে।

দিন যায়।

ঘরে সে আর তার ছোট বোন বসে আছে একদিন। ছেলেটির পায়ের কাছে পড়ে আছে একটি হাতুড়ি। হঠাৎ সে তুলে নিলে ঐ হাতুড়ি আর চোখের পলকে মেরে বসলো তার বোনের মাথায়। মাথা ফেটে চৌচির। দরজায় তালা দিয়ে চলে গেল। ফিরে এলো ঘণ্টা খানেক পরে জলে ভিজতে ভিজতে।

গ্রেফতার করে তাকে নিয়ে গেল। সুস্থ মানুষের মত সে পেট ভরে খেল, ঘুমুলো নাক ডাকিয়ে। যেন কিছুই হয়নি—সে কিছুই করেনি।

বিচারক Lord coleridge তাকে চরম শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু মস্তিষ্ক বিকৃতির সিদ্ধান্ত করেন জুরী আব ডক্টর স্যাভেজ, ফলে তার দশ বছর কারাদণ্ড হয়।

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হত্যাকারীদেব অনেককে নাক ডাকিয়ে নিদ্রা দিতে এবং ভূরি ভোজন করতে দেখা যায়। চরম শাস্তি তাদের খাওয়ার বা ঘুমের বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত ঘটাতে পারে না।

ক) ফাঁসীর দিন ঘুম থেকে উঠে স্বাভাবিক মানুষের মত প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে এসে Socratice দেখলেন—Beack fast এর টেবিলে যা খাবাব দেওয়া হয়েছে তার পরিমাণ তাঁর মনের মত নয়—কম। তাই ওয়ার্ডারকে ডেকে বললেন মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে, আরে—এত কম খাবার কেন?

খ) মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত জনৈক লেখক তার মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে—সযত্নে গোছ-গাছ করে বাখছিল তার অপ্রকাশিত রচনাবলী।

গ) ফাঁসীর সময় হ'য়ে এসেছে অথচ দণ্ডিত ব্যক্তি অযথা দেরী করছে কি একটা কাজে। ওয়ার্ডার এসে তাড়া দেবা মাত্র লোকটি বিরক্ত হ'য়ে বললে, আঃ কেন অতো ব্যস্ত হচ্ছো। আমাকে ছাড়া কাজ তো আরম্ভই হবে না।

ঘ) সুন্দর পোষাকে সজ্জিত হয়ে সেণ্ট মেখে বহু অপরাধীকে ফাঁসীর মঞ্চে উঠতে দেখা গেছে।

ঘুষ বা উৎকোচ গ্রহণ এমন একটি অপকার্য্য যা করতে সভ্য ও

শিক্ষিত সমাজের লোকেরাও লজ্জা বোধ করেন না। লজ্জা বোধ করা দূরে থাক—উৎকোচ গ্রহণ যে একটি অপকার্য্য তা তারা ভাবতেই পারেন না। এটাকে তাঁরা তাঁদের প্রাপ্য বলেই ধরে নিয়ে থাকেন। সুযোগ থাকতেও যিনি ঘুষ না নেন—লোকে তাঁকে প্রকাশ্যে না হলেও মনে মনে 'বোকা'ই বলে থাকেন। প্রকৃত বা স্বভাব অপরাধীবা অপকার্য্য করাটাকে মোটেই দোষনীয় বলে মনে কবে না, বরং মনে করে—অপকার্য্য করার অধিকার তাদের আছে। সভ্য এবং শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও এমন অনেকে আছেন—যাঁরা ঘুষ নেওয়াটাকে তাঁদেব অধিকাবের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন।

এই অপকার্য্যের উৎপত্তি হ'য়েছে মানুষ শিক্ষা ও সভ্যতাব সংস্পর্শে আসার পর। আদিম যুগে মানুষ যখন কাঁচা মাংস খেতো তখন তাদের মধ্যে এ অপকার্য্য ছিল না—ছিল তাদেব অবচেতন মনে। তবে প্রাচীন কাল থেকে এই অপবাধ সঙ্ঘটিত হয়ে আসছে

বিশ্বকবিব ভাষায বলা যায—'অন্যায় যে কবে আব অন্যায় যে সহে তব ক্রোধ তারে যেন তৃণসম দহে। অন্যায যাঁবা কববাব তাঁবা তো কবছেন আর তাঁদেব এই অন্যায়কে প্রশ্রয দিতে হচ্ছে—সহ্য করে নিতে বাধ্য হতে হচ্ছে প্রতিকূল অবস্থাব চাপে পড়ে—নিরীহ জনসাধারণকে।

সময় বিশেষে সাধারণ মানুষকে এমন অবস্থারই সম্মুখীন হতে হয় যে—অনিচ্ছাসত্বেও সে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হয় নিজেব স্বার্থের খাতিরে। উৎকোচ গ্রহণ কারীরা সদাই ওঁত পেতে থাকে মানুষের দুবলতাব এবং বিপর্য্যস্ত অবস্থার সুযোগ গ্রহণের জন্য আধুনিক যুগে এটা একটা প্রথার সামিল হ'য়ে উঠেছে।

—ওহে—ব্যাপারটা এঁকে—মানে ঐ আর কি—যাতে তাড়াতাড়ি এঁব কাজটা হ'য়ে যেতে পারে—ভাল করে বুঝিয়ে বলে

দাও! আমি একটু আসছি! সহকারীকে বলে অফিসার-ইন-চার্জ চেয়ার ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

—ব্যাপারটা কি আমায় খুলে বলুন তো? জিজ্ঞাসা করলেন আগন্তুক ভদ্রলোক।

আম্‌তা আম্‌তা করে সহকারী অফিসার বললেন, দেখুন—ব্যাপার আর কি, যা সচরাচর এখানের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা পেয়ে থাকেন এই আর কি! বুঝতেই তো পাচ্ছেন—দিন কাল যা পড়েছে! তাই হাতে কিছু না পেলে—

—অর্থাৎ ঘুষ!

—না—না, মানে চা-পান-সিগারেট খাবার জন্যে প্রায়ই এঁরা কিছু পেয়ে থাকেন কিনা। তাই আপনার কাছ থেকেও কিছু আশা করেন। আর বুঝতেই তো পাচ্ছেন, নগদ কিছু হাতে না এলে আপনার কাজটাই বা আগে করতে যাবেন কেন—হাজার হাজার দরখাস্ত ফেলে রেখে।

ছ'মাস হলো দরখাস্ত দিয়েছি। ধরুন, ঘুষ যদি না দিই—

—আঃ আপনি 'ঘুষ ঘুষ' করছেন কেন—

'ঘুষ' কথাটা কানে বড় বেখাপ্পা শোনায়—তা ছাড়া সম্ভ্রমে বোধ হয় কিছুটা বাধে তাই তিনি 'ঘুষ' কথায় কিঞ্চিৎ আপত্তির আভাষ দিলেন।

—আচ্ছা—আচ্ছা। চা-পানি খাবার জন্য কিছু যদি আমি না দিই তাহলে আমার কাজটা হতে আর কতদিন সময় লাগতে পারে?

—সে কথা কি সঠিক ভাবে বলা সম্ভব! It will be executed in due course!

—কিন্তু আমার পরে যাঁরা দরখাস্ত দিয়েছিলেন তাঁদের কাজ তো আমার আগেই হ'য়ে গেছে। Due course এ হলে তাঁদের কাজ আমার আগে হয় কেমন করে?

—আপনি বুদ্ধিমান লোক হ'য়ে এরকম অবান্তর প্রশ্ন কচ্ছেন কেন?

—অর্থাৎ চা-পানির ব্যবস্থার জোরেই তাদের 'Due course'টা এগিয়ে এসেছে আমার আগে! Good!

—কি হে! এঁকে সব বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলেছো? বলতে বলতে অফিসার-ইন্-চার্জ এসে তাঁর চেয়ারে বসলেন।

—হ্যাঁ স্যার, মোটামুটি জিনিষটা এঁকে বুঝিয়ে বললাম।

ইন্-চার্জ আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললেন, এর আগে এসে একটা ব্যবস্থা করে গেলে—কবে আপনার কাজ হ'য়ে যেতো। আপনি লেট্ করার জন্যে আপনার কাজটাও—

—কিছু মনে করবেন না। আচ্ছা—কাক কি কাকের মাংস খায়? রহস্য ভরা কণ্ঠে আগন্তুক ভদ্রলোক বললেন ইন্-চার্জকে

নির্বাক বিস্ময়ে আগন্তুকের মুখের দিকে চাইলেন ইন্-চার্জ।

—আমিও সরকারী কর্মচারী। আমার কাছ থেকে চা-পান-সিগারেট বাবদ—

—Please! Please! Excuse! আপনি এতক্ষণ বলেননি কেন? যাই হোক—কিছু মনে করবেন না। খুবই ভুল হ'য়ে গেছে আমার। Please! ওরে—চা নিয়ে আয়! লজ্জায় মরমে মরে গেলেন ইন্-চার্জ ভদ্রলোক।

—তা ছাড়া, আপনাদের ভুবনবাবু তো আমাকে এ সম্বন্ধে কোন আভাষই দেননি আগে থেকে।

—কোন্ ভুবনবাবু?

—মানে ভুবনমোহন মিত্র—যাঁর হাত দিয়ে দরখাস্তটা আমি পাঠিয়েছিলাম।

আঁতকে উঠলেন ইন্-চার্জ ভদ্রলোক. কি সর্বনাশ! আপনি তাহলে ভুবনবাবুর বন্ধু বলুন! আপনার দরখাস্তই তাহলে ভুবনবাবু তাঁর আরদালিকে দিয়ে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন! এঃ এ সব কথা আপনি আগে বলেননি কেন! যাক যা হবার তা হ'য়ে গেছে। দয়া করে—ভুবনবাবুকে এ কথাটা আপনি বলবেন না, Please!

—না—না, এসব আমি কিছু বলবো না। আপনি আমায় বিশ্বাস করতে পারেন। আমার কাজটা যাতে তাড়াতাড়ি হয়—অনুগ্রহ করে সেদিকে একটু দৃষ্টি দেবেন। আচ্ছা, আমি তাহলে আজ উঠি, ট্রেণের সময় হ'য়ে এলো। বলে আগন্তুক উঠে দাঁড়ালেন।

ইন্-চার্জ ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে আগন্তুকের হাত দুটি ধরে বললেন, আশা করি—আমার অনুরোধটা আপনার মনে থাকবে।

—আপনার 'কিন্তু' হবার কিছু নেই আচ্ছা, নমস্কার।

—নমস্কার।

আগন্তুক ভদ্রলোক থাকেন কলকাতায়। বছর ত্রিশ হলো—তিনি কলকাতা প্রবাসী। কলকাতা থেকে মাইল কুড়ি দূরে তাঁর পৈতৃক বাসভূমি—কোন এক মহকুমায়। বহুদিন দেশে না থাকায় তার জমির খানকটা অংশ তাঁর প্রতিবেশী নিজস্ব বলে দাবী করছেন আর অন্য এক প্রতিবেশী ভদ্রলোকের জমির কতকটা অংশ নিজের জমির অন্তর্ভুক্ত করে বেড়া টেনে নিয়েছেন। তাই তিনি Land reform অফিসে দরখাস্ত করেছেন তাঁর জমিটি ঠিক ভাবে মাপ-জোক করে দেবার জন্য Land reform অফিসটি তাঁরই সাব-ডিভিসনে।

কিন্তু ছ'মাস হ'য়ে গেল, কোন খবরই নেই। বাধ্য হ'য়ে অফিস কামাই করে তিনি এলেন উক্ত Land reform অফিসে তাঁর আবেদনের খবর জানতে এবং তদ্বির করতে। অফিস কামাই এবং পয়সা খরচ করে আসা কি সম্ভব প্রতি সপ্তাহে?

কিন্তু তদ্বিরের অর্থ যে উৎকোচ প্রদান তা তাঁর জানা ছিল না—বিশেষ করে তিনি যখন তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু সরকারী কর্মচারী ভুবন-মোহন মিত্রের মাধ্যমে দরখাস্তটি যথাস্থানে দাখিল করেছেন। আদালতে টিকটিকিটি পর্যন্ত ঘুষখোর, ঘুষ না পেলে মানুষ তো দূরের কথা—টিকটিকিও সেখানে ল্যাজ নেড়ে উপকার করেনা কিন্তু

Land refom অফিসেও যে 'সব শিয়ালের এক রা' তা তাঁর জানা ছিল না। সরকারী কর্মচারী হ'য়ে তাঁকেও যে ঐ ঘুষের কবলে পড়তে হবে—এটা তিনি ভাবতে পারেননি। তাই অতি দুঃখে ভদ্রলোকের কণ্ঠ ঠেলে বেরিয়ে এলো—'আচ্ছা, কাক কি কাকের মাংস খায় !'

এ্যায়সা হ্যায় দুনিয়াকি হালচাল। ঘুষের রাজত্ব চলেছে সর্বত্র। এমনি ভাবে চলেছে—যাকে বলে—open secret. আধুনিক যুগ হচ্ছে এমন যুগ—যে যুগে ঘুষ চাইতে কেউ লজ্জা বোধ করে না, ঘুষ চাওয়াটা যেন তাদের একটা দাবী। ন্যায্য মত যা দেবার তা তো লোকে দিয়েই থাকে কিন্তু কাজ উদ্ধারের জন্য ঘুষ তাকে দিতেই হবে। ঘুষ দেয়—কাজ হবে, না দেয়—কাজ তার পণ্ড হবে! উৎকোচ-গ্রাহীদের মূলমন্ত্র হচ্ছে—'ফেল কড়ি মাখো তেল—তুমি কি আমার পর'!

"অমুক রাণীর সঙ্গে আমি বহুদিন যাবৎ ব্যাভিচারে লিপ্ত আছি। আমিই তার সতীত্ব নাশ করেছি এবং করেছি তার দুটি ভ্রূণ হত্যা। আজীবন আমি তার খোর-পোষ দিতে বাধ্য থাকবো। সজ্ঞানে এবং স্বেচ্ছায় এই ....' একটা মেয়েছেলে এই ধরণের একটা জঘন্য জিনিষ তোমাকে দিয়ে জোর করে লিখিয়ে নিলে—এটা কি বিশ্বাস-যোগ্য কথা? বললেন ম্যাজিষ্ট্রেট।

—গুণ্ডাদের সাহায্য নিয়ে অমুক রাণী আমাকে লিখতে বাধ্য করালে হুজুর! At the point of dagger—প্রাণের ভয়ে আমি না লিখে পারলাম না। বললেন মিষ্টার X.

মিষ্টার X এর পক্ষে উকিল বললেন, ধর্মাবতার! এ ধরণের জঘন্য জিনিষ সুস্থ মস্তিষ্কে কেউ কোনদিন লিখে দেয় না—বিশেষ করে সে যদি অপরাধীও হয়। সাচ-ওয়ারেণ্টের জোরে কাগজখানি অমুক রাণীর কাছ থেকেই পাওয়া গেছে।

অফিস থেকে বেরিয়ে মিঃ X এর সঙ্গে অমুকরাণী আর নির্মলের দেখা হ'য়ে গেল। নির্মল তার পরিচিত, অমুকরাণীর বাড়ীতেই নির্মলের সঙ্গে তার আলাপ হ'য়েছিল। দেখে মনে হলো—ওরা যেন মিঃ X এর জন্যই তাব অফিসের কাছাকাছি কোনখানে অপেক্ষা কবছিল। সন্ধ্যা তখন পেরিয়ে গেছে।

—কি খবর? হঠাৎ এখানে? জিজ্ঞেস করলেন মিঃ X.

—এঁর অফিসে একটা গণ্ডগোল হ'য়েছে তাই এঁকে নিয়ে একবার হেড অফিসে এসেছিলাম। তা আপনাব সঙ্গে যখন দেখাই হ'য়ে গেল তখন আসুন একটা যুক্তি-যাক্তা করা যাক! বললে নির্মল।

—কিন্তু আমার যে এখন একটু কাজ আছে।

অমুকরাণী ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, সেটা একটু পরে সারলেও চলবে।

অনিচ্ছা সত্বেও ওদেব সঙ্গে গেলেন মিষ্টার X কথা বলতে বলতে। মিষ্টার X কে ওরা নিয়ে এলো একটা খোলা মাঠে। সেই স্থানটি তখন ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টেব দৌলতে সুসংস্কৃত হচ্ছে। মাঠ-ঘাট, ঝোপ-জঙ্গল, কুঁড়ে-কাঁড়া বস্তিবাড়ী সব সমভূমি করে দিয়ে নতুন পাবকল্পনায় বড় বড় চওড়া রাস্তা তৈবী হচ্ছে। লোকজনের চলা-চল খুবই কম। দু'পাঁচ জন বায়ুভুক ছাড়া বড় একটা কাকেও দেখা যায় না। অমন মরুভূমি সদৃশ প্রান্তরে কোন্ কাজের লোক পড়ে মরতে যাবে।

ঐ নিরালা প্রান্তরে এসে একটি ঝোপের আড়ালে ওরা বসলো। নির্মলের নির্দেশে একটা রাস্তার ছেলে দূরেব দোকান থেকে তিন ভাঁড় চা নিয়ে এলো। দেখতে দেখতে আরো তিন চার জন গুণ্ডা-গোছের লোক এসে জুটে গেল। দেখা গেল—এরা সকলেই নির্মল ও অমুকরাণীর পরিচিত।

মিষ্টার X এর কাছে আবহাওয়াটা কেমন অস্বস্তিকর মনে

হলো। চা খেয়ে মিষ্টার X বললেন, আচ্ছা, আমি তাহলে আজ উঠি।

—তা কি হয় মশাই, বসুন। কাজের কথাই হলো না আর আপনি চলে যাচ্ছেন! বলে নির্মল হাত ধরে টেনে ঘাসের ওপর বসিয়ে দিলে মিষ্টার X কে।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ হ'য়ে গেছে। রাস্তার ল্যাম্প-পোষ্টের ক্ষী আলো ছড়িয়ে পড়েছে চার পাশে। অদূরে নিঃসঙ্গ তাল গা গুলো বিরাট দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে। জন প্রাণীও ধার কা দিয়ে যাচ্ছে না।

—কাজের কথাটা কি তাই তো বুঝতে পাচ্ছি না।

নির্মল বললে, আপনি নাকি বিয়ে করছেন?

—হ্যাঁ।

অমুকবাণী বললে, কোথায় বিয়ে করছেন?

—আপনাদের এটাই কি কাজের কথা?

নব আগন্তুকদের মধ্যে একজন হঠাৎ তেরিয়া হয়ে বললে, বা অমনি করলেই হলো।

—হঠাৎ এসব অবাস্তব কথার অর্থ কি, নির্মলবাবু?

—আপনি মশাই ভদ্রলোক হয়ে একটা মেয়েছেলের সর্বনা করে আবার একটা মেয়েছেলের সর্বনাশ করতে যাচ্ছেন—এট ভাল? বললে নির্মল গম্ভীর কণ্ঠে।

এসব কি অবাস্তব কথা বলছেন! কার আমি সর্বনা করলাম? জিজ্ঞেস করলেন মিষ্টার X

—সর্বনাশ করেছেন অমুকবাণীর। আপনি অস্বীকার কর পারেন? চোখ রাঙিয়ে উঠলো জনৈক নবাগত।

—নিশ্চয়ই পারি। উনি ছেলেমেয়ে নিয়ে খেতে না পেয়ে অফিসে-অফিসে ঘুরছিলেন। আমি ওঁর চাকরি করে দিয়েছি। এঁর নাম কি সর্বনাশ করা? দীপ্ত কণ্ঠে বললেন মিষ্টার X.

—আপনি ওঁর বাড়ী যাননি ?

—হ্যাঁ গেসলাম। কিন্তু কোন কুমতলবে যাইনি বা কোন কুমতলব হাঁসিল করিনি। যে ক'দিন গেসলাম সে শুধু ওঁরই খাতিরে ওঁরই পেড়াপিড়ীতে। সত্যি-মিথ্যে ওঁকেই জিজ্ঞেস করুন।

ইতিমধ্যে র্যাশন ব্যাগের ভেতর করে মদ এসে গেল। সুরু হলো গ্লাসে ঢালা।

—আচ্ছা, এবার আমি উঠি।

—কোথায় যাবেন মশাই! যাই বললেই কি যাওয়া হয়। খান এক গ্লাস।

—আমি ও সব খাইনা।

—এঃ ধম্মোপুত্তর আর কাকে বলে!

নিজেদের মধ্যে গ্লাস আদান-প্রদান সুরু হলো মিষ্টার X কে ঘিরে। মিষ্টার X এর তখন সপ্তরথী বেষ্টিত অভিমন্যুর কথা মনে পড়লো। এই ব্যূহ ভেদ করে কি ভাবে যে তিনি বেরুবেন তা তিনি ভেবেই পেলেন না।

—আজ রাত্রে কালীঘাটে গিয়ে অমুকরাণীর সঙ্গে আপনাকে মালাবদল করে তার সিঁথেয় সিঁদুর দিয়ে দিতে হবে। বার করুন ট্যাক্সি ভাড়া।

—বিধবার সঙ্গে মালাবদল! এসব কি বলছেন আপনারা ?

অমুকরাণী বললেন, তার চেয়ে আমি যা বলেছি তাই করিয়ে নাও, নির্মলদা!

অমুকরাণী তার রিফিউজি ব্যাগ থেকে একখানা ডবল ফুলস্ক্যাপ কাগজ বার করে নির্মলের হাতে দিলে।

কাগজটা মিঃ X এর হাতে দিয়ে নির্মল বললে, যা বলছি ভদ্রলোকের মত তাই লিখে দিন।

—আমি এমন কোন অপরাধ করিনি যার জন্য কারো কাছে কিছু লিখে দিতে আমি বাধ্য! লিখে আমি দেবো না!

—তোমাকে লিখতেই হবে। না লিখে শালা তুমি যাবে কোথা?

চারদিক থেকে বীভৎস হল্লা উঠলো।

—লেখো যা বলছি! ছোরা উঁচিয়ে বললে নির্মল।

মিষ্টার X এর গায়ের রক্ত হিম হ'য়ে গেল। কাঁপতে কাঁপতে মিঃ X লিখে দিলেন—ওরা যা লিখতে বললে।

মিঃ X এর নাম সই করা লেখা কাগজখানা বিফিউজি ব্যাগে রেখে অমুকবাণী তার মাতাল দাদাদের বললেন, আমি না আসা পর্য্যন্ত একে তোমরা আটকে রাখবে।

অমুকবাণী চলে যেতে মিষ্টার X নির্মল আর তার বন্ধুদের কাকুতি-মিনতি করে বললেন, আপনারা ভদ্রলোক! একটা নিরীহ লোককে এভাবে অপদস্থ করে কি লাভ আপনাদের। দয়া করে আপনারা আমায় ছেড়ে দিন।

—সে কি মশাই। আজ রাত্রে অমুকবাণী আপনাকে চরিত্রহীন করে ছাড়বে। ঘর খুঁজতে গেছে—একটা রাত কাটাবার মত।

—যা মেয়ের পাল্লায় পড়েছেন। সতীত্ব আপনার গেল বলে। কইরে দে আর এক গেলাস।

—দয়া করে আপনারা আমায় ছেড়ে দিন। বলতে বলতে মিষ্টার X এর চোখ জলে ভরে উঠলো।

—কি করে ছাড়ি বলুন দাদা। এ মদ যে অমুকবাণীর পয়সাতেই খাচ্ছি। নিমকহারামি কি করতে পারি, কি বল নির্মলদা?

—দে দে ভদ্দোর লোককে ছেড়ে দে।

মিষ্টার X আশ্বাস পেয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন—নির্মল বললে, পায়ে হেঁটেই যান আর রিকসাতেই যান—অমুকরাণীর মত খাণ্ডাননীর হাতে কিছুতেই আপনার নিস্তার নেই। ঠিক আপনাকে ফলো করে ধরে ফেলবে। তার চেয়ে ট্যাকসি করে ঝট্‌পট্‌ হাওয়া কাটুন।

ওরাই একটা ট্যাকসি থামিয়ে তুলে দিলে মিঃ X কে। মুক্তি দেবার সময় নির্মল বললে, কিন্তু খবরদার থানায় যাবেন না।

আপনার ঐ লেখা কাগজখানা আমরাই ওর কাছ থেকে আদায় করে আপনাকে ফিরিয়ে দেবো।

পরদিন মিষ্টার X এ্যান্টি-রাওডির অফিসে গিয়ে সমস্ত বৃত্তান্তটি সবিস্তারে লিখে একখানি দরখাস্ত দিলেন।

এ্যান্টি-রাওডির পুলিশ অফিসার অমুকরাণীকে ঘটনাস্থলের এলাকাভুক্ত থানায় ডেকে পাঠালেন। অমুকরাণী মিষ্টার X এর নামে যা-তা কথা বলে জানালে যে—সে কিছুই মিষ্টার X কে দিয়ে লিখিয়ে নেয়নি।

ম্যাজিষ্ট্রেট সার্চ অর্ডার দিলেন।

Due course-এর অজুহাত দিয়ে থানা অফিসার গড়িমসি সুরু করলেন। মিষ্টার X-এর লেখা কাগজখানা অন্যত্র সরিয়ে ফেললে—অমুকরাণীর বাড়ী সার্চ করে ফলটা কি হবে।

উকিলের মারফৎ ঘুষের ব্যবস্থা হ'য়ে গেল। পরদিন ভোরে উকিল, মিষ্টার X, আর জনদুই পুলিশ নিয়ে বাঁশের লরী করে পুলিশ অফিসার হানা দিলেন অমুকরাণীর বাড়ী। বাড়ী আর খানাতল্লাসী করতে হলো না, ভড়কে গিয়ে অমুকরাণী মিষ্টার X কে দিয়ে লেখান কাগজখানি ফিরিয়ে দিলে।

স্রেফ ঘুষের জোরে বেরিয়ে এলো কাগজখানি!

থানার চামচিকেটা পর্য্যন্ত মিষ্টার X কে রেহাই দিলে না, বখশিস—বখশিস—বখশিস!

এ হলো পরাধীন ভারতের পুলিশের কাহিনী। স্বাধীন দেশের পুলিশ গত দিনের তুলনায় অনেক সৎ, অনেক পরোপকারী!

ব্ল্যাক-মেলিং আর এক মারাত্মক অপরাধ। অহেতুক অপবাদ দিয়ে টাকা আদায়, সম্ভ্রমহানির ভয় দেখিয়ে জোর করে টাকা আদায়ের বহু ঘটনা ভবিষ্যতে ঘটেছে আর আজও ঘটছে। এই

ধরনের অপকার্য্যকে আধুনিক যুগোপযোগী অপকার্য্য বলা যেতে পারে। অনেক সময় দল বেঁধে এরা এই অপকার্য্য করে। এদের দলে মেয়েছেলেও থাকে।

শ্যামবাজারের মোড়।

বাস ষ্ট্যাণ্ড থেকে কিছুটা দূরে হঠাৎ একটি মেয়ে পিছন থেকে এসে অনিলের হাতটা চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠলো, আপনার বাড়ীতে মা বোন নেই। ননসেন্স! বলেই টেনে অনিলের গালে এক চড় বসিয়ে দিলে!

কোথা থেকে ছুটে এলো পাঁচ ছ'জন বিভিন্ন বয়সের লোক।

—কি হলো? কি হ'য়েছে?

—হঠাৎ আপনি ভদ্রলোককে মেরে বসলেন কেন?

—কি করেছিলেন মশাই?

হতভম্ব অনিলকে বলবার অবসর না দিয়ে মেয়েটি বলে উঠলো, উনি আমার গায়ে হাত দিয়েছেন।

—এঁ্যা। সে কি!

—হঁ্যা! আমি কি মিথ্যে কথা বলছি! আপনারা আপনাদের বোনের অপমান সহ্য করবেন। আপনারা আমার অপমানের প্রতিশোধ নিন্!

—পকেটে যা আছে দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিন! অনিলের কানের কাছে চাপা গলায় বললে একজন লোক।

দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল।

—দিন ব্যাটাকে উত্তম-মধ্যম কয়েক ঘা। ভদ্রলোকের মেয়ের গায়ে হাত দেওয়ার আরামটা ছুটিয়ে দিন।

অনিল এবার মরিয়া হ'য়ে বললে, তার আগে আপনারা আমাকে আর ঐ ভদ্রমহিলাকে থানায় নিয়ে চলুন। সেখানেই পরিষ্কার হ'য়ে যাবে ব্যাপারটা।

অপরাধী যেচে থানায় যেতে চাইছে। নিশ্চয় এর মধ্যে কোন

রহস্য আছে। রহস্যটি জানবার উৎসাহে পথচারীরা বললে, বেশ—তাই চলুন।

কিন্তু—কিন্তু কাকে নিয়ে যাবে থানায়? আর নিয়েই বা যাবে কে? ফরিয়াদী কোথা? আসামী ও অন্যান্য লোকজনের দৃষ্টি এড়িয়ে ফরিয়াদী বেগতিক দেখে সরে পড়েছে। শুধু কি সে একা সরেছে—তার দলবলও গা ঢাকা দিয়েছে।

অনিলের কাছে আসল ঘটনাটা শুনে সবাই বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল।

চৌরঙ্গী। রাত প্রায় সাড়ে আটটা।

চলন্ত বাসে পড়ি-কি-মরি হ'য়ে কোন রকমে এক দরজা দিয়ে উঠতে দেখা গেল দুটি আধুনিকাকে আর অন্য দরজা দিয়ে এক গ্রাম্য যুবককে।

যুবকটি হাঁফাতে হাঁফাতে কাঁদো কাঁদো গলায় বললে, দেখুন না মশাই। এরা আমার টাকা কেড়ে নিয়েছে।

—মিথ্যে কথা। ও লোকটা আমাদের ফলো করছিল বলে তাড়াতাড়ি আমরা বাসে উঠে পড়েছি। বললে প্রথম আধুনিকা।

জনৈক যাত্রী বললেন, লোকটা যদি কুমতলবে আপনাদের ফলোই করছিল তাহলে আপনারা পুলিশকে না জানিয়ে মেয়েছেলে হ'য়ে চলন্ত বাসে উঠে পড়লেন কেন? রাস্তায় পুলিশ আছে—লোকজন আছে।

যুবকটি বললে, সকালের ট্রেণে মাল কিনতে এসেছি। গ্রামের বাজারে আমাদের দোকান আছে। সারাদিন মাল কেনা-কাটা করে—রাতের ট্রেণে বাড়ী ফিরবো। আড়তদাররা লরী বোঝাই দিয়ে মাল আমাদের দোকানে যেমন পাঠিয়ে দেয় তেমনি পাঠিয়ে দেবে। ট্রামে ওঠবার আগে মাঠে ঘাসের ওপর বসে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলাম। হঠাৎ এঁরা দু'জনে আমার পাশে এসে বসে বললেন, কটা বেজেছে। এক

কথা, তু'কথায় আলাপ সুরু হলো। কিছুক্ষণের পর ওঁদের চা খাবার ইচ্ছা হলো। আমাকে বললেন, চলুন—একটু চা খেয়ে আসা যাক। আমি বললাম, আমার ট্রেণের দেরী হ'য়ে যাবে। ওঁরা বললেন, এই তো সবে সন্ধ্যে। আমাদেরও তো ট্রেণে করে ফিরতে হবে। আলাপ যখন হলো—তখন আসুন না একসঙ্গে একটু চা খাই। পয়সা আপনাকে দিতে হবে না—ভয় নেই।

পয়সার কথায় লজ্জা পেলাম। না গেলে ভাববে—পয়সা খরচের ভয়ে লোকটা চা খেতে গেল না। গেলাম ওঁদের সঙ্গে চা খেতে। ওঁরাই অর্ডার দিলেন চায়ের এবং তার সঙ্গে আরো অনেক কিছুর। ওঁরা তু'জনে আমার তু'পাশে গা ঘেঁষে বসে চা খেতে খেতে এমন ভাবে গল্প জমালেন—যেন কতদিনের আলাপ আমার সঙ্গে।

চা পানের পর আমি ব্যাগ খুলে দাম দিতে যাচ্ছি—ওঁরা আমার হাত থেকে ব্যাগটা ছিনিয়ে নিলেন, যেন দামটা ওঁরাই দিয়ে দেবেন। আমারই চোখের সামনে আমার ব্যাগ থেকে টাকা নিয়ে চায়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে রাস্তায় নেমে এলেন। ফুটের ধারে গুণে দেখলেন রহস্যচ্ছলে—কত টাকা আমার ব্যাগে। দশটি টাকা আর খুচরো ব্যাগে রেখে ব্যাগটা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, এই আশিটা টাকা আমরা নিলাম ধার হিসাবে। আগামী শুক্রবার মাঠের ঐখানে আবার দেখা হবে।

ব্যস্—আমাকে কথা বলার অবসর না দিয়ে ট্যাকসি, লরী চাপা পড়তে পড়তে ওঁরা ছুটে এসে এই চলন্ত বাসটায় উঠে পড়লেন।

—এখন আপনি কি করে প্রমাণ করবেন যে ওঁরা আপনার টাকা নিয়েছেন? নোটের নম্বর আছে আপনার কাছে? নিশ্চয়ই নেই। থাকা সম্ভব নয়। ওঁরা তুটি যে কি চীজ তাতো ওঁদের হাবভাব আর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু নিরুপায়। আক্কেল-সেলামী যা দেবার দিয়েছেন—এবার ঘরের ছেলে ঘরে যান।

ভবিষ্যতে মেয়েছেলে দেখলেই হামলে পড়বেন না! বললেন জনৈক বাসযাত্রী।

পরের স্টপেজে যুবকটি ম্লানমুখে নেমে গেল।

কখন, কারদ্বারা কি ভাবে যে ব্ল্যাক-মেলিঙ্ হতে হবে তা সোজা কথায় বলা যায়—দেবা ন জানন্তি কুত মনুষ্যা'। খুব সতর্ক এবং হুঁসিয়ার হ'য়ে পথে-ঘাটে চলা উচিত—বিশেষ করে শহরে।

আজ মাইনে হ'য়েছে সাবা মাসের মাইনে পকেটে। ভদ্রলোক কলেজ ষ্ট্রীট থেকে আম কিনে ট্রামে উঠলেন। শ্যামবাজারের মোড়ে আমভর্তি ব্যাশন ব্যাগটি নিয়ে তিনি ট্রাম থেকে নামলেন। কিছুদূব আসার পর পিছন থেকে এক স্যুটপরা ভদ্রলোক সামনে এসে তাঁব পথ বোধ করে দাঁড়িয়ে বললেন. আপনার ব্যাগে কি আছে?

—তার মানে?

—মানে অবশ্যই কিছু আছে। যা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দিন।

ভদ্রলোক থতমত খেয়ে বললেন, ব্যাগে আম আছে।

—আমের সঙ্গে আর কি আছে?

—আর তো কিছু কিনিনি! আপনি হঠাৎ এসব কথা—

ভদ্রলোককে কথা শেষ করতে না দিয়ে স্যুটধারী বললেন, জানেন না আর কি আছে? চলুন—আপনাকে থানায় যেতে হবে।

ভদ্রলোক বললেন, কেন—শুধু শুধু থানায় যাবো কেন?

—আমের সঙ্গে লুকিয়ে কোকেন নিতে গিয়ে ধবা পড়লে থানাতেই যেতে হয়।

—কোকেন! সে কি! ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি ব্যাশন ব্যাগ অনুসন্ধান কবে আমেব সঙ্গে একটা মোড়ক পেলেন।

ভদ্রলোকের হাত থেকে মোড়কটি নিয়ে স্যুটধারী বললেন, তবে যে বললেন—শুধু আম। এটা কি বেরুলো?

ভদ্রলোক নিজের চোখকে অবিশ্বাস করতে পারলেন না। এক মোড়ক কোকেন বেরুলো তাঁর র‍্যাশন ব্যাগ থেকে।

—কিন্তু—কিন্তু এ জিনিষ এর ভেতর এলো কেমন করে!

—আপনি জানেন না যে আমের সঙ্গে আপনার র‍্যাশন ব্যাগে কোকেন আছে? বাঃ চমৎকার! মশাই! আমরা হচ্ছি টিকটিকি। আমাদের চোখে ধূলো দেওয়া বড় শক্ত! বলুন আপনিই বলুন এবার আপনাকে থানায় যেতে হবে কিনা।

—বিশ্বাস করুন—কেমন করে যে এর ভেতর এ জিনিষ এলো আমি তার বিন্দুবিসর্গও জানি না।

—আমি তো গাঁজা খাইনা। আমার হাতে অন্য কেউ গাঁজা সেজে খেয়ে গিয়ে থাকবে। এ যে ঠিক সেই রকম কথাটা হলো।

—বিশ্বাস যদি না করেন—আমি আর কি বলবো বলুন! ভদ্রলোকের চোখের কোণ ভিজে উঠলো।

—আপনি কি বলতে চান—অন্য লোক আপনার ব্যাগে কোকেন পুরে দিয়েছে আপনার অজান্তে?

—দেখুন—বলতে আমি আর কিছুই চাই না! দয়া করে আপনি আমায় বাঁচান।

—লেখাপড়া জানা লোক হ'য়ে এটা আপনি কি বলছেন! ধরবার মালিক আমি, বাঁচাবার মালিক তো আমি নই। থানায় তো চলুন। বাঁচাতে হয়—তারা বাঁচাবেন।

অশ্রুসজল চোখে ভদ্রলোক জোড় হাত করে বললেন, দেখুন—বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা। আপনি ইচ্ছে করলে—

—বামাল সমেত হাতে পেয়ে আমি আপনাকে ছেড়ে দেবো! বাঃ বড় মজার কথা তো।

—আমি আপনাকে এমনি ছাড়তে বলছিনা। দয়া করে যৎকিঞ্চিৎ নিয়ে—

—বামাল সমেত ধরাপড়ার শাস্তি কি জানেন ?

স্যুটধারীর দুটো হাত চেপে ধরে ভদ্রলোক বললেন, আপনি আমায় থানায় ধরে নিয়ে গেলে কাচ্চা-বাচ্চা গুলো না খেয়ে শুকিয়ে মরে যাবে।

কাকুতি মিনতি, চোখের জলের সঙ্গে পুরো মাসের মাহিনা আর মোড়কটি স্যুটধারীর হাতে দিয়ে ভদ্রলোক সে যাত্রা অব্যাহতি পেলেন।

মোড়কটা তাহলে ভদ্রলোকের আমের থলির ভেতর এলো কেমন করে ? ভদ্রলোকের অলক্ষ্যে তাঁরই র‍্যাশন ব্যাগের মধ্যে কোকেনের মোড়কটা ফেলে দিয়েছিলেন ঐ স্যুটধারী—ট্রামে আসবার সময়। কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট থেকে তাঁকে ফলো করে এসে সুযোগ বুঝে পাকড়াও করলে শ্যামবাজারে। আসলে ঐ স্যুটধারী গোয়েন্দা বিভাগের লোকই নয়। ও একজন ঠক্। ব্ল্যাক মেলিঙই ওর পেশা।

ভদ্রলোক থানায় যেতে যদি রাজি হতো তাহলে ঐ স্যুটধারী কি করতো ? বামাল সমেত ভদ্রলোক থানায় যেতেই পারেন না—এমনি বেকায়দায় তিনি পড়ে গেছেন। দুষ্কৃতকারীরা এমনি বেকায়দায় ফেলেই নিরীহ ভদ্রলোকদের সর্বনাশ করে থাকে।

'আমার পুত্র শ্রীমান নীলমণি দত্ত (ডাক নাম নীলু) গত ৩রা জুন হইতে নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে। বয়স ছয় বৎসর। রঙ ফর্সা, কপালে একটা কাটা দাগ আছে। পরণে হাফ প্যান্ট, গায়ে বুস সার্ট, খালি পা। বাংলা মাতৃভাষা। ছেলেটিকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পৌঁছে দিলে বা খোঁজ দিলে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে। হরিহর দত্ত। কাজলপুর পোষ্ট, গ্রাম কাজলপুর। জেলা হাওড়া।'

খবরের কাগজের উপরিউক্ত বিজ্ঞাপনের কাটিঙটি সহ নিম্নলিখিত পত্রখানি পেলেন হরিহর দত্ত।

শ্রীহরিহর দত্ত

সমীপেষু ঃ—

মহোদয়,

আপনার নিরুদ্দিষ্ট পুত্র শ্রীমান নীলমণি ভাল আছে। তবে তার জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে আপনারই সুবিবেচনার উপর। ভাবিয়া দেখিবেন—আপনার ঐ একমাত্র পুত্র শ্রীমান নীলমণি একদিন আপনার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হইবে। আপনি লক্ষপতি বা তাহার অধিক অর্থের অধিকারী। তাই আপনার পুত্রের অমূল্য জীবনের মূল্য হিসাবে আমরা কিছু পারিতোষিক আশা করি। আগামী রবিবার (১৫ই জুন) রাত্রি দুইটার সময় কাজলা দীঘির ধারে বুড়ো বটগাছের তলায় আপনি নগদ পাঁচ হাজার টাকা লইয়া আসিবেন। টাকার বিনিময়ে সুস্থ পুত্রকে লইয়া নির্বিঘ্নে বাড়ী ফিরিবেন। কোনরূপ তঞ্চকতা করিলে আপনার পুত্রের মৃতদেহ কাজলা দীঘির জলে ভাসিতে দেখিবেন। আমাদের সততার উপর বিশ্বাস রাখিবেন।

ইতি

আপনারই

হিতাকাঙ্খী।

হরিহরবাবু নির্দিষ্ট দিনে নির্দ্ধারিত সময়ে কাজলা দীঘির ধারে বুড়ো বটগাছের তলায় গিয়ে হাজির হলেন। সঙ্গে তাঁর পাঁচ হাজার টাকা। দু'জন লোক তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। একজনের কাঁধে ঘুমন্ত নীলমণি অন্যজনের বাঁ হাতে টর্চ আর ডান হাতে পিস্তল।

নমস্কার করে পিস্তলধারী নীরবে হাত পাতলে। হরিহরবাবু পাঁচ হাজার টাকার নোটের বাণ্ডিলটি তার হাতে দিলেন। দ্বিতীয়

ব্যক্তি ঘুমন্ত নীলমণিকে হরিহরবাবুর কোলে তুলে দিয়ে নমস্কার করলে।

ঘুমন্ত শিশুকে কোলে নিয়ে হরিহরবাবু বাড়ীর পথে ফিরলেন, তাঁর কানে এলো একটা 'হুইসিলের' আওয়াজ।

—লেন-দেন তো হয়ে গেল আবার 'হুইসিল' কেন? ঘাবড়ে গেলেন হরিহরবাবু।

ওরা শুধু দু'জন আসেনি। সঙ্গে দলবল নিয়ে এসেছিল, তারা লুকিয়েছিল কাজলা দীঘির আশ পাশের জঙ্গলে। যুদ্ধের জন্য সকলেই ছিল প্রস্তুত। হরিহরবাবু দুষমণির চেষ্টা করলে তারাও ছেড়ে কথা কইতো না।

হরিহরবাবু হয় তো পুলিশের শরণাপন্ন হতে পারতেন, কিন্তু ছেলেটিকে হারাবার ভয়ে পুলিশের শরণাপন্ন হননি। পাঁচ হাজার টাকার জন্য দুবৃত্তদের সঙ্গে ভঞ্চকতা করলে হয়তো তাঁর নীলমণিকে মৃত অবস্থায় কাজলা দীঘির জলেই ভাসতে দেখতেন। তবে এ ভাবে দুষ্কৃতকারীদের প্রশ্রয় দেওয়া কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। এতে তাদের বুকের বল বেড়ে যাবে। হরিহরবাবুর মত অনেক 'বাবুরই' ছেলে চুরি করে তারা সমাজ ও রাষ্ট্রে একটা বিশৃঙ্খলা নিয়ে আসবে। দুষ্কৃতকারীদের শাস্তি দানের জন্য সকলেরই কর্তব্য পুলিশ বা রক্ষী বিভাগের সঙ্গে সহযোগীতা করা।

নিউ মার্কেটের বিপরীত দিকে ফুটপাথের ধারে গাড়ীর ভেতর চুপচাপ বসে আছি—দরজার কাচ তুলে দিয়ে। বোনের বিয়ের জন্য সারাদিন বাজার করে খুবই পরিশ্রান্ত। বেশ জব্বর শীত পড়েছে। মাথা পর্য্যন্ত শালটা ঢাকা দিয়ে বসে থাকতে থাকতে কখন যে তন্দ্রা এসে গেল তা টেরই পেলাম না। সরকার মশাই কতকগুলো জিনিষ কিনতে গেছেন নিউ মার্কেটে। রাত প্রায় ন'টা।

হঠাৎ একটা মৃদু ঝাঁকানিতে আমার তন্দ্রা ভেঙে গেল। দেখি আমার পাশে বসে একটি তথাকথিত আধুনিকা।

—কে আপনি?

—টাকা দিন।

—টাকা! কেন—আপনাকে টাকা দেবো কেন? কার Permission নিয়ে আপনি গাড়ীতে উঠে গাড়ীর দরজা বন্ধ করেছেন?

—আমাকে নিয়ে এতক্ষণ স্ফূর্তি করলেন গাড়ীতে বসে—আবার বলছেন—কার পারমিসনে গাড়ীতে উঠেছি। শীগ্‌গীর টাকা বার করুন নইলে আমি চীৎকার করে লোক জড় করবো।

—এটা কি মগের মুল্লুক! নেমে যান বলছি গাড়ী থেকে।

টাকা পেলেই আমি নেমে যাবো। টাকা না দেন আমি এখুনি চেঁচিয়ে লোক জড় করে বলবো যে টাকা দেবার লোভ দেখিয়ে ভদ্রলোক আমার দেহ উপভোগ করে এখন টাকা না দিয়ে আমায় অসহায় পেয়ে ভাগিয়ে দিচ্ছেন। আপনারাই এর বিচার করুন। তখন আপনার অবস্থাটা কি হবে একবার চিন্তা করে দেখুন কথাগুলি বলে যেতে আধুনিকার মুখে একটুও বাধলো না।

আমি অবাক হয়ে গেলাম তার স্পষ্ট যুক্তি এবং নির্লজ্জ উক্তি শুনে। শীতের রাতে ঘামতে সুরু করলাম। সরকার মশাই আর ড্রাইভার যদি এসে একটা অপরিচিতা মেয়েকে আমার পাশে দেখেন আর মেয়েটি যদি নির্লজ্জ কণ্ঠে তার উপস্থিতির কারণ এইভাবে ব্যক্ত করে তাহলে আমার অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? থানায় ধরে নিয়ে গেলেও কি এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবো? কেমন করে প্রমাণ করবো যে আমি নির্দোষ আর মেয়েটি মিথ্যাবাদী, শঠ, প্রবঞ্চক, ব্ল্যাক মেলার!

আর ভাবতে পারলাম না। ব্যাগটা খুলে বললাম, কত দিতে হবে?

—অন্ততঃ পঞ্চাশ!

পাঁচখানি দশ টাকার নোট গুণে নিয়ে গাড়ী থেকে নামতে নামতে মেয়েটি মৃদু হেসে বললে, গুড্ নাইট!

ভদ্রলোকের উচিত ছিল সাহস করে তাকে থানায় ধরে নিয়ে যাওয়া।

-ঝুঁকি ঝামেলার ভয়ে অন্যায় এবং পাপকে প্রশ্রয় দিলে অন্যায় আর পাপের মাত্রা ক্রমশঃই বেড়ে যাবে।) অপরাধিনীকে থানায় ধরে নিয়ে গেলে ভদ্রলোক শুধু যে নিজেই উপকৃত হতেন তা নয় —পরোক্ষ ভাবে অন্যান্য লোকেরও উপকার করতেন। ভদ্র-লোকের হেতুহীন লজ্জার কোন অর্থই হয় না!

Bead gambling বা ঘুঁটি খেলা। আসলে এই ঘুঁটি খেলা জুয়া নয়—জুয়ার অভিনয় করে লোককে প্রতারণা। লোক ঠকাবার এই পদ্ধতিকে বলা হয় নওসেরা। এই নওসেরা দলে অনেকগুলি লোক থাকে। তারা জনে জনে অভিনেতা অর্থাৎ তাদের মধ্যে কেউ বা সাজে রাজা, কেউ দেওয়ান, কেউ ম্যানেজার, কেউ ড্রাইভার আবার কেউ বা দ্বারোয়ান। সময় সময় এদের দলে রাণী এবং রাজকুমারীর দেখাও পাওয়া যায়।

বড় বড় শহরে এসে পুরাতন জমিদার বাড়ী ভাড়া নিয়ে এরা আড্ডা জমায়। এদের দালালরা ধনী ব্যক্তিদের কথার মারপ্যাঁচে ভুলিয়ে আড্ডায় নিয়ে এসে তোলে। কেউ আসে ঐ সাজা রাজার কাছে খনির শেয়ার কিনতে, কেউ বা আসে বন-জঙ্গল ইজারা নিতে আবার কেউ বা আসে তার নব প্রতিষ্ঠিত ফ্যাক্টরীর মোটা সেয়ার বিক্রির চেষ্টায়—এমনি একটা না একটা কাজ নিয়ে এসে এদের বাক-চাতুর্য্যে প্রলুব্ধ হয়ে ঘুঁটি খেলায় মেতে ওঠে ঐ রাজাবাহাদুরের সঙ্গে। প্রথম কয়েক দান ইচ্ছে করেই ওরা জিতিয়ে দেয় শিকারটিকে। আগন্তুক দু'তিন দান জিতে উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে।

তারপর সুরু হয় তার হারার পালা। যা জিতেছিল তা তো যায়ই —উপরন্তু হারাতে হয় যা সে এনেছিল বাড়ী থেকে। স্রেফ হাত সাফাইয়ের সাহায্যেই প্রবঞ্চকরা হারিয়ে দেয় আগন্তুককে। আসল কাজের কাজ তো কিছুই হয় না, শেষ পর্য্যন্ত সর্বস্বান্ত হ'য়ে তাদের ঘরে ফিরে যেতে হয়।

অনেক সময় এমনও দেখা গেছে যে প্রবঞ্চিত ব্যক্তিকে এরা দলভুক্ত করে নিয়েছে।

সর্বহারা প্রবঞ্চিত ব্যক্তি এসে ওদের শরণাপন্ন হ'য়ে বলে—আমায় বাঁচান। নইলে হয়তো আমায় আত্মহত্যা করতে হবে।

ওরা তখন কি দয়া পরবশ হ'য়ে প্রবঞ্চিতকে তার টাকা পয়সা ফিরিয়ে দেয়?

মোটেই নয়। ওরা তখন প্রবঞ্চিতকে বলে যে সে যদি বাইরে থেকে ধনী পাকড়ে তাদের আড্ডায় নিয়ে আসে তাহলে সেই ধনীকে ঠকিয়ে প্রবঞ্চিতকে কিছু কিছু করে তার টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হবে আর দলের একজন সভ্য হিসাবে সে তার হিস্যাও পাবে। স্বার্থের খাতিরে প্রবঞ্চিত তখন ওদের দলভুক্ত হ'যে ঠকাবার মত তুবলচেও। ধনীর সন্ধানে ফেরে আর সুযোগ সুবিধা মত নতুন শিকারদের এনে তোলে এই নওসেরা দলের আড্ডায়।

ধরা পড়'র ভয়ে বেশী দিন এরা এক জায়গায় থাকে না। ভারতের বিভিন্ন বড় বড় শহরে এরা ঘুরে বেড়ায়।

প্রতারকদের কাছে ফিরে না গিয়ে বা প্রতারকদের শরণাপন্ন না হ'য়ে প্রবঞ্চিত ব্যক্তিদের উচিত পুলিশের শরণাপন্ন হওয়া। কিন্তু পুলিশের শরণাপন্ন না হবার প্রথম কারণ লোকলজ্জা। জুয়াখেলা একটি অপরাধ। তিনি নিজে জুয়া খেলেছেন—অতএব তিনি নিজেও অপরাধী! পুলিশের শরণাপন্ন হলে হিতে বিপরিত হ'য়ে যাবে—প্রতিকার হওয়া দূরে থাক, উল্টে তাঁকেই শাস্তি পেতে হবে এই অহেতুক ভয়ের জন্যই প্রবঞ্চিত ব্যক্তিরা পুলিশের

শরণাপন্ন হন না। প্রবঞ্চিত ব্যক্তিগণ পুলিশের শরণাপন্ন না হওয়ার ফলে নওসেরা দল আরো বেশী প্রশ্রয় পেয়ে থাকে।

বর্তমান যুগ বড় সাঙ্ঘাতিক যুগ। যে যাকে পাচ্ছে—সে তাকে প্রতারিত করছে নানা পন্থায়, নানা পদ্ধতিতে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় নব আবিষ্কৃত বিভিন্ন প্রতারণা পদ্ধতির কবলে পড়ে লোক যে কি মর্মান্তিক ভাবে প্রতারিত হয়েছে তার আর কোন লেখা-জোখা নেই। তবে লোভের বশে বা প্রয়োজনের তাগিদে প্রতারিত যারা হ'য়েছে তারা ঐ প্রতারকদের মতই সম দোষে দোষী।

টপকা ঠগী। পাঁচ, ছ'জন লোক নিয়ে এই টপকাঠগীর দল তৈরী হয়। চকচকে পালিশ করা পিতলের বাটকে এরা সোনার বাট বলে সাধারণতঃ গ্রাম্য লোকেদের ঠকিয়ে থাকে। এদের দলের প্রতারণা পদ্ধতি কতকটা ঐ নওসেরা দলেরই মত। টপকাঠগী দলের পাঁচ ছ'জন লোক পাঁচ ছ'টি (কেউ বা অন্ধ কেউ বা ভিখিরী, কেউ বা ভদ্রলোক আবার কেউ বা এক গাঁইয়া) ভূমিকায় অভিনয় করে লোক ঠকিয়ে থাকে।

সন্ধ্যা তখনও হয়নি, গোধূলি বেলা।

ভূধববাবু সারাদিনের খাটুনির পর অফিস থেকে বাড়ী ফিরছেন। বড় রাস্তার মোড় থেকে খানিকটা এগিয়ে এসেছেন এমন সময় জন তিনেক বিভিন্ন বয়সের লোক তাঁকে প্রায় সমস্বরে পিছন থেকে ডাকলেন, ও মশাই—ও মশাই। এই যে ছাতা হাতে—

—আমাকে বলছেন ?

—হ্যাঁ আপনাকে। আপনার পকেট থেকে কি পড়ে গেল—যে—ঐ নীল কাগজে মোড়া! বললে প্রৌঢ় গোছের এক ভারিক্কি ভদ্রলোক।

ভূধরবাবু পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে ওদের কাছে এগিয়ে

এসে বললেন, কই না—আমার পকেট থেকে তো কিছু পড়েনি!

ভূধরবাবুর মুখের কথা শেষ হ'তে না হ'তে একটা ছোকরা ছুটে গিয়ে সেটা তুলে নিলে। সবাই গিয়ে ছোকরাকে ঘিরে দাঁড়াল জিনিষটা দেখবার জন্য। ভূধরবাবুও কৌতূহলী হ'য়ে এগিয়ে এলেন।

নীল কাগজে মোড়া জিনিষটি আর কিছুই নয়—একটি চকচকে সোনার বালা।

ভারিক্কি গোছের প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন ভূধরবাবুকে দেখিয়ে, বালা যখন এঁর নয় তখন এটা তুমি থানায় জমা দিয়ে এসো।

—সে যা বলেছেন মশাই! থানায় আমি এটা জমা দিতে যাই আর আমার হাতে দড়ি পড়ুক!

—কেন—দড়ি পড়বে কেন! তুমি তো ভাল কাজই করছো—কুড়িয়ে পাওয়া জিনিষ থানায় জমা দিচ্ছো! বললেন ভূধরবাবু।

—সে কথা কে বিশ্বাস করবে মশাই! বলবে—শালা চুরি করে বেকায়দায় পড়ে গেছে তাই শালা থানায় জমা দিতে এসেছে।

—ঠিক বলেছিস রে! নইলে এমন সাচ্চা কোন শালা আছে যে বেওয়ারিস মাল থানায় জমা দিতে যায়!

ভারিক্কে ভদ্রলোক বললেন, তোমরা তাহলে বালাটা কি করবে?

—কি আবার করবো—বেচে দেবো!

—দোকানে ঐ খাঁটি সোনার বালা—শালা যাওনা বেচতে—চোর বলে যদি পুলিশে ধরিয়ে না দেয় তো আমায় কুত্তা বলে ডাকিস। বললে তার স্যাঙাৎ।

—ভারিক্কে ভদ্রলোককে বললে ছোকরাটি, লেন তো লেন না মশাই! সস্তা করে ঝেড়ে দিচ্ছি!

ভূধরবাবু বললেন, কত চাও?

—আরে মশাই কমসে কম তিন ভরির বালা! পুরোপুরি একখানা তো ঝাড়বেন!

ভারিক্কে ভদ্রলোক যেন আঁতকে উঠে বললেন, এ-ক-শো!

—টাকা হ'য়ে গেলেন যে মশাই! কুড়িয়ে পাওয়া বলে মাটির দরে ছেড়ে দিচ্ছি তবু মন উঠছে না! কত দিবেন?

—মেরে কেটে পঞ্চাশটি টাকা দিতে পারি। বললেন ভারিক্কি ভদ্রলোক।

—আপনি আর কিছু বাড়ুন! বললে ভূধরবাবুর দিকে চেয়ে ঐ ছোকরাটি।

আমার কাছে মাত্র পঞ্চাশটি টাকাই আছে। বললেন ভূধরবাবু।

ছোকরার স্যাঙাৎ বললে, এ বাবু যদি বলতেন—'এটা আমার বালা' তাহলে 'কি' টাকায় বালাটা তো দিতে হ'তো। বাবু যখন পঞ্চাশের বেশী উঠছেন না তখন এই ছাতা-হাতে বাবুকেই বালাটা দিয়ে দে শালা।

তৃতীয় ব্যক্তি মন্তব্য করলে, তোমার তো বাবু সবটাই লাভ।

—সবাই যখন আপনাকেই দিতে বলছে—নেন তবে।

পঞ্চাশটি টাকা গুনে দিয়ে বালাটি পকেটস্থ করে সন্ধ্যা বেলা ভূধরবাবু সানন্দে বাড়ী ফিরলেন।

মুখ হাত ধুয়ে জলযোগ সেরে ভূধরবাবু গিন্নীকে বললেন. চা-টা ঘরে নিয়ে এসো।

চায়ের পিয়ালা নিয়ে গৃহিণীকে ঘরে ঢুকতে দেখে ভূধরবাবু বললেন, আজ তোমার জন্যে একটা উপহার নিয়ে এসেছি গিন্নী।

—ঢঙ্ ঢঙ্ রেখে চা-টা খেয়ে ফেল দিকি! নাতি নাতনী হলো তবু ঢঙ্ ছাড়তে পারলে না।

নীল কাগজ মোড়া বালাটি পকেট থেকে বার করে গিন্নীর হাতে দিলেন ভূধরবাবু।

—এক গাছা! মুখ মুচকে বললেন গৃহিণী।

—ক ভরি হবে?

বালাটি হাতে নাচিয়ে গৃহিণী বললেন, তা ভরি দুয়েক হবে।

—কক্ষনো নয়। তিন ভরির বেশী তো কম নয়। বলে বলয় প্রাপ্তির আদ্য-প্রান্ত ইতিকথা গৃহিণীর কাছে সোৎসাহে বর্ণনা করে গেলেন ভূধরবাবু।

গৃহিণী মহাখুশী। তিনি এই বালা গাছটি ভেঙে চুড়ি তৈরীর সিদ্ধান্ত করলেন। কিন্তু তর্ক বাধলো ভরি নিয়ে। কর্তা বলেন—তিন ভরি, আর গৃহিণী বলেন—দু'ভরির বেশী নয়।

ভূধরবাবুর ছোট ভাই অধরবাবু সেই রাত্রে বালা নিয়ে ওজন করাতে গেলেন স্যাকরার দোকানে—বৌদির অনুরোধে। ফিরে এসে বললেন, দাদার কথাই ঠিক। বালাটা ওজনে তিন ভরির বেশীই আছে। সওয়া তিন ভরি।

—কেমন আমি তোমায় বলিনি। আমার হাতে পড়লে জিনিষের ওজন যদি না ধরা যায়—

—থামো—থামো—আর ঢঙ্ করতে হবে না। খুশীভরা কণ্ঠে স্বামীর দিকে চেয়ে বললেন গৃহিণী।

—বালার ওজনটা দাদা ঠিকই ধরেছেন কিন্তু জিনিষটা আসল কি নকল তা ধরতে পারেননি।

—তার মানে?

—কষ্টি পাথরে যাচাই করে হীরু স্যাকরা বললে, এটা সোনা নয়—পিতল।

ছুটির দিন।

দিবানিদ্রার আগে বৈঠকখানায় আধসোওয়া অবস্থায় খবরের কাগজটা ওলটাচ্ছি এমন সময় গলদঘর্ম হ'য়ে একটি যুবক এসে নমস্কার করে বললে, কমলবাবু (আমার ছোট ভাই) যে কাপড়

আর ছিটের কথা বলেছিলেন তার সন্ধান পেয়েছি—একেবারে কণ্ট্রোল দরে। এখুনি কিন্তু নিতে হবে। কাকেও টাকা দিয়ে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিন।

আমার ছোট ভাই কমল এক প্রেসের মালিক। কমলের কাছে মাঝে মাঝে যুবকটিকে আসতে আমি দেখেছি। তবু জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি কর? তোমার নাম কি?

—আজ্ঞে আমি তো কমলবাবুর প্রেসে কাজ করি। কমলবাবু বলেছিলেন—রবিবার দুপুরে আমি শ্রীরামপুর যাবো। কাপড় যদি যোগাড় করতে পারো তাহলে দাদাকে গিয়ে খবর দিও। টাকার ব্যবস্থা তিনিই করে দেবেন। আমার নাম—দেবেন চক্রবর্তী

আমার পিসতুতো ভাইয়ের আজ পাকা দেখা। তাই কমলকে শ্রীরামপুর যেতে হয়েছে। ছেলেটি যখন কমলের প্রেসে কাজ করে তখন অবিশ্বাসের আর কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া কণ্টোল রেটে কাপড়ের কথা আমিই কমলকে বলেছিলাম।

—কাপড় পেলে তবে টাকা দেবে। বলে আমার ভাইপোর হাতে টাকা দিয়ে যুবকটির সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম।

সন্ধ্যার সময় আমার ভাইপো শুধু হাতে মুখটি চূণ করে ফিরে এলো।

আমার ভাইপো শ্যামলকে নিয়ে যুবকটি একটা কাপড়ের দোকানে গিয়ে ঢুকলো—বড় বাজার অঞ্চলে। দোকানের ভেতর একটা বেঞ্চীতে শ্যামলকে বসিয়ে তার কাছ থেকে টাকাটা চেয়ে নিয়ে যুবকটি কাপড় আনবার জন্য দোকানের মাঝখানে গিয়ে বসলো। এ কাপড় ও কাপড়, নানা রকমের ছিট্ প্রায় আধঘণ্টা ধরে পছন্দই করছে।

শারীরিক প্রয়োজনে বিপরীত ফুটপাথে প্রস্রাবখানায় যেতে হলো শ্যামলকে, ফিরে এসে আর যুবকটিকে দেখতে পেলে না।

দোকানের লোক বললে, কাপড় পছন্দ না হওয়ায় তিনি চলে গেলেন। আর কণ্ট্রোলের কাপড় তো আমরা বেচি না।

রাত্রে কমলবাবু ফিরে এসে বললেন, দেবেন চক্রবর্তী বলে কোন লোক তো আমার প্রেসে কাজ করে না। তবে একজন ছোকরা মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতেও আসতো আবার প্রেসেও যেতে— কোন একটা কাজের জন্য তার নাম দেবেন চক্রবর্তী কি না তাতো বলতে পারি না। তবে কণ্ট্রোল রেটে কাপড়ের জন্য আমি দু'একজনকে বলেছিলুম। হয়তো ঐ লোকটা সে সব কথা শুনে থাকবে। তবে বড়দার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আমি কাকেও কাপড় কিনে দিতে বলিনি। আজ আমি শ্রীরামপুর যাবো—এই খবরটা কারো কাছ থেকে জেনে সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে। মোট কথা—কাজের জন্য আর সে কোন দিন এসে আমায় বিরক্ত করবে না। আপাততঃ পঞ্চাশটা টাকার ওপর দিয়েই গ্রহ কাটলো।

বৌবাজার অঞ্চলে কোন একটি বিখ্যাত জুয়েলারী সপের সামনেটা লোকে লোকারণ্য। রাত নয়—সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা মাত্র। কোল্যাপসেবল গেটে তালা পড়েছে। ভেতরে লক্ষ্য করলে চোখে পড়ে—দোকানের কর্মচারীবৃন্দ, বন্দুকধারী দুজন দ্বারোয়ান আর আধুনিক সাজে সজ্জিতা এক সুন্দরী মহিলা।

হঠাৎ পুলিশ ভ্যান এসে দাড়াল দোকানের সামনে। খুলে গেল গেট। পুলিশ অফিসার দোকানের ভিতর ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আবার গেটে তালা পড়লো।

পুলিশ অফিসারকে দোকানের ম্যানেজার বললেন, এই ভদ্র-মহিলা ৩৫০০ টাকা দামের জড়োয়ার গহনা পছন্দ করে ক্যাশ মেমো করতে বললেন। আমরা ক্যাশ মেমো করে টাকা চাইতে উনি বললেন—টাকা তো আমি আগেই দিয়েছি। উনি টাকা না দিয়ে

ঐ সাড়ে তিন হাজার টাকার গহনা দাবী করেন। তাই আপনাদের ফোন করতে বাধ্য হয়েছি।

ভদ্রমহিলা বললেন, টাকা আমি দিয়েছি। এই আমার নোটের নম্বর। সত্যি কি মিথ্যে—ওঁদের ক্যাশ অনুসন্ধান করে দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন।

ক্যাশ মিলিয়ে দেখা গেল—ভদ্রমহিলার কথাই সত্য, নম্বরী নোট মিলছে।

কিন্তু মজা হচ্ছে এই—ভদ্রমহিলা সাড়ে তিন হাজার টাকার যে যে গহনা নিয়েছেন ঠিক অনুরূপ মূল্যের সেই সেই গহনার হুবহু আর একখানি ক্যাশ মেমো হয়েছে ঘণ্টাখানেক আগে। এখন যদি ধরা যায় যে ভদ্রমহিলা ঐ নম্বরী নোটগুলি দিয়েছেন তাহলে অনুরূপ মূল্যের আগের ক্যাশ মেমোটির টাকা ক্যাশে কম পড়ে। মোটকথা—দুখানি ক্যাশ মেমোর মধ্যে একটির টাকা ক্রেতার কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। সেই ক্রেতা দুটির মধ্যে প্রবঞ্চকতা করেছে হয় এই ভদ্রমহিলা আর নয় আগের জন অর্থাৎ প্রথম ক্রেতা।

এখন কথা হচ্ছে—ভদ্রমহিলা যদি টাকা না দিয়ে থাকেন তাহলে নোটের নম্বরগুলি পেলেন কোথায়। নিশ্চয় প্রথম ক্রেতার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে। প্রথম ক্রেতা টাকা দেবার আগে নোটের নম্বরগুলি টুকে রেখেছিলেন। সেই টাকা নম্বরগুলি নিয়ে দ্বিতীয় ক্রেতা অর্থাৎ এই ভদ্রমহিলা এসেছেন অনুরূপ মূল্যের সেই একই প্যাটার্নের গহনাগুলি প্রবঞ্চনা করে নিয়ে যেতে।

পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে গেলেন ভদ্রমহিলাকে। শেষ পর্যন্ত কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়লো। ধরা পড়লো তাদের পুরো গ্যাঙটি।

ধর্মের নামে প্রতারণা '

'গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে। লেখাপড়া বিশেষ কিছুই শিখিনি।

গ্রামে যজমান যে ক'জন ছিল তার অর্দ্ধেকেরও বেশী রোজগারের তাগিদে শহরে গিয়ে উঠেছে। যারা আছে তাদের অবস্থাও সঙ্গীন। অল্প বয়সে বাবা আমার বিয়ে দিয়েছিলেন। বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন 'এর টুপি ওর মাথায়—ওর টুপি এর মাথায়' নিয়ে কোন গতিকে শাক ভাত খেয়ে সংসারটা চালিয়ে আসছিলেন কিন্তু বাবা মাবা যাবার পর সংসার অচল হয়ে উঠলো। কোনগতিকে ট্রেণ ভাড়াটা জোগাড় করে চাকরীর চেষ্টায় এলাম শহরে। জানা নেই, শোনা নেই—কে দেবে চাকরী! দুদিন ঘুরেও কিছু করতে পারলাম না। বুঝলাম—লেখাপড়া কিছুটা আর মুরুব্বির জোর না থাকলে চাকরী জোটান মুস্কিল।

বসে আছি গঙ্গার ঘাটে। ভাবছি নিজের দুরাদৃষ্টের কথা। বাড়ীতে মা, দুটি বাচ্চা আর বৌ। কি করে যে তাদের চলছে তা জানেন ভগবান। হঠাৎ একজন লোক আমার সামনে একটা শাল-পাতা পেতে দিলে। ধামাধারী তার সঙ্গীটি ঐ ধামা থেকে খান কয়েক পুরি আর খান চারেক অমৃতি শালপাতায় দিয়ে গেল। যার গলায় পৈতে দেখছে তাকেই দিচ্ছে ঐ পুরি আর অমৃতি। শুনলাম —মাদুলি ধারণ করে জনৈক ধনীর একমাত্র পুত্রসন্তান দুরারোগ্য ব্যাধি মুক্ত হয়ে সুস্থ হ'য়ে উঠেছে তাই এই পুরি ও মিষ্টান্ন বিতরণ।

মাদুলি, কবচ—এ সব আমি কোন কালে বিশ্বাস করিনি। তা আমি না বিশ্বাস করি কিন্তু লোককে বিশ্বাস করাতে ক্ষতি কি! মাথায় আমার দুষ্টু সরস্বতী চাপলো স্বপ্নাদ্য মাদুলি দিয়ে আমিই বা লোকের রোগ না সারাই কেন। কিন্তু কারবার ফাঁদতে হলে ক্যাপিট্যাল দরকার। আমার তো সম্বল এই পৈতে গাছটি আর ফতুয়ার পকেটে গোটা কয়েক খুচরো পয়সা। মাদুলির কারবার মাথায় যখন ঢুকেছে তখন একবার দেখতে হবে শেষ পর্য্যন্ত।

ভোর বেলা ঘুম ভাঙলো। গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে এসে কাপড়

ছাড়ছি—মস্তকমুণ্ডিত একটি ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন, আমি একটি বাঙালী পুরোহিত খুঁজছি। আপনি কি—

—আজ্ঞে হ্যাঁ।—পৌরহিত্য করাই আমার কাজ। দেশে আমার বহু যজমান

—আমার মায়ের শ্রাদ্ধটা যদি করিয়ে দেন তো বড়ই—মানে জিনিষ পত্তর সব খুঁটিয়ে জোগাড় করে এনেছি।

হাতে স্বর্গ পেলাম। বসে গেলাম শ্রাদ্ধ করাতে।

শ্রাদ্ধ শেষ হতে দুপুর হয়ে গেল। ভদ্রলোক আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। বাড়ীতে ভদ্রলোকের স্ত্রী ছাড়া আর আপনার লোক কেউ নেই। উনি বিদেশে চাকরী করেন, বুড়ো মা গঙ্গাপ্রাপ্তির আশায় এখানে ছিলেন। আশা তাঁর পূর্ণ হয়েছে।

আমার অবস্থার কথা সবই তাঁকে বললাম। তিনি তাঁর বাড়ীতে থাকার অনুমতি আমায় দিলেন।

দিন তিনেক পরে তিনি তাঁর কর্মস্থলে চলে গেলেন। বাড়ীতে রইলাম আমি আর একটি চাকর। বাড়ী দেখা শোনার ভার আমাদের ওপরই দিয়ে গেলেন। ট্রেণে তাঁদের তুলে দিতে গেলাম। বিদায় বেলায় তিনি আমায় কুড়িটি টাকা দিলেন আর কাপড় গামছা প্রভৃতি শ্রাদ্ধ-সংক্রান্ত ব্যাপারে যা পাবার তাতো পেয়েইছি।

বাবুর বাড়ীর চাকরটির সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিলাম। সে হলো আমার সাথী, আমার চেলা।

মনুয়ার সাহায্যে বাবুর বাড়ীর সামনের রকে ছোট একটি ঘর করে স্থাপন করলাম ছোট্ট একটি শনি ঠাকুর। একশো মাদুলি কিনে আনলাম মনুয়াকে দিয়ে ঐ মাদুলিগুলির ভিতর এক কুঁচো ফুল আর তেল-মাটি দিয়ে ভরিয়ে নিলাম। 'বাঞ্ছাপূর্ণ স্বপ্নাদ্য মাদুলী!' এখানে পাওয়া যায়।—ক'টি কথা একটি কাগজে লিখে ছোট্ট একফালি টিনের ওপর আঠা দিয়ে সেঁটে ঠাকুর ঘরের সামনে ঝুলিয়ে দিলাম।

পুঁজি মাত্র কুড়িটি টাকা। তোড়জোড় করে বসতেই অর্দ্ধেক ফাঁক হ'য়ে গেল। বাড়ার তো কোন কাজ নেই। মনুয়া আমার কাজ নিয়েই মেতে পড়লো। আমি বাঁধি—মনুয়া জোগাড় দেয়। এ ছাড়া সারাক্ষণ আমরা ভেক নিয়ে বসে থাকি শনি ঠাকুরের সামনে। সকালে, সন্ধ্যায় যথাসম্ভব ঘটা করে পূজা, আরতি হয়। প্রতি শনিবার বাজার থেকে সস্তায় মনুয়া ফুলের মালা কিনে এনে ঠাকুর সাজায়।

হাতের টাকা ফুরিয়ে এলো আসর জমাতে জমাতে মনুয়া আশ্বাস দিয়ে বলে, কোন চিন্তা নাই দা ঠাকুর [illegible] ঠাকুর দয়া করবেই করবে

[illegible] দুদিন পরে দু'জনের [illegible] এসে [illegible] উঠতে লাগলো। মাদুলীও বিক্রি সুরু হলো। [illegible] হিসাবে দাম— চার পয়সা থেকে চার আনা।

ছ'মাস যেতে না যেতে আমাদের ভোল ফিরে গেল। ঠাকুর পুজোর জন্যে ডাব একটা আর কলা হলো কাসর ঘটা। আমাদের ধারে কাছেও যারা ঘেঁসতো না তারা একে একে এসে জমতে সুরু করলো। দিন যায়।

সাধা ধুতি ছেড়ে গরদের থান পরলাম। মনুয়ার ভেকও বদলে গেল মাদুলি বিক্রী হয় পাঁচ আনা থেকে পাঁচ টাকা।

বাবুর বাড়ীর দুখানা ঘর ভাড়া নিয়েছি ঠাকুর বক থেকে ঘরে উঠেছেন। একটা ঘরে ঠাকুর আর পাশের ঘরে যাত্রী আর আমার অফিস। মাদুলী তৈরীর জন্য একজন মাইনে করা লোক রাখতে হয়েছে। বেচা কেনার ভার কিন্তু মনুয়ার ওপর। মনুয়া হচ্ছে আমার ম্যানেজার।

দেশে দালান কোঠা করেছি। জমি-জায়গা কিনেছি। মনুয়ারও দেশের অবস্থা দিয়েছি ফিরিয়ে। সত্যি কথা বলতে কি—সাথী হিসাবে মনুয়াকে না পেলে আমি আজ দাঁড়াতে পারতাম না।

দেবতার নাম ভাঙিয়ে লোক ঠকিয়ে আমি আজ সমাজের একজন! আর যার সঙ্গে যত তঞ্চকতাই করি—মনুয়ার সঙ্গে জীবনে কোনদিন তঞ্চকতা করতে আমি পারবো না।

এই ভাবে আমাদের চোখের সামনে ধর্মের নামে চলেছে প্রবঞ্চনা। আমরা শুনেও শুনি না, দেখেও দেখি না, গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে নির্বিকার ভাবে দিন গুজরান করে চলেছি। এ মোহের কাজল কে মুছে দেবে আমাদের চোখ থেকে!

আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় যাঁকে দেখবার জন্য আপনারা জমায়েত হয়েছেন—উনি একজন মন্ত্রদাতা গুরুঠাকুর

মাথায় বাবরি চুল, পরনে গরদের ধুতি, গায়ে বেনিয়ন, দু'হাতে গোটা ছয়েক আংটি, গলায় হার,—কার্তিকের মত মন ভোলান শ্রী সুদর্শন তরুণটি ব্যাভিচার অপরাধে অপরাধী উনি ওঁর শিষ্য পত্নীকে বুঝিয়েছেন যে উনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আর শিষ্য পত্নী হচ্ছেন রাধিকা। শিষ্য হচ্ছে আয়ান ঘোষ। আয়ান ঘোষের চোখে ধুলো দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী শুনে শ্রীরাধিকা এসে তাঁর প্রাণবল্লভের সঙ্গে চাঁদিনী রাতে মিলিত হতেন যমুনা পুলিনে কদম্ব বৃক্ষতলে।

এখানে স্বামীর অজ্ঞান্তে শ্রীগুরুর সঙ্গে মিলিত হতে ন্যায়তঃ ধর্মতঃ কোন বাধা নেই শিষ্য পত্নীর। গুরুদেবকে সন্তুষ্ট করার অর্থই হলো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী স্বয়ং জগতপতিকে পরিতৃপ্ত করা। কারণ শ্রীগুরুদেব স্বয়ং হচ্ছেন শ্রী ভগবানের প্রতিনিধি। শ্রীগুরুদেবের বাঞ্ছা পূরণ করার অর্থ—পরোক্ষ ভাবে শ্রীকৃষ্ণের বাসনা চরিতার্থ করা।

এই ভাবে ধর্মের ভাঁওতায় প্রতারিত করে ভগবানের প্রতীক শ্রী গুরুদেবরূপী শ্রীকৃষ্ণ দিনের পর দিন অবৈধ সংসর্গ করে আসছেন শিষ্য পত্নীর সঙ্গে প্রায় আজ মাসাবধি কাল।

শিষ্য প্রথম জানতে পেরে অনেক অনুনয়-বিনয় করেছিলেন

গুরুদেবকে—ঐ দুষ্কার্য্য হ'তে নিবৃত্ত হবার জন্য, কিন্তু তিনি ধর্মের দোহাই দিয়ে কিছুতেই শিষ্য পত্নীকে রাধিকার পদ থেকে খারিজ করতে রাজি নন। বাধ্য হ'য়ে তাই শিষ্য আদালতের শরণাপন্ন হ'য়েছেন গুরুদেবকে শায়েস্তা করতে!

--উঃ জ্বলে গেলুম —জ্বলে গেলুম! উঃ ভগবান! তুমি যদি সত্যি থাকো—ওঃ জ্বলে মলুম- ঠাকুর! যার জন্যে আমি আজ পুড়ে মলুম—জ্বলে মলুম—তাকে—তাকে তুমি এর শতেক জ্বালা দিও! লজ্জার হাত এড়াবার জন্যে—বলতে বলতে আশা অজ্ঞান হ'য়ে গেল।

আশার জ্ঞান আর ফিরে এলো না। হাসপাতালেই তার মৃত্যু হলো। গরীব বাপ মা কে, সমাজকে বিশ্বসংসারকে সন্তান সম্ভবা কুমারী আশা চিরদিনের জন্য মুক্তি দিয়ে গেল।

বৈশাখের তপ্ত দুপুর। শহরের রাস্তার পিচ গলে উঠেছে। ফুট-পাথ প্রায় জনশূন্য বললেই হয়। ছোট-খাটো অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ করে আশার বাবা। ভাই বোনে ওরা ন'জন—পাঁচ বোন আর চার ভাই। বড় ভাই বিয়ে করে আলাদা বাসায় উঠে গেছে। আশার পরের ভাইটি প্রেসে কম্পোজিটরের কাজ করে। দু'জনের আয়ে কোন গতিকে সংসার চলে। মেয়ের বিয়ে? যাদের ঘরে তেল থাকতে নুন ফুরোয় আর নুন থাকতে তেল ফুরোয় তারা পণ দিয়ে মেয়ের বিয়ের কথা কল্পনাও করতে পারে না।

সেদিন ভর দুপুরে আশার বাবাকে ধরে ধরে তাদের বাড়ী এনে পৌঁছে দিলে একটি ভদ্র যুবক—নাম তার শঙ্কর মিত্র। আশার বাবা রোদ লেগে মাথা ঘুরে পড়ে গেসলেন রাস্তার ওপর। শঙ্কর তাঁর মাথায় জল দিয়ে সুস্থ করে তোলে। আশার বাবা মহিম

ঘোষের আছে ব্লাড প্রেসার, সঙ্গে ডায়বেটিজ। কাজেই এ যাত্রা খুবই বাঁচিয়ে দিয়েছে শঙ্কর।

মহিমবাবুর পত্নীর অনুরোধে শঙ্করের যাতায়াত সুরু হলো তাঁর বাড়ী। আশার মায়ের সঙ্গে মাসীমা পাতিয়ে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠতে শঙ্করের খুব বেশী সময় লাগলো না বাড়ীর বড় মেয়ে আশা শঙ্করদা বলতে অজ্ঞান। থিয়েটার, বায়স্কোপ, খানা-পিনা—শঙ্করের পয়সায় প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াল। এই ভাবে গোটা সংসারটির পরিজনবর্গকে হাত করে নিল শঙ্কর। এ ছাড়া সংসারের অভাব অনটনের জন্য মাঝে মাঝে মাসীমাকেও হাত পাততে হয় শঙ্করের কাছে। এই অকাতর দানছত্রের মাশুল কিন্তু দিয়ে যেতে হচ্ছে আশাকে। মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার মাত্রাটা দৃষ্টিকটু হওয়ায় মাসীমা আশার সঙ্গে শঙ্করের বিয়ের প্রস্তাব করলেন। শঙ্কর এক কথায় রাজি হ'য়ে গেল। শুধ দৈহিক সম্পর্ক ছাড়া অন্য সকল বিষয়েই আশা লাইসেন্স দিয়ে দিলে তার ভাবী বর শঙ্করকে।

দিন যায়। মাস যায়।

অফিসের বিভাগীয় পরীক্ষার অজুহাত দিয়ে বিয়ের দিন পেছিয়ে দেয় শঙ্কর

একদিন শঙ্করকে একা পেয়ে আশা বললে, আচ্ছা, তুমি আর কতদিন এই ভাবে গড়িমসি করে কাটাবে? মা বাবা অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছেন, আমারও আর ফাঁকা ফাকা ভাল লাগছে না।

—দেখ আশা, জীবন মরণের সাথী যে হবে তাকে গোড়ায় ভাল ভাবে যাচাই করে না নিলে পরে পস্তাতে হয়—যা হচ্ছে শতকরা আশীভাগ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। নেড়ে চেড়ে বেয়ে চেয়ে দেখে না নিলে শেষকালে আর আফশোসের অন্ত থাকে না। বললে শঙ্কর একজন দার্শনিকের মত।

—আমাকে যাচাই করতে—নেড়ে চেড়ে বেয়ে চেয়ে দেখতে এখনো কি তোমার বাকি আছে?

—সম্পূর্ণ যাচাই করা তো আজও হয়নি।

—তার মানে?

উত্তরে শঙ্কর যে ইঙ্গিত দিলে তাতে আশা দস্তুর মত ক্ষুণ্ণ হলে আদ্রকণ্ঠে বললে, ঐ টুকুই তো আমার সম্বল। বিয়ের আগে ওটুকুও তুমি আমায় হারাতে বল?

—সতীত্ব দেহে থাকে না—থাকে মনে। যাকে মন দিয়ে ফেলেছো তাকে কয়েক মুহূর্তের জন্য দেহ দিতেই যত আপত্তি? মন যখন দিয়েছো—দেহ তুমি দাও আর না দাও—মনে প্রাণে তুমি অসতী।

এরপর কাকুতি মিনতি মান অভিমানে আশার যৌনস্পৃহাকে জাগ্রত করে শঙ্কর তার সঙ্গে যৌন-সংসর্গ করলে।

লজ্জার বাঁধ একবার ভাঙলে আর তাকে জোড়া দেওয়া যায় না। মাঝে মাঝেই চলে ওদের অবাধ যৌন সম্মিলন।

বিয়ের আগেই হলো আশা সন্তান সম্ভবা।

বিয়ের দিন স্থির হবে সেই যে শঙ্কর দেশে যাবার নাম করে চলে গেল—আর ফিরলো না।

গর্ভবতী কুমারী মেয়েকে জেনে শুনে কে বিয়ে করবে মনের আগুনে জ্বলে জ্বলে কাপড়ে কেরোসিন ঢেলে একদিন আশা দেশলাই কাঠি জ্বেলে দিলে—বাথরুমে খিল দিয়ে। খিল ভেঙে যখন তাকে বার করা হলো—তখন সে মৃত্যু পথযাত্রী।

প্রবঞ্চক শঙ্কর—একটি নয়, এক সঙ্গে দুটি প্রাণীকে পরোক্ষ ভাবে হত্যা করলে। জোড়া খুনের আসামী হিসাবে শঙ্করের মত দুর্বৃত্তের প্রতারকের চরম শাস্তিই উপযুক্ত শাস্তি। কিন্তু আইনে প্রতারকদের শাস্তি হচ্ছে কারাদণ্ড।

প্রবঞ্চনা, প্রতারণা শুধু পুরুষরা করে না—মেয়েরাও করে থাকে দুর্বলচিত্ত পুরুষকে আয়ত্বে আনতে এই ধরণের মেয়েদের বিশেষ কষ্ট

করতে হয় না। এক শ্রেণীর মেয়ে আছে—প্রবঞ্চনাই যাদের পেশা। সহজে এরা কিন্তু দেহদান করে না। দেহদানের প্রলোভন দেখিয়ে এরা পুরুষকে প্রতারিত করে থাকে।

"আমাদের অফিস ক্লাবে নন্দিতার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' রিহার্সাল হচ্ছিল। গোবিন্দলালের ভূমিকায় আমি আর রোহিনীর ভূমিকায় নন্দিতা। রিহার্সালের পর নন্দিতা আমার সঙ্গে একই বাসে উঠলো বাড়ী যাবার জন্য। তার মৃদু আপত্তি সত্ত্বেও আমিই দুখানা টিকিট কাটলাম। বাসে বসে সেদিনই তাদের বাড়ী চা খাবার নিমন্ত্রণ করে বসলো। আমার কোন আপত্তিই টিকলো না। নামতেই হলো তার সঙ্গে।

চা খেতে খেতে নন্দিতার মায়ের সঙ্গেও আলাপ হলো। বেশ অমায়িক ভদ্রমহিলা। নন্দিতা স্টেটাস বিল্ডিংএ স্টেনো টাইপিষ্টের কাজ করে। ছোট ভাইটি তার স্কুলে পড়ে। মাস খানেক হলো বাবা মারা গেছেন। নন্দিতার চাকরি আর ব্যাঙ্কের সুদ— এতেই তাদের সংসার চলে।

এর পর ক্লাবে রিহার্সাল দিয়ে প্রায় প্রতিদিনই নন্দিতাদের বাড়ী যেতাম চা খেতে। একদিন নন্দিতাকে পাশের ঘরে যেতে বলে নন্দিতার মা ওর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা পাড়লেন। আমি কিন্তু [illegible] পারিনি। কাজেই ভেবে দেখবার সময় নিলাম।

নন্দিতা ডানাকাটা পরী না হলেও দেখতে শুনতে ভালোই। তার ওপর চাকরী করে। রোজগারী বৌ হিসাবে নন্দিতা মন্দ কি!

নন্দিতার মাকে আমি কথা দিলাম—একটা সর্তে। বিয়ের পর নন্দিতাকে কিন্তু আমার বাড়ী গিয়ে থাকতে হবে।

ওরা রাজি হলো।

সুরু হলো শোষণের পালা। বিয়ের আগেই ভাবী স্ত্রীর দাবী-দাওয়া চললো আমার ওপর। আমিও খুশী মনে তার আবদার,

অভাব-অনটন মেটাতে লাগলাম। মাস কয়েকের মধ্যে নন্দিতার শাড়ী, গহনা আর অন্যান্য জিনিষে মিলিয়ে আমার প্রায় হাজার খানেক টাকা খরচ হ'য়ে গেল। ভাবলাম—ওসব জিনিষ তো দু'দিন পরে আমার ঘরেই আসবে।

নন্দিতার মা বিয়ের জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন, আমিও রাজি কিন্তু রাজি নয় নন্দিতা। কালা-অশৌচ না গেলে বিয়ে হয় না। তার বাবার মৃত্যুর পর এখনো এক বছর পূর্ণ হয়নি।

আজ কাল আর ওসব কে মানছে—মন্তব্য করলেন নন্দিতার মা। নন্দিতা সে কথা গায়েই মাখলে না। তা নাই মাখুক ও যদি ওসব সংস্কার মেনে শান্তি পায় তো ক্ষতি কি। কালা-অশৌচের মধ্যে বিয়ে করতে ওর মনে যদি খটকা বাধে তো নাই করলো। আর তো কটা মাস মাত্র বাকী।

নন্দিতার ঘড়ি নেই। ঘড়ি নইলে তার কাজকর্মেরও অসুবিধা হয় আর বন্ধু-বান্ধবীর কাছে নিজেকে কেমন খেলো মনে হয়।

বিয়ের সময়ই হোক আর বিয়ের পরেই হোক ঘড়ি তো একটা নন্দিতাকে কিনে দিতেই হবে। কিনে যখন দিতেই হবে তখন আর অযথা অসুবিধার সৃষ্টি করে লাভ কি! আড়াই শো টাকার একটা আপ-টু-ডেট্ ঘড়ি পছন্দ করলে নন্দিতা। কিনে দিলাম ঘড়ি।

আজ কাল আমার অফিসের পর প্রায়ই নন্দিতাদের বাড়ী গিয়ে শুনি—সে অফিস থেকে ফেরেনি। ফিরতে তার প্রায়ই রাত হয়। এক একদিন সে এক-একটা ওজর দিয়ে কাটায়। মায়ে মেয়েতে এই নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়, কিন্তু নন্দিতার রুটিন ঠিকই থাকে।

—এভাবে তোমার দেরী করে রাতে বাড়ী ফেরা আমি পছন্দ করি না নন্দিতা।

—তুমি আমার সংসার চালাও না। দু'পয়সা উপরি রোজ-গারের জন্যে দেরি করে না ফিরে আমার উপায় নেই।

—উপরি রোজগারটা কি ভাবে হয় শুনি?

—তোমার এ কথার অর্থ? রুখে উঠলো নন্দিতা।

এ ভাবে কথাটা নন্দিতাকে বলা উচিত হয়নি। মনে মনে লজ্জিত হলাম।

নন্দিতা বললে, যে মেয়েকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো না তাকে বিয়ে করা তোমার উচিত হবে বলে মনে হয় না। আর আমাকেও যে অবিশ্বাস করে তার গলায় আমিও মালা দেবো কিনা ভেবে দেখতে হবে।

—এ সব তুমি কি বলছো নন্দিতা!

আমার কথার উত্তর না দিয়ে নন্দিতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পরের দিন কি খেয়াল গেল—রাইটার্স বিল্ডিঙের এক নম্বর ব্লকের নীচের তলায় লিফটের অদূরে একটা থামের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালাম—তখন পাঁচটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। এই লিফট্ দিয়েই নন্দিতাকে নামতে হয়।

পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই নেমে এলো নন্দিতা। অলক্ষ্যে থেকে আমি তাকে অনুসরণ করলাম। লালদীঘির পশ্চিম পাড়ে রেলিঙের ধারে এক স্যুটধারী তরুণের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলো নন্দিতা। দু'জনে হাসি গল্প করতে করতে হারবার্টসনে গিয়ে ঢুকলো, কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এলো দু'জনে—নন্দিতার হাতে একটা জুতার বাকসো। ওখান থেকে ওরা একটা ট্যাকসি নিলে। আমিও একটা ট্যাকসি নিয়ে ওদের অনুসরণ করলাম। ওদের ট্যাকসি গিয়ে থামলো এম, বি, সরকার এণ্ড সন্সের জুয়েলারী দোকানের সামনে। স্যুটধারী তরুণ একটা হার কিনে দিলে নন্দিতাকে।

বুঝলাম —এটি হচ্ছে নন্দিতার নতুন শিকার।

শেষ না দেখে ফিরবো না। মরিয়া হ'য়ে আবার ট্যাকসিতে ওদের ফলো করলাম। একটি বারের সামনে ওদের ট্যাকসি গিয়ে থামলো।

স্যুটধারী ট্যাকসিকে বিদায় দিয়ে বারে গিয়ে ঢুকলো। ওদের অলক্ষ্যে আমিও ঢুকলাম এবং বসলাম ওদেরই পাশের কেবিনে।

পাশের কেবিনে পেগের পর পেগ চলছে—হাসি, কথা আর অশোভন গল্প। অশিষ্ট আচরনও যে চলছে—ওদের কথায় তারও আভাষ পাওয়া গেল পাশের কেবিনে বসে।

—ছিঃ, কি হচ্ছে! গায়ে হাত না দিয়ে কথা বলতে পারো না, কেউ যে দেখে ফেলবে! নন্দিতার জড়িত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো আমার কেবিনে।

—Dam it. আমি আমার would be wife এর সঙ্গে যা খুশী তাই কার না কেন—তাতে কার কি বলবার আছে! বললে স্যুটধারী তরুণ।

—বিয়েটা আগে হোক। তখন তো সব কিছুই হবে। এখন অত ব্যস্ত কেন!

—হবে হবেই তো কচ্ছো কিন্তু হবেটা কবে? আমি আর—

—Be Patient, Dear। বিয়ে হলে কি আর আমায় এত ভালবাসবে?

—আমি এই Peg glass ছুঁয়ে মা কালীর নামে শপথ কচ্ছি -

জীবনে আমি আজ প্রথম মদের গ্লাস ধরলাম পেগের পর পেগ খেয়ে চলেছি। হঠাৎ এক সময় 'বয়' এসে বললে, সাব, টাইম হ'য়ে গেছে! বিল মিটিয়ে দিলাম! বয়ের সাহায্যে একটা ট্যাকসিতে উঠে ড্রাইভারকে বলে দিলাম বাড়ীর নম্বরটা। এর পর আমার আর কিছুই মনে নেই।

পরের দিন দুপুরে চোখ চেয়ে দেখি—আমি আমার খাটে শুয়ে আছি।

অনেক রাস্তা দিয়েই হাঁটি কিন্তু নন্দিতাদের বাড়ীর সামনের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে আমার ভয় হয়। আজও আমি ও রাস্তা মাড়াইনি।

কটক ষ্টেশন।

বেলা তখন দুপুর। গাছের তলায় একটা ট্রাঙ্কের ওপর বসে একটি অষ্টাদশী বিয়ের কনে অঝোরে কাঁদছে। তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে বর্ষীয়সী পরিচারিকা।

বিশ-বাইশ বছরের একটি তরুণ—মেয়েটির দাদা গলদঘর্ম হ'য়ে কোথা থেকে ঘুরে এসে বললে, নাঃ কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

—তাহলে উপায়? বললে ঐ বর্ষীয়সী পরিচারিকা।

—কি আর করবো, শেষ অবধি থানায় একটা ডায়রি লিখিয়ে আসবো কিনা ভাবছি।

—এমন করে কেউ কারুর সর্বনাশ করে গা! গয়না আর নগদে চার পাঁচ হাজার টাকাও গেল আর মেয়েটারও—

থানায় গিয়ে কনের দাদা পুলিশ ডাইরী যা লেখালে তার সারাংশঃ—"আমাদের বাড়ী কলকাতা, অমুক নম্বর মহাত্মা গান্ধী রোড। আমাদের বাড়ীর কাছে একটা বড় হোটেল (Residential) আছে। ঐ হোটেলের ম্যানেজার আমার বন্ধু। ক্লাইভ ষ্ট্রীটে আমাদের কাগজের দোকান।

ম্যানেজার বন্ধুকে আমার বোনের বিয়ের জন্য একটি ভাল পাত্রের খোঁজ দিতে বলেছিলাম। হোটেলে তার দেশ বিদেশের বহুলোক আসা-যাওয়া করে। চেষ্টা করলে হয়তো সে একটা ভালো পাত্র জুটিয়ে দিতে পারে।

ললিত ঘোষ নামে মাস খানেক আগে এক ভদ্রলোক ঐ হোটেলে এসে উঠলেন। বললেন, বোম্বেতে তার এক বিরাট পোলট্রি ফার্ম আছে। বাঙলায় এসেছেন বিয়ে করতে। কলকাতার আশ পাশে তাঁর অনেক আত্মীয় আছে। বাবা তাঁর রিটায়ার্ড পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট—থাকেন বারহামপুর।

বন্ধুর মুখে খোঁজ পেয়ে আমি ভদ্রলোককে এনে আমার বোনকে দেখিয়ে দিলাম। পাত্রী দেখে তাঁর পছন্দ হলো। বাবা তাঁর

খুবই বৃদ্ধ। তিনি বিয়ের সময় আসতে পারবেন না। আসবেন তাঁর পিসীমা, পিসেমশাই আর পিসতুতো ভাই। কলকাতায় বাসা ভাড়া করে বিয়ে হবে। দেনা পাওনার কথা পিসেমশাই বলবেন।

পিসেমশাই এলেন। দু'হাজার টাকার গহনা আর নগদ দেড় হাজার আর দান সামগ্রী, খাট, সো-কেস, ড্রেসিং টেবিল প্রভৃতির বদলে আর হাজার টাকা। এখান থেকে ঐ সব জিনিষ ঘাড়ে করে নিয়ে যাওয়া তাঁদের পক্ষে খুবই অসুবিধা তাই ঐ টাকাটা তারা নগদই চাইলেন।

যথা সময়ে বিয়ে হ'য়ে গেল।

বৌ-ভাত হবে বারহামপুরে। ওঁদের মত অনুসারে পুরী এক্সপ্রেসে এসে আজ ভোরে এখানে নামলাম। রথযাত্রার সময় বলে গাড়ীতে খুব ভীড়। আমার ভগ্নিপতি গহনাগুলি একটা বাকসে ভরে নিজের কাছে রাখলেন চুরি যাবার ভয়ে। আমার ভগ্নিপতি আর তাঁর পিসতুতো ভাই বাসের টাইম জানতে সেই যে বেরিয়েছেন—এখনও তাঁদের পাত্তা নেই।

গহনা আর টাকা যে ছোট্ট সুটকেশটিতে রেখেছিলেন আমার ভগ্নীপতি—বাসের টাইম দেখতে যাবার সময় সেটা তিনি হাতে করেই নিয়ে গেছেন. সন্ধ্যে হতে যায়—এখনও তাঁদের দেখা নেই"

—এত সাত তাড়াতাড়ি ডাইরি লেখবার কি আছে: কোথাও আটকা পড়েছে নিশ্চয়। হয়তো কোন বন্ধু-বান্ধব, চেনা জানা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে। তারা টেনে নিয়ে গেছে তাদের বাড়ীতে। এমন তো হতে পারে।

বিয়ের কনেকে ষ্টেশনে বসিয়ে কেউ যদি বন্ধু-বান্ধবের বাড়ী গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়—বুঝতে হবে হয় তার মতলব ভাল নয়, আর নয় সে উন্মাদ। টাকা সমেত গহনার বাকসো নিয়ে বর তার বন্ধুকে নিয়ে ভেগে পড়েছে। বাসের টাইম জেনে ওরা আর কোন দিনই ফিরে আসবে না। ওরা প্রতারক। প্রতারণা করে ওরা গহনা

টাকাই হাতালো না—মেয়েটির করে গেল সর্বনাশ। টাকা গেলে টাকার ক্ষতিপূরণ হয় কিন্তু হিন্দু ঘরের এই সদ্য বিবাহিতার সিঁথির সিন্দুরের ক্ষতিপূরণ কি দিয়ে হবে? কে করবে সে ক্ষতিপূরণ?

অপকার্য্যের ডিপো বা আস্তানা হচ্ছে পতিতালয়। পতিতাদের মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা গেল। প্রথম—স্বভাব বেশ্যা, দ্বিতীয়—অভ্যাস বেশ্যা আর তৃতীয়—অভিজাত বেশ্যা।

টিনের বা খোলার বস্তী বাড়ীতে বসবাস করে থাকে স্বভাব বেশ্যারা। এরা দিনের বেলা গৃহস্থ বাড়ীতে বাসন মাজে, ঘর ঝাঁট দেয়—অর্থাৎ ঝিয়ের কাজ করে। কেউ বা করে বাঁধা মাইনের কাজ আবার কেউ বা করে ঠিকে হিসাবে। ঠিকে হিসাবে যারা কাজ করে—তাদের হাজিরা দিতে হয় পাঁচ সাতটা বাড়ীতে। এদের প্রায় সবারই একটি করে বাবু থাকে। লোকে কথায় বলে—'যেমন হাড়ী তেমন সরা'। কাজেই এদের বাবুও হচ্ছে—কারখানার মিস্ত্রী, মুটে, রিকসাওলা, ইলেকট্রিক মিস্ত্রী প্রভৃতি। এই সব দেনেওলা বাবু ছাড়া পোষা বাবুও দু'পাঁচজনের থাকে। মনিববাড়ীতে এরা খায় না, দু'বেলা ভাত, তরি-তরকারী বাসায় বয়ে নিয়ে আসে। খায় বাবুর সঙ্গে ভাগাভাগি করে। ওপর থেকে কিছুই বোঝবার উপায় নেই কিন্তু তলে তলে এদের অনেকের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা আছে চোর, পকেটমার, ছিনতাইয়া, ডাকাত আর খুনীদের সঙ্গে।

এই বস্তীবাড়ীর মাঠ কোঠায় চলে বে-আইনী জুয়া, চোরাই মাল কেনা-বেচা। এখানে তৈরী হয় চোলাই মদ, জাল মুদ্রা আরো হরেক রকম আইন বিরুদ্ধ দুষ্কার্য্য। ছোট খোট ছেলে মেয়ে চুরি করে এনে এখানে বন্ধ ঘরের মধ্যে আটকে রাখা হয় ঐ সব স্বভাব বেশ্যাদের সাহায্যে, তারপর সুযোগ সুবিধা বুঝে তাদের চালান

রা হয় অন্যত্র। চোরাই মালের ব্যবসার মত চোরাই ছেলেমেয়ের ব্যবসাও এখানে চলে থাকে।

অপকার্য্য করে বামাল সমেত এদের আস্তানায় এসে আশ্রয় নেয় দুষ্কৃতকারীরা। গোপনে সেই মাল বিক্রী করে এরা স্ফূর্তি করে ঐ স্বভাব বেশ্যার ঘরে। যতদিন পর্য্যন্ত রসদ না শেষ হয় ততদিন পর্য্যন্ত এরা এখান থেকে নড়ে না। এদের স্ফূর্তি হচ্ছে মেয়ে পুরুষে অশ্লীল গালাগালি, মারামারি আর নেশা-ভাঙ করা। মারামারি করতে করতে রক্তারক্তি হয়ে গেল তবু তাদের হুঁশজ্ঞান নেই। পুরুষটি হয়তো মদের বোতল বসিয়ে দিলে মেয়েটির মাথায়— রক্ত ঝরে পড়লো, আঁচল দিয়ে ঝরা রক্ত মুছতে মুছতে মেয়েটি বসিয়ে দিলে এক লাথি পুরুষটির বুকে। পুরুষটি তখন হয়তো টেনে নিলে মেয়েটিকে সোহাগ ভরে। এখানকার মেয়ে পুরুষরা লজ্জা ঘৃণার ধার ধারে না। কষ্ট বোধ এদের খুবই কম।

শুধু যে দুষ্কৃতকারীদের এখানকার মেয়েরা প্রশ্রয় দেয় তা নয়, এর চেয়ে আরো বেশী জঘন্য কাজ এরা করে থাকে। গৃহস্থ বাড়ীতে কাজ করতে করতে এরা তরুণী বিধবা, বয়স্থা কুমারী বা স্বামী নির্য্যাতিতা বা পরিত্যক্তাদের দিনের পর দিন গোপনে কুমন্ত্রণা দিয়ে ফুসলিয়ে ঘরের বার করে আনে।

রাস্তার বেওয়ারিস ছেলেমেয়েদের ভুলিয়ে এনে—হয় নিজেরা স্বার্থের খাতিরে তাদের মানুষ করে আর নয় কিছু অর্থের বিনিময়ে অবস্থাপন্না অভ্যাস বেশ্যাদের কাছে গোপনে বেচে দেয়। ছেলেদের অনেক সময় তারা দিয়ে আসে পকেটমারদের আড্ডায়—সেয়ানা হবার জন্য। বিনিময়ে পারিশ্রমিক এককালীন একটা মোটা টাকা পেয়ে থাকে।

জাত বিচার বলতে এদের মধ্যে কিছু নেই। সকলেই এক জাত—ঠিক স্বভাব অপরাধীদের মত। চোর—চোর, ডাকাত— ডাকাত। তাদের আবার জাত কি! জাতে হচ্ছে তারা অপরাধী।

জাতের ধার যেন তারা ধারে না—তেমনি ধারে না অপরাধ করাই শুধু তাদের ধর্ম। স্বভাব বেশ্যাদের অবশ্য দেবতার স্থানে মাথা নোতে বা পূজো দিতে দেখা যায়। সেটা একটা অন্ধ সংস্কার ছা আর কিছুই নয়। দ্বিধাহীন চিত্তে অপরাধীকে প্রশ্রয় দিয়ে অপধকে এরা সমর্থন করে।

এদের কোনকাজে নিযুক্ত করার পূবে ভদ্রগৃহস্থের ভেবে দেখা উচিত যে পবি অন্তঃপুবে যাদের প্রবেশ অধিকার দিচ্ছেন তারা কি চরিত্রের লোমেয়ে! দুষ্কৃতকারীদের অপকার্য্যের সুযোগ-সন্ধান বলে দেয়া, মেয়ে ফুসলানো, উঠতি বয়সী ছেলেদের প্রলুব্ধ করে পাপের পথ নামিয়ে আনা—হেন দুষ্কার্য্য নেই যা এদের দ্বারা সম্ভব নয়। সুখ অন্তঃপুবেব পবিত্র আবহাওয়া কলুষিত, বিষাক্ত করে তুলতে এর জুড়ী নেই থানা, পুলিশ, জেল প্রভৃতির এরা পরোয়া করে।—ঠিক স্বভাব বা প্রকৃত অপরাধীদের মতই।

অভ্যাস বেশ্যারা অধিকাংশই এসে থাকে গৃহস্থ ঘর থেকে। বয়স্থা কুমারী, তরুনী, বিধবা, স্বামী-সুখ বঞ্চিতা সধবা ঘর ছেড়ে এসে অভ্যাস বেশ্যা পরিণত হয়; কেউ আসে অভাবের তাড়নায়, কেউ বা আসে স্বামীর অত্যাচারে উৎপীড়নে অথবা অতৃপ্ত যৌন-তৃষ্ণা পরিতৃপ্তির আশায় আবার কেউ বা আসে প্রলোভনে।

এরা থাকে কোঠা বস্তী বাড়ীতে এবং একখানি ঘর ভাড়া নিয়ে। দিনের বেলা এরা প্রায় রাস্তা ঘাটে বেরোয় না। বেরুতে হলে রিকসায় পদফেলে বা ট্যাকসিতে। ঠিকে ঝি বা চাকরে এদের কাজ করে—বিছানা ঝাড়ে; ঘর ঝাঁট দেয়, বাজার করে—আর রান্নার উনুন ধরিয়ে দেয় এরা নিজেরাই রান্না করে। হয় এক বেলা রেঁধে দু'বেলা খায় আর নয় রাত্রে দোকান থেকে খাবার আনিয়ে নেয়।

দুপুরে খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে নেয় আর নয় নিজেদের মধ্যে তাস নিয়ে বসে। অনেকে বৈকালে ওস্তাদের কাছে গানের

না হয় পরিষ্কার করে। সন্ধ্যার আগে গা হাত ধুয়ে এসে প্রসাধন ব্যবহার করে সাজ-গোজ করে। ঠিক সন্ধ্যার সময় সদর রাস্তায় ঘরে বা দরজার ধারে এসে দাঁড়ায় খরিদ্দারের প্রতীক্ষায়।

অনেকের আবার টাইমের বাবু থাকে। টাইমের দিন তারা ঘর ছেড়ে বেরোয় না। টাইমের বাবু চলে গেলে আবার তারা নতুন বাবুর জন্য ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

এদের এখানে হানা দেয় একটু উচ্চস্তরের অপরাধী—দুষ্কার্য্যের দ্বারা যারা বেশী পয়সা কামায়, যেমন—ছিনতাইয়া, ডাকাত, ব্ল্যাক-মেলার, খুনী, চোরা কারবারী প্রভৃতি।

অর্থের লোভে এবং অনেক সময় প্রাণের ভয়ে এরা ঐসব দুষ্কৃতকারীদের প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। অনেকে জেনেশুনেই প্রশ্রয় দেয় আবার অনেকে না জেনে শুনে এদের খপ্পরে পড়ে শেষে ইচ্ছা সত্ত্বেও আর পিছিয়ে আসতে পারে না, পুলিশের ভয়ের চেয়ে তখন প্রাণের ভয়টাই হয় বেশী।

স্বভাব এবং অভ্যাস অপরাধীদের প্রায়ই বাড়ীঘর থাকে না। থাকলেও বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক তাদের খুবই কম থাকে। আস্তানা তাদের ঐ বেশ্যালয়। খুনী খুন করে বামাল সমেত এসে হাজির হয় এই সব বেশ্যালয়ে। এই ধরণের অপরাধীরা হয় তাদের রক্ষিতাকে মাস মাহিনা দেয় আর নয় দিয়ে থাকে অপহৃত দ্রব্যের হিস্যা। এখান থেকেই বামাল পাচার হয়। বামাল সংগ্রাহকদের এ সব আস্তানা জানা আছে।

ডাকাতরা ডাকাতি করে দলপতির রক্ষিতার ঘরে এসে জমায়েত হয়। এখানেই হয় তাদের ভাগ-বাটোয়ারা। অভ্যাস-বেশ্যা মাত্রেই যে এই দলের দলী—তা নয়। অনেকে এসব সপ্তরের ধার কাছ দিয়েও ঘেঁসে না। সব জেনে শুনেও তারা বোকা সেজে থাকে। খুনী বা ডাকাত যার বাবু তাকে ঘাঁটাতে সাহস পায় না।

কোকেন এবং মদের কারবারও এখানে চলে থাকে।

নেশাখোরেরা জানে কোন বিবির ঘরে কি পাওয়া যায়।
বাড়ীর ছাদেতোয় প্রত্যেকেরই একফালি করে রান্নাঘর আছে।
এই রান্নাঘরে কাঠ, ঘুঁটে, কয়লার তলায় বা উনুনের ভিতর লুকানো
থাকে ঐ সব বে-আইনী মাদকদ্রব্য

সাধারণ: এদের ঘরে খাট বা পালঙ্ক খুবই কম থাকে। মেঝের
উপর পুরু গদি পেতে চালা বিছানা এই গদির তলায় অনেক সময়
ছোরাই মাল লুকিয়ে রাখতে দেখা গেছে।

এদের প্রত্যেকেরই একটি করে ভালবাসার বাবু থাকে। তাদের
সাধারণত বলা হয় রাত বা বোটার বাবু। ভালবাসার বাবু কিছু
তো দেয়ই না— উপরন্তু নেয় এরা ভাত কাপড় দিয়ে পুষে থাকে
তাদের পীরিতের লোকাদের এসব ভালবাসার বাবুরা হয় এক একটি
নিষ্কর্মা, অন্য প্রকৃতির জীব আর নয় ছিঁচকে চোর বা ছিনতাইয়া!
পুলিশের হাতে ধরা পড়লে এরাই টাকা খরচ করে উকিলের সাহায্যে
ভালবাসারবাবুকে জামিনে খালাস করিয়ে নিয়ে আসে।

গ্রাম থেকেই হোক আর শহর থেকেই হোক—ফুসলিয়ে বা জোর
করে ধরে আনা মেয়েদের সন্ধান অভ্যাস-বেশ্যা বাড়ীতেই পাওয়া
যায়। এ সব বাড়ীর বাড়ীউলি ঐ সব নবাগতাদের বিনা পয়সায়
ঘর দেয় খেতে দেয়, কাপড় জামা, প্রসাধন সামগ্রী দেয় আর চলন
সই গোছের একটা বিছানাও দিয়ে থাকে কি করে খরিদ্দারদের
মনোরঞ্জন করতে হয়— সে বিষয়েও তালিম দিয়ে পণ্য হিসাবে
সন্ধ্যায় ঘরে বা দরজার ধারে দাঁড়াতে বাধ্য করে দৈনিক
উপার্জনের পয়সা বাড়ীউলিকে ধরে দিতে হয়। বাড়ীউলি কিছু
করে হাতখরচা দিয়ে থাকে

কিছুদিন পরে ঐ নবাগতারও চোখ ফোটে। সে তখন
বাড়ীউলির পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে স্বাধীন ভাবে ব্যবসা চালায়।

আট থেকে বার বছর বা তারও ঊর্দ্ধ বয়সী মেয়েছেলেকে পুষে
থাকে এই সব বেশ্যারা বা বাড়ীউলি নিজে!

পরিণত বয়সে এদের কর্মক্ষম করে তোলার জন্য ছোট ছোট মেয়েদের যোনীগহ্বরে ভিজে সোলা দিয়ে রাখা হয়। বাবু ঘরে এলে এ ধরণের ছোট মেয়েকে ঘরে নিয়ে ওরা ঘরে খিল দেয়। সে ফাইটা-ফরমাজটা খাটে। একটু একটু করে মদও খেতে শেখে মেয়েটির সামনেই উলঙ্গ অবস্থায় তারা রতি ক্রিয়া করে থাকে। এই ভাবে মেয়েটি হ'য়ে ওঠে অকাল পরিপক্ক।

অভ্যাস-বেশ্যাদের ঘরে এমন অনেক খরিদ্দার আসে - যারা নাবালিকার ভক্ত। বেশ মোটা টাকা পারিশ্রমিক আদায় করে পোষ্য নাবালিকাটিকে খাদ্য হিসাবে ধরে দেয় খাদকের কাছে। নাবালিকাটি নারাজ হলে তাকে মেরে ধরে বাধ্য করা হয় খরিদ্দারটির সঙ্গে যৌন-সম্মিলন করতে। অনেক সময় ক্রন্দনরতা নাবালিকাটির ওপর পাশবিক অত্যাচার করতে খরিদ্দারকে সাহায্য করে থাকে ঐ পারিশ্রমিক গ্রহীতা পতিতাটি।

বিকৃত রুচিসম্পন্ন খরিদ্দারের যৌনক্ষুধা পরিতৃপ্তির জন্য নাবালক ছেলে পুষতেও পতিতাদের দেখা যায়।

কোঠা বস্তীর পতিতাদের নিয়েই ব্লু-ফিল্ম তোলা হয়। সাধারণতঃ ষোল মিলিমিটার ফিল্মে তোলা হ'য়ে থাকে এই সব নক্কারজনক চিত্র। একটি অশ্লীল গল্পকে চিত্ররূপ দেওয়া হয়। উলঙ্গ অবস্থায় এতে অভিনয় (প্রকাশ্য যৌন সম্মিলন) করতে এসব অভ্যাস বেশ্যারা অনেকেই অভ্যস্ত। এই সব নগ্নচিত্রে অভিনয় করার জন্য প্রাপ্তি-যোগের মাত্রাটা এদের বেশীই হ'য়ে থাকে।

এরা অধিকাংশই অমিতব্যয়ী। বয়সকালে নেশা ... কার ভালবাসার বাবুর পাল্লায় পড়ে আয়ের সবটাই খরচ জমান প্রায়ই এদের কুষ্ঠিতে লেখেনি। বৃদ্ধ বয়সে হঃ আর নয় লোকের বাড়ী ঝি-বৃত্তি করে দু'বেলা সংস্থান করতে হয়। বয়স কালে হিসাবী এবং মিতব্যয়ী কিছু সঞ্চয় করে—তাদের আর পান বিক্রী করে বা ...